Volume-1, Issue-2, 2019

ISSN 2664-228X

BL College Journal

A Peer Reviewed Journal

Government Brajalal College

Khulna, Bangladesh

ISSN 2664-228X

BL College Journal

A Peer Reviewed Journal

Volume -1, Issue-2, 2019

Government Brajalal College
Khulna, Bangladesh

BL College Journal

A Peer Reviewed Journal

A Bi-lingual (Bangla-English) Research Journal
Half Yearly Publication of Government Brajalal College

Chief Patron
Professor K M Alamgir Hossain Principal, Government Brajalal College

Editor
Professor Sharif Atiquzzaman Vice Principal, Government Brajalal College

Review Committee

Professor Dr. Khandakar Hamidul Islam	Head, Department of Islamic Histroy & Culture
Professor Dr. Khandakar Ahsanul Kabir	Head, Department of Physics
Dr. Md. Mizanur Rahman	Head, Associate Professor, Department of Social Work
Dr. Hosne Ara	Associate Professor, Department of Zoology
Shankar Kumar Mallick	Associate Professor, Department of Bengali
Roxana Khanam	Associate Professor, Department of English
Amal Kumar Gain	Assistant Professor, Department of History
Dr. Md. Sarwar Hossain	Lecturer, Department of Mathematics

Mailing Address :
Government Brajalal College, Daulatpur, Khulna-9200, Bangladesh
Phone : 0088-041-762944, 0088-041-2852708 email : infoblcollege@gmail.com
Website : www.blcollege.edu.bd
Printed by : Rabi Printing Press
27, Samsur Rahman Road, Khulna-9100, Bangladesh

© **Government Brajalal College, Khulna, Bangladesh**
ISSN : 2664-228X

ISSN 2664-228X
Volume -1 Issue-2 2019

Contents

বাংলা অংশ

- ব্রিটিশ শাসনামলে বৃহত্তর খুলনা অঞ্চলে বাজেয়াপ্ত বই ও শাস্তিপ্রাপ্ত লেখক প্রসঙ্গ হীরালাল সেন ও বিধুভূষণ বসু
  শংকর কুমার মল্লিক ৭-২৫
- *দিনের রশিতে গিটঠু* : ব্রাত্যজনের দ্রোহকথা
  রামী চক্রবর্তী ২৬-৩৯
- স্মৃতিকথায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : প্রাথমিক প্রতিরোধ প্রসঙ্গ
  আরমান হোসাইন আজম ৪০-৬১
- বাংলা ও অসমিয়া উপন্যাসে গ্রামজীবনের প্রতিফলন : একটি তুলনামূলক অধ্যয়ন
  সঞ্জয় ভট্টাচার্য ৬২-৭৯
- মুক্তিযুদ্ধে শরণার্থী : কেস স্টাডি মাগুরখালী ও হাসনাবাদ
  দিব্যদ্যুতি সরকার, পিএইচডি ৮০-৯৭
- গালির সমাজতত্ত্ব : শ্রেণি, পেশা ও জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিত
  ড. খ. ম. রেজাউল করিম
  মহসিন মিঞা ৯৮-১০৬
- বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব
  গৌরাঙ্গ নন্দী ১০৭-১৩৪
- বাংলাভাষা নিয়ে সংঘাত : ইতিহাসের আলোকে একটি পর্যালোচনা
  অমল কুমার গাইন ১৩৫-১৫৩

English Section

- Keats an Escapist or a Realist : A Brief Analysis
  K M Alamgir Hossain 157-161
- Study of Ecology and Shellfish Diversity of River Nabaganga at Jhenidah in South Western Part of Bangladesh
  Dr. Bidhan Chandra Biswas, Dr. Poulami Paul & Professor Ashis Kumar Panigrahi 162-168
- Prospect of Institutional Repositories in Universities of Bangladesh
  Muhammad Hossam Haider Chowdhury & Dr. S. M. Mannan 169-185
- Toxicity of Organophosphate Insecticides to Adult Housefly, *Musca domestica*
  Dr. Hosne Ara & Professor Dr. M. Khalequzzaman 186-197
- Violence against Women in the Name of Religion
  Dr. Shirtaz Begam Laskar 198-204
- Mental Health Status in Relation to Perception of Crowding in Dhaka City
  Dr. Abu Syed Md. Azizul Islam & Professor Dr. Kazi Saifuddin 205-214
- Scenario of Migration in Federal State Nepal : An Anthropological Discourse
  Dilli R. Prasai 215-221
- Morphogenesis of Sodium Silicate Glass and Glass Ceramics with High Amounts of Vanadium Pentoxide
  Md. Kamruzzaman Khan, Golam Mortuza, Rafiqul Ahsan, Md. Jahangir Hossain, Md. Alamgir Hossain, Md. Abdur Rashid & A.K.M. Asaduzzaman 222-231

ISSN 2664-228X
Volume -1 Issue-2 2019

BL College Journal

A Peer Reviewed Journal

A Bi-lingual (Bangla-English) Research Journal
Half Yearly Publication of Government Brajalal College

Published by
Government Brajalal College, Khulna, Bangladesh

Disclaimer

The opinions expressed in the articles published in this journal are the opinions of the authors. The members of the review committee, the editor or the publisher of the *BL College Journal* are in no way responsible for the opinions expressed by the authors or the conclusions deduced by them.

BL College Journal

A Peer Reviewed Journal

বাংলা অংশ

- ব্রিটিশ শাসনামলে বৃহত্তর খুলনা অঞ্চলে বাজেয়াপ্ত বই ও শাস্তিপ্রাপ্ত লেখক প্রসঙ্গ হীরালাল সেন ও বিধুভূষণ বসু
  শংকর কুমার মল্লিক ৭-২৫
- *দিনের রশিতে গিটঠু :* ব্রাত্যজনের দ্রোহকথা
  রামী চক্রবর্তী ২৬-৩৯
- স্মৃতিকথায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : প্রাথমিক প্রতিরোধ প্রসঙ্গ
  আরমান হোসাইন আজম ৪০-৬১
- বাংলা ও অসমিয়া উপন্যাসে গ্রামজীবনের প্রতিফলন : একটি তুলনামূলক অধ্যয়ন
  সঞ্জয় ভট্টাচার্য ৬২-৭৯
- মুক্তিযুদ্ধে শরণার্থী : কেস স্টাডি মাগুরখালী ও হাসনাবাদ
  দিব্যদ্যুতি সরকার, পিএইচডি ৮০-৯৭
- গালির সমাজতত্ত্ব : শ্রেণি, পেশা ও জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিত
  ড. খ. ম. রেজাউল করিম
  মহসিন মিঞা ৯৮-১০৬
- বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব
  গৌরাঙ্গ নন্দী ১০৭-১৩৪
- বাংলাভাষা নিয়ে সংঘাত : ইতিহাসের আলোকে একটি পর্যালোচনা
  অমল কুমার গাইন ১৩৫-১৫৫

Volume -1, Issue-2, 2019

BL College Journal

ISSN 2664-228X
Volume -1, Issue-2, 2019
pp. 7-25

ব্রিটিশ শাসনামলে বৃহত্তর খুলনা অঞ্চলে বাজেয়াপ্ত বই ও শাস্তিপ্রাপ্ত লেখক প্রসঙ্গ হীরালাল সেন ও বিধুভূষণ বসু

শংকর কুমার মল্লিক
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সরকারি ব্রজলাল কলেজ, খুলনা, বাংলাদেশ
ই-মেইল : mallickkhluna@gmail.com

সারসংক্ষেপ

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের ওপর ক্ষমতাসীন রাজশক্তির নানারকম অত্যাচার-অবিচার-নির্যাতন চলে আসছে। নতুন চিন্তা ও জ্ঞানচর্চাকে তারা সবসময় সাদরে গ্রহণ করেনি। যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে নানা রাজশক্তির আমলে জ্ঞানী, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, চিন্তাবিদ, সাহিত্যিকদের ওপর খড়গ নেমে এসেছে। তাঁদের চিন্তার ফসল, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ইত্যাদি ধ্বংস করা হয়েছে। পাশাপশি ওই লেখক, দার্শনিক, বিজ্ঞানীদের কঠিন শাস্তি প্রদান করা হয়েছে, এমনকি তাঁদের হত্যাও করা হয়েছে। যখন রাষ্ট্র বা রাজশক্তি কোনো লেখককে তাদের স্বার্থের প্রতিকূল ভেবেছে, তখনই তাঁর লেখাকে তারা বাজেয়াপ্ত, নিষিদ্ধ ও ধ্বংস করেছে। লেখকের কণ্ঠকে রোধ করার যাবতীয় আয়োজন সুসম্পন্ন করেছে। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনামলে তৎকালীন রাজশক্তি এদেশের বহু লেখকের লেখা বই বাজেয়াপ্ত ও নিষিদ্ধ করেছে। খ্যাতিমান লেখক থেকে শুরু করে স্বল্প পরিচিতি নতুন লেখক কেউ বাদ যাননি। যে লেখায় ভারতীয়দের দেশপ্রেম অথবা সামান্যতম ব্রিটিশ বিরোধিতা পরিলক্ষিত হয়েছে সেগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বিশশতকের গোড়া থেকে এদেশে ব্রিটিশ বিরোধী নানামাত্রিক আন্দোলন শুরু হয়। সেই আন্দোলনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল বৃহত্তর খুলনা অঞ্চল।

খুলনা অঞ্চলের দুইজন লেখক হীরালাল সেন ও বিধুভূষণ বসুর বই ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করেন এবং দুইজন লেখককেই কারাগারে নিক্ষেপ করেন।

মূলশব্দ

বাজেয়াপ্ত, নিষিদ্ধ, ব্রিটিশ শাসনামল, হীরালাল সেন, বিধুভূষণ বসু

উদ্দেশ্য

সুপ্রাচীন কাল থেকে শুরু করে পৃথিবীর দেশে দেশে আজো বই ও পত্রিকা নিষিদ্ধ হচ্ছে, লেখকরা নানারকম অত্যাচার অবিচারের মুখোমুখি হচ্ছেন। উগ্র ধর্মীয় চিন্তার প্রকাশ, অশ্লীলতার বিস্তার,

সামাজিক অস্থিরতা তৈরির আশঙ্কা থেকে কিংবা লেখকের মতামত সরকারের অপছন্দ হওয়ার কারণে আজো গ্রন্থ নিষিদ্ধ করে প্রগতিশীল মুক্ত চিন্তাকে হত্যা করা হচ্ছে। এমনকি বুদ্ধিজীবী, লেখকদের মুক্তচিন্তাকে সহ্য করতে না পেরে বিভিন্ন অপশক্তি তাঁদেরকে হত্যা করছে। এই একবিংশ শতাব্দীতেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে লেখকদের দণ্ড প্রদান ও প্রাণ কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। এর ভেতর দিয়ে ওই রাষ্ট্রে ও সমাজের স্বৈরাচারী চিত্রটা ফুটে ওঠে। ভারতে ব্রিটিশ সরকারও এরকম অনেক বাজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আমরা মূলধারার কিছু বিখ্যাত লেখকের বই বাজেয়াপ্তের ঘটনা এবং তাঁদের কারাদণ্ডের বিষয়টি জানি। কিন্তু এর বাইরে গোটা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে বিশেষ করে বৃহত্তর বাংলার বিভিন্ন মফস্বল এলাকাতেও ব্রিটিশ সরকার বিভিন্ন গ্রন্থ ও সেগুলোর রচয়িতাদের প্রতি চরম বিদ্বেষপূর্ণ অবস্থান গ্রহণ করে। বিশশতকের গোড়া থেকেই বৃহত্তর খুলনা অঞ্চলে ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু হয়। এই অঞ্চলের লেখক-সাংবাদিকরা দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ব্রিটিশ সরকার সেটা ভালোভাবে নেয়নি, সেজন্যে এই এলাকার লেখক–হীরালাল সেন ও বিধুভূষণসহ অন্যদের ওপর অত্যাচার অবিচার নেমে আসে। এ বিষয়টি খুব বেশি আলোচিত হয়নি। বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। আমরা এই দুই দেশপ্রেমিক লেখকের নিষিদ্ধ গ্রন্থ ও তাঁদের কারাদণ্ডের বিষয়টি তথ্য উপাত্ত প্রমাণের মাধ্যমে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

সাহিত্যিক প্রকাশনা

ব্রিটিশ শাসনামলে নিষিদ্ধ বইপত্র সম্পর্কে আলোচনা ও অভিসন্ধর্ভ রচনা করেছেন শিশির কর। তাঁর বইয়ের নাম 'ব্রিটিশ শাসনামলে বাজেয়াপ্ত বাংলা বই'। তবে সেখানে হীরালাল সেন সম্পর্কে সামান্য আলোচনা থাকলেও বিধুভূষণ একেবারেই অনুপস্থিত। তুহিন শুভ্র ভট্টাচার্য লিখেছেন দুটি গ্রন্থ। সেখানেও হীরালাল আছেন সামান্য। চিন্মোহন সেহানবীশের 'রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবী সমাজ', অজিত কুমার নাগের 'স্বাধীনতা সংগ্রামে খুলনা', প্রশান্ত পালের 'রবিজীবনী', ড. শেখ গাউস মিয়ার 'আলোকিত মানুষের সন্ধানে:বৃহত্তর খুলনা জেলা' এবং 'বাগেরহাটের ইতিহাস ১ম খণ্ড' প্রভৃতি গ্রন্থে কিছু আলোচনা করা হয়েছে।

পদ্ধতি

গবেষণা প্রবন্ধটি বর্ণনাত্মক পদ্ধতিতে লেখা হয়েছে। মাধ্যমিক তথ্য হিসেবে বিভিন্ন বইপত্র, পত্রিকা ও ওয়েবসাইটের সাহায্য নেয়া হয়েছে।

বিশ্লেষণ

আমরা আগেই বলেছি বিশ্বের মহৎ সৃষ্টির উপর যুগে যুগে রাজশক্তির কোপ পড়েছে নির্মমভাবে। বিশ্ববিশ্রুত দার্শনিক কনফুসিয়াসের সৃষ্টি সুপ্রাচীন কাল থেকেই চীনের বিভিন্ন রাজশক্তির রোষে পড়েছে। ২৫০ খ্রিঃ পূর্বাব্দে চীনের তৎকালীন শাসকরা এই দার্শনিকের শতশত শিষ্যকে জীবন্ত কবর দেন।[১] রাজরোষে পড়েছেন এমন বিশ্ববিশ্রুত লেখক ও দার্শনিকদের মধ্যে আছেন হোমার, দান্তে,

কোপারনিকাস, ম্যাকিয়াভেলি, শেকস্‌পীয়ার, গ্যালিলিও, ব্রুনো, ভলটেয়ার, মিলটন, মলিয়ের, রুশো, ডিফো, বায়রন, গ্যেটে, ক্যান্ট, বালজ্যাক, শেলি, কীটস্, হুইটম্যান, মার্কস, টলস্টয়, ডারউইন, মিল, ফ্লবেয়ার, সুইনবার্গ, জোলা, মোপাসাঁ, রসেটি, হেনরি মিলার, রেমার্ক লরেন্স, জেমস জয়েস, এইচ জি ওয়েলস, সিনক্লেয়ার, লুথার, অসকার ওয়াইল্ড, পাবলো নেরুদা, পাস্তেরনাক, সলঝেনিৎসিন, টমাস মান, ভ্লাদিমির নবোকভ, সারভেনটিস, ইরাসমাস, সালমান রুশদী প্রমুখ। আমাদের দেশে বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, তিলক, সখারাম, মুকুন্দ দাস, গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, শরৎচন্দ্র, নজরুল, সমরেশ বসু, মাহবুবুল আলম চৌধুরী, দাউদ হায়দার, তসলিমা নাসরিন, হুমায়ুন আজাদ প্রমুখের লেখাও সরকারি কোপে পড়েছে।[২]

ব্রিটিশ ভারতের প্রায় সব প্রাদেশিক ভাষার গ্রন্থ রাজরোষে পড়েছিল। এছাড়া বিদেশে প্রকাশিত অনেক বইপত্র ও পত্রিকা ইস্তাহার এদেশে পাঠানো ও প্রচারের উপরও নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল। এসময়ে বাজেয়াপ্ত বাংলা বইসমূহের ওপর গভীর দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, কোনো ধারার বই-ই এই বাজেয়াপ্ত তালিকা থেকে বাদ পড়েনি। প্রবন্ধ, নাটক, কবিতা, সঙ্গীত, ছোটগল্প, উপন্যাস, ছোট ছোট পুস্তিকা, ইস্তাহার, প্রচারপত্র, সংবাদপত্র, সাময়িক পত্রিকা, কার্টুন, আলোকচিত্র, গ্রামোফোন রেকর্ড প্রভৃতি বিভিন্ন সময়ে নিষিদ্ধ বা বাজেয়াপ্ত হয়েছে। তবে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো ব্রিটিশের রোষ থেকে ধর্মগ্রন্থও রক্ষা পায়নি। এই রোষ পড়েছিল ভগবদ্‌গীতার ওপর। যদিও এ গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত করা হয়নি তবে ব্রিটিশ পুলিশ বা গোয়েন্দারা দেশপ্রেমিক বিপ্লবীদের আস্তানা তল্লাশির সময় এ গ্রন্থ পেলে আটক করতো। এর কারণ, গীতার কর্মযোগ সে যুগে তরুণদের অনুপ্রাণিত করেছিল। মৃত্যু পথযাত্রী বীর ক্ষুদিরাম বসু অকম্পিত কণ্ঠে বলেছিলেন–'আমি গীতা পড়েছি, মৃত্যুকে ভয় করিনা।'[৩] প্রায় ২০০ বছরের ব্রিটিশ শাসনামলে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে অসংখ্য বাংলা বই। এই বাজেয়াপ্ত গ্রন্থের লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন– মুকুন্দ দাস, সখারাম গণেশ দেউস্কর, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, সৈয়দ আবু মুহম্মদ ইসমাইল সিরাজী, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলাম, মানবেন্দ্রনাথ রায়, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, সৌমেন ঠাকুর, সোমনাথ লাহিড়ী, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। এই তালিকায় রয়েছেন আমাদের আলোচ্য হীরালাল সেন ও বিধুভূষণ বসু।

বাজেয়াপ্ত হয়নি তবে সরকারের তরফ থেকে আপত্তি উঠেছিল এবং রোষ পড়েছিল এমন উল্লেখযোগ্য বইয়ের সংখ্যাও কম নয়। এ তালিকায় বহু খ্যাতিমান চিন্তাবিদ ও মনীষী এবং তাঁদের লেখা রয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দমঠ' দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ', 'সধবার একাদশী', নবীন চন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাশিয়ার চিঠি', দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'মেবার পতন', 'রানা প্রতাপ' প্রভৃতি। 'রাশিয়ার চিঠি' ও 'নীলদর্পণের' মূল বাংলা বই সম্পর্কে তৎকালীন সরকার কোনো ব্যবস্থা না নিলেও এগুলোর ইংরেজি অনুবাদ নিয়ে আপত্তি উঠেছিল।

একপর্যায়ে ভারতের ব্রিটিশ সরকার বুঝতে পেরেছিল শুধু কঠোর শাসন ও কঠিন আইন দিয়ে এই বিশাল সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখা যাবে না। ভারতীয়দের মন ও চিন্তার উপর লাগাম পরাতে হবে। এ

কারণে তারা ভারতীয়দের বশংবদ জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিল। এদেশে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের সূচনাপর্বে লর্ড মেকলে সগর্বে বলেছিলেন, "এমন এক জাতি গড়ে তুলব, যারা চেহারায় চরিত্রে হবে ভারতীয়, কিন্তু চিন্তায় হবে ইংরেজ।"[৪] ইংরেজ শাসকরা ভারতীয়দের, বিশেষ করে বাঙালিদের স্বাধীন চিন্তা ও নির্ভীক চেতনাকে যথেষ্ট ভয় পেত, সমীহ করতো। অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদের চেয়ে কখনো কখনো দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে লেখা এইসব বইপত্রের ব্যাপারে আশঙ্কা ছিল বেশি। কারণ তারা ভালোভাবেই জানতো ভলতেয়ার, রুশো প্রমুখের রচনা দ্বারা উপ্ত হয়েছিল ফরাসি বিপ্লবের বীজ। সেজন্যে ইংরেজ সরকার তাদের গোপন প্রতিবেদনে বার বার উল্লেখ করেছে সমসাময়িক দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধকারী পত্র-পত্রিকা, বই-পুস্তক এদেশে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে গভীর প্রভাব ফেলেছে। তৎকালীন ভারতীয় ইংরেজ সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর Terrorism in India (1917-36) নামে একটি অত্যন্ত গোপনীয় প্রতিবেদনে ১৯১৭ সালের আগে বাংলায় সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে–

> "The movement was started in 1906 through the newspaper 'Jugantar' in Calcutta and in Dacca. Other newspapers then combined to pour forth a steady stream of sedition, abuse and incitement to murder. A heavy list of outrages was the result, and it became increasingly difficult to cope with the conspiracies under the existing law"[৫]

স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে সে সময় সাহিত্যের সব শাখা সরব হয়ে উঠেছিল। তৎকালীন সরকার গভীরভাবে অনুভব করেছিল যে এইসব লেখা বন্ধ করতে না পারলে স্বাধীনতা সংগ্রামকে দমন করা যাবে না। তাই একের পর এক সার্কুলার জারি ও আইন প্রণয়ন করে বইপত্র, সাময়িক পত্রিকা ও সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধে তারা ভীষণ তৎপর হয়ে উঠেছিল। ১৯০৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে জারিকৃত একটি সার্কুলার–

> "A number of seditious publications have been printed and circulated in the province during the last three years. The majority of these have been registered in the ordinary way, and all that have been so registered up to the Present one being dealt with in the Special Branch and the office of the Director of Public Instruction.
>
> In order that a watch may be kept on all publications to facilitate the immediate detection of seditious books, it seems desirable that officers should cause all books and pamphlets, which are deposited in future in the subdivisional and district officers for transmission to the Director of Public Instruction for registration, to be carefully examined immediately they have been so deposited and that thay should report forwarding any such book on pamphlet for registration a copy of the note sent up to the commissioners should be transmitted with it to the Director of Public Instruction."[৬]

এইসব সার্কুলারের ভিত্তিতে সে সময় অনেক বই বাজেয়াপ্ত হয়েছে, পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ হয়েছে। কিন্তু সরকার যত কঠোর আইন প্রণয়ন ও আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করেছে ততই দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধকারী বইপত্র (ব্রিটিশদের কাছে দেশদ্রোহকারী বইপত্র) গোপন ছাপাখানায় ছাপানো শুরু হয়েছে। সরকারের একাধিক গোয়েন্দা সংস্থা এবং ১৯১৮ সালের সিডিশন কমিটির প্রতিবেদনে সেই স্বীকারোক্তির প্রকাশ লক্ষ করা যায়। সংবাদিক বন্ধু র‍্যাটক্লিফকে লেখা ভারতবন্ধু সিস্টার নিবেদিতার একটি পত্রে তা আরও পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছিল।

To Wednesday, July 19 or 20, 1910

MR. S. K. RATCLIFFE

Friend,

Your letter reached me yesterday afternoon. I have in any case in these troublous times to send you weekly bulletins. Last morning various house in this neighbourhood were raided and goods and boys seized in the name of the Khulna Dacoity. Khulna where one takes the steamer for Barisal, You will remember, Of course that I havn't troubled to follow, we expected to hear of R's (Ramananda's) arrest. That was not made, but some decrepit old gentleman of impassioned oratory called Devi prosanna Roy was said to be 60 Editor of something they want to crush and arrested on charge of sedition for printing a book by a mohammedan which is some years old : Anal Bharata name I think but meaning I don't know, Younger man also was arrested and subsequently a raid was made on alleged offices of secret press and recent Yugantar seized with some members of its entourage. Of course you will understand that at present there is no war so holy as the work of the secret press."[৭]

প্রকৃতপক্ষে আইনের বাঁধন যতই কঠোর হয়েছে, এইসব বইপত্র ততই অন্তরালে চলে গেছে। গোপনে বিনা মলাটে ছাপা হয়েছে এবং দ্রুত পৌঁছে গেছে দেশপ্রেমিক তরুণদের হাতে। এইসব বিধি নিষেধের ফলে অনেক ক্ষেত্রে বরং আপত্তিকর (ব্রিটিশদের চোখে) বই পড়ার উৎসাহ বেড়েই গেছে।[৮]

ব্রিটিশ শাসনামলে প্রধানত চারটি আইন বলেই বইপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সেগুলি হলো–

১. 'কোড অব ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর'– (১৮৯৮) এর ৯৯-এর ধারা,
২. ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের ১২৪-এ ধারা,
৩. ইন্ডিয়ান প্রেস এ্যাক্ট ১৯১০ -এর ধারা (১)-এর ৪ ও ১২ উপধারা,
৪. ইন্ডিয়ান প্রেস এমারজেন্সি পাওয়ার অ্যাক্টের (১৯৩১) ১৯ ধারা।

দ্য কোড অব ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর অ্যাক্ট, ১৮৯৮

১৮৯৮ সালের কোড অব ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর-এর ৯৯-এ ধারা অনুসারে সরকার বইপত্র বাজেয়াপ্ত করার ও তল্লাসী পরোয়ানা জারির ক্ষমতা হাতে নেন। যে সব লেখা বিদ্রোহ ও দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলে এবং কারো ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দেয়, সেইসব লেখা এই আইনের আওতায় আসে। এই আইনে এ ধরনের যে-কোনো লেখা, সংবাদপত্র, নথিপত্র সরকার গেজেটের মাধ্যমে বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করতে পারবেন।

ইন্ডিয়ান পেনাল কোড (১২৪এ)

ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের ১২৪এ ধারা অনুসারে সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ জাগিয়ে তোলে এমন কোনো লেখা বা কথার (বক্তৃতা প্রভৃতি) জন্য দণ্ডের ব্যবস্থা হয়। অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ড–দুই-ই।

প্রেস আইন

সংবাদপত্রে হত্যা ও অন্যান্য অপরাধের প্ররোচনা দান করার জন্য 'নিউজ পেপারস (ইনসাইটমেন্ট টু অফেনসেস) অ্যাক্ট VII অব্ ১৯০৮ হয়। এই আইন হয়েছিল ১৯০৮ সালের জুনে। পূর্ণাঙ্গ প্রেস আইন হয় ১৯১০ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি। প্রেসের উপর নিয়ন্ত্রণ আরও জোরদার করার জন্যই এই আইন। শুধু সংবাদপত্রই নয়, এর ছাপাখানা–সবই।

ইন্ডিয়ান প্রেস এমারজেন্সি পাওয়ার অ্যাক্ট

১৯৩১ সালের ইন্ডিয়ান প্রেস (এমারজেন্সি পাওয়ার) আইনটি কার্যকর হয় ১৯৩১ সালের ৯ অক্টোবর। সংবাদপত্রের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ জোরদার করার জন্য ১৯৩০ সালের ২৩ ডিসেম্বর বিশেষ গেজেটে যে অর্ডিন্যান্স ঘোষিত হয়, সেই অর্ডিন্যান্সে সরকার যে সব ক্ষমতা হাতে নেন, সেইগুলিই ইন্ডিয়ান প্রেস (এমারজেন্সি পাওয়ার্স) অ্যাক্টের (১৯৩১) অন্তর্ভুক্ত হয়।[৯]

তবে সরকারের চোখে কোনো বই আপত্তিকর (objectionable) মনে হলেই তা নিষিদ্ধ (proscribed) বা বাজেয়াপ্ত (confiscated) হতো না। গোপন সার্কুলারে বা একজিকিউটিভ আদেশে অনেক বই-ই আপত্তিকর ছিল। কোনো আপত্তিকর বই সম্পর্কে আইন অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়া হলে এবং দেশদ্রোহকর বলে ঘোষিত হলেই তা নিষিদ্ধ বা বাজেয়াপ্ত করা হতো। আবার নিষিদ্ধ হলে সর্বক্ষেত্রে বাজেয়াপ্ত হতো না। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' গানটি সার্কুলার জারি করে নিষিদ্ধ করা হলেও তা বাজেয়াপ্ত হয়নি।[১০] নিষিদ্ধকরণ বা বাজেয়াপ্তকরণের জন্য সুনির্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ করে ধাপে ধাপে এগুতে হতো। যেমন, প্রথমে কোনো বই সম্পর্কে গোয়েন্দা রিপোর্ট, তারপর আমলাদের মন্তব্য, সরকারি আইন বিশারদদের মতামত, শেষমেশ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বা গেজেটে ঘোষণা। গেজেটে কোনো বই বাজেয়াপ্ত বলে ঘোষিত হলে তা যুগপৎ নিষিদ্ধ বলেও গণ্য হতো। অবশ্য সবক্ষেত্রে বাজেয়াপ্ত করেই সরকার ছেড়ে দিতেন না। অনেক সময় সংশ্লিষ্ট বাজেয়াপ্ত বইয়ের লেখক, মুদ্রাকর, প্রকাশকের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহের মামলা ঠুকে শাস্তি দেয়া হতো।[১১]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্রিটিশ ভারতের বঙ্গদেশে খ্যাতিমান এবং অখ্যাত অসংখ্য লেখকের বইপত্র সরকার নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করেছিল। এর মধ্যে বৃহত্তর খুলনা অঞ্চলের দুইজন লেখক হীরালাল সেন এবং বিধুভূষণ বসুর বই বাজেয়াপ্ত ও নিষিদ্ধ করা হয়। এই দুই লেখকের বই কখন কেন এবং কিভাবে নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং বাজেয়াপ্ত করার পর তাদের বিরুদ্ধে যে দেশদ্রোহের মামলা দিয়ে কারাদণ্ড দেয়া হয় সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হবে।

হীরালাল সেন

হীরালাল সেন খুলনা জেলার বর্তমান দিঘলিয়া উপজেলার সেনহাটিতে অবস্থিত তৎকালীন সেনহাটি জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে তেমন কিছু বিস্তারিত জানা যায় না। হীরালাল সেনের বাড়ি ছিল সেনহাটি গ্রামে। সেনহাটি গ্রামে তৎকালে প্রচুর সেনদের বাস ছিল এবং তাঁরা অধিকাংশই শিক্ষিত ও রাজনীতি সচেতন মানুষ ছিলেন। সেনদের নামানুসারে এই গ্রামের নাম হয় সেনহাটি। উল্লেখ্য যে, 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের লেখক শচীন সেনগুপ্ত, ভারতের পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের শহিদ অনুজা সেন, শহিদ অতুল সেনসহ আরো অনেক বিপ্লবীর বাসস্থান ছিল এই সেনহাটিতে। কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের বাড়িও এই সেনহাটি গ্রামে। হীরালাল সেন কবে সেনহাটি জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন তা জানা যায় না। তবে এই জাতীয় বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি।[১২]

পুলিশ রিপোর্ট অনুসারে জানা যায়, হীরালাল সেন জড়িত ছিলেন অনুশীলন সমিতি'র বিপ্লবী কাজকর্মে।[১৩] পুলিশের এই রিপোর্ট অসত্য নয়। কারণ হীরালাল সেনের যে কবিতার বই 'হুঙ্কার' নিষিদ্ধ হয়েছিল তাতে দেশদ্রোহমূলক (ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টিতে) কবিতা লেখা ছিল। তাছাড়া বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শুরু হওয়ার আগেই খুলনার বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি 'সমিতি' গড়ে ওঠে। ফুলতলার কাছে আলকা গ্রামে ছিল 'অনুশীলনী সমিতি', সাতক্ষীরায় 'ব্রতী সমিতি' এবং খুলনা শহরে 'আত্মোন্নতি সমিতি'। ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত এই সমিতিগুলির লক্ষ্য ও কর্মসূচির বিশেষ কোনো পার্থক্য ছিল না।[১৩খ] ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকে ফুলতলা, মহেশ্বরপাশা, সেনহাটি, দৌলতপুর– বিশেষ করে তৎকালীন দৌলতপুর হিন্দু একাডেমির (বর্তমানে সরকারি ব্রজলাল কলেজ) দেশপ্রেমিক তরুণদের মধ্যে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের প্রসার ঘটে। এই এলাকার তরুণরা অনুশীলন সমিতির সাথেই যুক্ত ছিলেন। এদের মধ্যে সেনহাটি ছিল স্বদেশী আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ স্থান। ১৯০৫ সালের ১৪ নভেম্বর সেনহাটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের (স্কুলটি ১৮৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত) বহু ছাত্র এবং দৌলতপুর কলেজের (বর্তমান সরকারি ব্রজলাল কলেজ) ছাত্ররা একত্রে প্রায় ৭০ জন মিলে দৌলতপুর বাজারে হানা দেয়। প্রতিটি দোকান থেকে বিলাতি কাপড়, লবণ ও বিলাতি চিনি জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে রাস্তায় ফেলে দেয়। বিলাতি কাপড়গুলি একস্থানে জড়ো করে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়।[১৪] ফলে সেই সেনহাটির জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা-শিক্ষক হীরালাল সেনের পক্ষে অনুশীলন সমিতিতে যুক্ত থাকা অমূলক কিছু নয়।

হীরালাল সেনের লেখা 'হুঙ্কার' কবিতার বইটি (কবিতাগুলি একইসঙ্গে দেশাত্মবোধক গান) প্রকাশিত হয় ১৯০৮ সালে। বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগে উল্লিখিত বইটির বিবরণ নিম্নরূপ :

> 547/Hira lal sen Gupta.- হুঙ্কার। [Hunkar. Growl. A collection of songs.] Pages 24. Published by K.C. Basu, 34, Musalmanpara Lane, Calcutta. [31st July 1908] 24. 1st edition. [Printer] K.C. Basu, 34, Musalmanpara Lane. Calcutta./1,000/...[১৫]

এই কাব্যগ্রন্থটি সম্পর্কে প্রবাসী পত্রিকার ১৩১৫ সনের আষাঢ় সংখ্যার ১৬৮নং পৃষ্ঠায় যে সমালোচনা প্রকাশিত হয়, তা থেকে বইটির বিষয়বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায় :

> "হুঙ্কার–শ্রী হীরালাল সেনগুপ্ত প্রণীত। ২৪ পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র পুস্তিকা। মূল্য দুই আনা। ইহাতে গ্রন্থকার রচিত কতকগুলি গানের প্রারম্ভে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' ও অবশেষে রবীন্দ্রনাথের 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের স্বরচিত গানগুলিতে কবিত্ব, চিন্তা ও দেশপ্রীতি আছে। তিনটি গান রবীন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র ও যুগান্তর সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছে। চাষার গান দুইটি বেশ হইয়াছে; চাষার ভাষায় চাষার প্রাণে আঘাত করিতে পারিলেই তাহারা শীঘ্র উদ্বোধিত হইয়া উঠিবে।"[১৬]

উপর্যুক্ত কারণে ব্রিটিশ সরকার গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত করে লেখককে গ্রেপ্তার করে।[১৭] এর আগে সরকার সাময়িকপত্র, পত্রিকা ইত্যাদি নিষিদ্ধ বাজেয়াপ্ত করে এর সম্পাদক, প্রকাশক, মুদ্রাকর প্রভৃতির অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ড দিয়েছে। তবে গ্রন্থ অথবা পুস্তক পুস্তিকার ক্ষেত্রে সম্ভবত প্রথম বাজেয়াপ্ত হয় 'হুঙ্কার' এবং প্রথম শাস্তিপ্রাপ্ত লেখক হীরালাল সেন।[১৮] লেখক এই গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছিলেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথকে গ্রন্থটি পাঠালে কবি তা জানতে পারেন। গ্রন্থটি পেয়ে রবীন্দ্রনাথ লেখক হীরালাল সেনকে একটি পত্র লেখেন। পত্রটি সম্পর্কে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন :

> "বইখানি কবির নামে উৎসর্গ করা হয়েছিল, কবি তা জানতেন না; বই হস্তগত হ'লে জানতে পাল্লেন। 'হুঙ্কার' প'ড়ে কবি গ্রন্থকারকে পত্র লিখেছিলেন, তাতে উত্তেজনার প্রশ্রয় ছিল না, স্থির ধীর হ'য়ে দেশের কাজ করারই উপদেশ ছিল। সে পত্রের ভাষা মনে নেই। তবে যা দু'এক কথা শুনেছিলাম, তার ভাবটা এই রকমই মনে হয়,– ঘরে আগুন লাগিয়ে তামাশা দেখা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ... কবির সেই পত্রখানি গভর্নমেন্টের হস্তগত হ'য়েছিল; ফলে খুলনার ম্যাজিষ্ট্রেটকোর্ট থেকে কবির আহ্বান এলো।"[১৯]

হীরালাল সেনের বাড়ি তল্লাশী করে পুলিশ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা উক্ত পত্রখানি উদ্ধার করে। এই পত্র এবং 'হুঙ্কার' কাব্যটি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করার কারণে হীরালাল সেনের মামলায়–রবীন্দ্রনাথকে জড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথকে এই মামলার একজন সাক্ষী করা হয়েছিল। খুলনা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে সমন পেয়ে সরকার পক্ষে সাক্ষ্য দেবার জন্য কবিকে খুলনা আদালতে হাজির হয়ে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে শান্তিনিকেতনের শিক্ষক নেপালচন্দ্র রায়ের পুত্র কালিপদ রায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ লেখা

"খুলনার ফৌজদারী আদালতে একটি স্বদেশী মামলায় ভারত সরকারের পক্ষে সাক্ষী রবীন্দ্রনাথ" বেরিয়েছিল বীরভূম থেকে প্রকাশিত 'লালমাটি' পত্রিকার ১৩৮৫ সালের পৌষ সংখ্যায়।[২০] রবীন্দ্রনাথ যেদিন খুলনা আদালতে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, সেদিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন এমন একজন বৃদ্ধ উকিলের কাছ থেকে তিনি শুনেছিলেন সেদিনের বৃত্তান্ত। সরকার রবীন্দ্রনাথকে যে এই মামলায় ফাঁসাতে চেয়েছিলেন তার প্রমাণ এই উকিলের বক্তব্যেও পাওয়া যায়। তাছাড়া ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টিতে কবি নিজেও একজন 'দাগী' হিসেবে পরিচিত ছিলেন।[২১] বৃদ্ধ উকিল কালিপদ বাবুকে বলেছিলেন–

> "তাঁরা তখন শুনেছিলেন যে ছোটোলাট অ্যান্ড্রু ফ্রেজারের নাকি গোড়ায় মতলব ছিল রবীন্দ্রনাথকেও হীরালাল সেনের সঙ্গে আসামী করে মামলা রুজু করা। কিন্তু সরকার পক্ষের আইনজীবীরা যখন জানালেন যে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অভিযোগ টেকানো যাবে না– বরঞ্চ গোটা মামলাই ফেঁসে যেতে পারে তার ফলে, তখন হীরালাল সেনের বিরুদ্ধে মামলায় সরকার তরফের প্রধান সাক্ষী হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে ডাকার সিদ্ধান্ত করা হয়। উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথের মুখ দিয়ে বলিয়ে নেওয়া যে 'হুঙ্কার'-এর কবিতাগুলি অত্যন্ত উত্তেজক এবং রাজদ্রোহকর।"[২২]

অমৃতবাজার পত্রিকার (১৮ নভেম্বর, ১৯০৮) সংবাদ থেকে জানা যায়, হীরালাল ১৬ নভেম্বর, ১৯০৮ তারিখে খুলনার স্থানাপন্ন ম্যাজিস্ট্রেট মানসরঞ্জন সেনের আদালতে হাজির হয়ে জামিনের দরখাস্ত করলে ম্যাজিস্ট্রেট সেটি নামঞ্জুর করে তাঁকে হাজতে প্রেরণ করেন। শুনানির দিন ২৭ নভেম্বর ১৯০৮ তারিখ ধার্য হলেও জেলা ম্যাজিস্টেট মিঃ জনস্টোনের (Mr. Johnstone) অসুস্থতার জন্য ৪ ডিসেম্বর পুনরায় শুনানির দিন ধার্য হয়।[২৩] 'হুঙ্কার' গ্রন্থের বিরুদ্ধে কবে প্রথম রিপোর্ট প্রকাশ হয় এবং লেখক হীরালালের বিরুদ্ধে কবে মামলা দায়ের হয় সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে 'হুঙ্কার' গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ১৯১১ সালে এমন তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে একাধিক গ্রন্থে।[২৪] এই তথ্যের সাথে আমরা একমত পোষণ করতে পারি না। কারণ হীরালাল সেনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে ১৯০৮ সালে। যে গ্রন্থের কারণে লেখকের বিরুদ্ধে মামলা, সেই গ্রন্থ নিষিদ্ধ বা বাজেয়াপ্ত হবে আরও তিনবছর পরে এটি স্বাভাবিক নয়।

৪ ডিসেম্বর ১৯০৮ তারিখে খুলনা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে সাক্ষ্য দেবার জন্য রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় এসে ৩ ডিসেম্বর খুলনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। ঠাকুর বাড়ির এস্টেটের ক্যাশ বহির হিসাব উল্লেখ করে রবিজীবনীকার সে তথ্য আমাদের জানাচ্ছেন।[২৫] ৪ ডিসেম্বর শুনানীর দিনের বিশদ বিবরণ পূর্বোক্ত কালিপদ রায়ের লেখা থেকে তুলে ধরেছেন চিন্মোহন সেহানবীশ :

> "রবীন্দ্রনাথের খুলনা আদালতে পৌঁছতে সামান্য দেরি হয়েছিল অথচ তিনিই প্রধান সাক্ষী। হাকিম জানতে চান সাক্ষী ঐ দিন হাজির হতে পারবেন না, এমন কোনো আবেদন জানিয়েছেন কি না। যখন জানা গেল তেমন দরখাস্ত আসেনি তখন নাকি হাকিম বলেছিলেন, 'আজকের দিনটা দেখুন, তারপর বাধ্য হয়ে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করতে হবে। আর ঠিক তখনই নাকি আদালতে পৌঁছান রবীন্দ্রনাথ।"[২৬]

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনস্টোনের আদালতে মামলার শুনানী সম্পর্কে পরদিন ৫ ডিসেম্বর কলকাতার Amrita Bazar Patrika যে প্রতিবেদন ছাপে তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেছেন প্রশান্ত কুমার পাল তাঁর 'রবিজীবনী'তে–

> "The local Government Pleader with Babu Nirode Krishna Chatterjee of Alipur appeared for the Crown. Certain prosecution witnesses were examined, including the Superintendent of Police, Babu Robindra Nath Tagore, Babu Ananda Charan Sen, proprietor "Sakha Press", Pandit Rajendra Chandra Sastri, Govenment Translator, and Sub-inspector Matilal Mazumdar of Sadar thana. ... The statement of the accused was taken... [who] regrets for the language of the booklet which are objectionable somewhere." [২৭]

চিন্মোহন সেহানবীশ কালিপদ রায়কে উদ্ধৃত করে লিখেছেন–

> "রবীন্দ্রনাথের সাক্ষ্য মোটেই সরকারের পক্ষে যায়নি। কারণ তিনি নাকি বলেছিলেন, স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী তরুণের পক্ষে উত্তেজক কবিতা বা গান লেখা আদৌ অস্বাভাবিক নয়। ওকালতি তাঁর পেশা নয়, সুতরাং কবিতা বা গান কী পরিমাণ উত্তেজক হলে সেটা আইনত দণ্ডনীয় হবে সেটা তাঁর জানা নেই।"[২৮]

৮ ডিসেম্বর ১৯০৮ তারিখে রায় ঘোষণা করা হয় 'Accused pleaded guilty.'...'has been sentenced to 18 month's rigorous imprisonment' [২৯] প্রশান্ত কুমার পাল তাঁর 'রবিজীবনী'তে লিখেছেন যে, বিভিন্ন গ্রন্থে ছয়মাস কারাদণ্ডের কথা উল্লিখিত আছে, তথ্যটি ঠিক নয়।[৩০] অন্য একটি গ্রন্থে ১৫ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[৩১] আমরা পাল মহাশয়ের সাথে একমত পোষণ করি। অর্থাৎ হীরালাল সেনের কারাদণ্ড ছয়মাস নয়, আঠার মাস হয়েছিল। অন্যদিকে শিশির কর তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন– 'তবে সরকারি নথিপত্রে হীরালাল সেনের সাজার তথ্য পাইনি।'[৩২] সে ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য, সম্ভবত হীরালাল সেনের মামলার রায়ের পর উচ্চ আদালতে আবেদন করা হয়নি। খুলনা তখন মফস্বল এলাকা। এখানকার রায়ের কপি বা সংশ্লিষ্ট নথিপত্র কলকাতায় নাও যেতে পারে। ফলে শিশির করের পক্ষে কলকাতায় ঐ রায়ের নথিপত্র না পাওয়া স্বাভাবিক। তাছাড়া হীরালাল সেনের ১৮ মাসের কারাদণ্ডের পক্ষে আমাদের সমর্থনের অন্য কারণ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সাক্ষ্য দিয়ে ঐদিনই কলকাতার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। কলকাতা থেকে পরদিন চলে যান শান্তিনিকেতনে। শান্তিনিকেতনে গিয়ে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি খুলনার সাক্ষ্য প্রদানের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানান। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন– "কবি এখানে এসে বল্লেন, হীরালালের কারাবাসের ব্যবস্থা করে এলাম। মুক্তির পরে এখানে আসতে বলেছি।"[৩৩] কারাভোগের পরই হীরালাল শান্তিনিকেতন চলে যান। কারণ কারাদণ্ডের ফলে তার চাকুরি চলে যায় এবং তিনি পুলিশের ও গোয়েন্দা বাহিনীর তৎপরতায় নিরাপত্তাহীন ছিলেন। হীরালাল শান্তিনিকেতনে গেলে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে শিক্ষক হিসেবে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে নিয়োগ করেন ১৯১০

সালে।[৩৪] ১৯০৮ সালের ডিসেম্বরে হীরালালের ছয়মাস জেল হলে আরও আগে শান্তিনিকেতনে যাওয়ার কথা। কিন্তু হীরালাল গেছেন ১৯১০ সালে। ফলে তাঁর ১৮ মাস কারাভোগের তথ্যটি সঠিক বলে ধরে নেয়া যায়। কিন্তু হীরালাল শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বেশিদিন শিক্ষকতা করতে পারেননি। ব্রিটিশ সরকারের গোয়েন্দা বাহিনীর গোপন রিপোর্টের কারণে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের তাড়ায় রবীন্দ্রনাথ ১৯১২ সালের গোড়ায় হীরালালকে শান্তিনিকেতন থেকে সরিয়ে তাঁর জমিদারি কাজে নিয়োগ করেন।[৩৫]

বিধুভূষণ বসু

১৮৭৪ সালের [৩৬] ২৭ মে বাগেরহাট জেলার কাঁঠাল গ্রামে বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সমাজ ও রাজনৈতিক কর্মী বিধুভূষণ বসু জন্মগ্রহণ করেন।[৩৭] তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল বাগেরহাটের বিষ্ণুপুরে। শৈশবে পিতৃমাতৃহারা হয়ে তিনি এক আত্মীয়ের আশ্রয়ে লালিত পালিত হন। বিষ্ণুপুর ও মূলঘর স্কুলে শিক্ষালাভ করার পর দৃষ্টিহীনতার কারণে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন নি। মূলঘর স্কুলে লেখাপড়ার সময় তিনি স্কুলের প্রধান শিক্ষক নেপালচন্দ্র রায়ের সাহচর্যে আসেন। পরবর্তীকালে নেপাল চন্দ্র রায় রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের ইতিহাসের শিক্ষক নিযুক্ত হন।[৩৮] বাগেরহাটের জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। পরে বিষ্ণুপুর স্কুল ও কলকাতার শিবপুর স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তাঁর দুজন বিখ্যাত ছাত্র হলেন বিশিষ্ট ভাষাবিদ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ লেখক ও গবেষক সুশীল কুমার দে।[৩৯]

মূলঘর স্কুলে নবম শ্রেণিতে পড়ার সময় 'সখা ও সাথী' নামক পত্রিকায় 'দেশসেবা' নামে একটা প্রবন্ধ লিখে হিরণ্যকুমার স্বর্ণপদক পান। এখান থেকেই বিধুভূষণ বসুর লেখালেখি শুরু। তারপর ১৮৯৭ সালে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম সামাজিক উপন্যাস 'লক্ষ্মীমেয়ে'। সাহিত্যিক বিধুভূষণ সারাজীবন অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন।'লক্ষ্মীমা', 'লক্ষ্মীবউ', 'সতীলক্ষ্মী', 'চারুচন্দ্র', 'অমৃতে গরল', 'সুভদ্রা', 'পাপিষ্ঠা', 'গোধন', 'কামিনী কাঞ্চন', 'দীপালীর বাজী', 'প্রখরা', 'কুলের কালি', 'নষ্টোদ্ধার', 'বিষের বাতাস', 'জ্যাঠাইমা', 'পৌত্রান্ত', 'পরিণাম', তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। তাঁর অধিকাংশ উপন্যাস সামাজিক ও পারিবারিক সমস্যা নিয়ে রচিত। 'সতীলক্ষ্মী' এবং 'অমৃতে গরল' উপন্যাস দুটির জন্য তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। 'সতীলক্ষ্মী' উপন্যাসটিতে রাজনৈতিক এবং বিপ্লবী বক্তব্য থাকায় তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার তা বাজেয়াপ্ত করেন। প্রখ্যাত ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ কার সাহেব (KAAR) লিখিত 'Political Troubles in India' গ্রন্থে লিখেছেন 'সতীলক্ষ্মী' ব্রিটিশ ভারতের প্রথম Proscribed.[৪০] উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৮৯৯ সালে এবং হিন্দি ও গুজরাটি ভাষায় অনূদিত হয়।

স্বদেশী আন্দোলনের সাথে যুক্ত থেকে বিধুভূষণ বসু জাতীয় জাগরণমূলক একাধিক নাটক রচনা করেন। নাটকগুলি হলো– 'দাদা', 'মীরকাশিম', 'রক্তযজ্ঞ', 'সোনার ফসল', 'ব্রহ্মচারিণী', 'ভগিনী বিদ্রোহ', 'বিমাতা', 'বাপের ভিটা', 'সুদর্শন', 'দুইবিঘা জমি', ও 'কালাপাহাড়'। গল্পগ্রন্থ 'বনমালা'

এবং 'মহাত্মা গান্ধীর জীবন চরিত ও 'দেশবন্ধু চরিত্র মহিমা' তাঁর রচিত জীবনীগ্রন্থ। এছাড়া 'স্মৃতিকথা' নামে তাঁর একটি আত্মজীবনী এবং শতাধিক গানের সংকলন 'গীতিহার' রয়েছে। 'বনমালা' গল্পগ্রন্থটি তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করেন। রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থ পড়ে বিধুভূষণ বসুকে একটি পত্র লিখেছিলেন–

কল্যাণীয়েসু
বিধুভূষণ,

আমি তোমার বনমালা গলায় পরলাম, দীর্ঘজীবী হয়ে বনফুল তুলে এমনি করে মালা গাঁথো। কিরাত কবি যদি হও, লেখো। এমনি হৃদয়ের জয় তার জন্য তোমার আঙ্গুল কেটে দক্ষিণা নিতে ইচ্ছা হয়।

রবীন্দ্রনাথ
বাংলা ১৩২১[৪১]

১৯০৫ সালে খুলনা শহরের কয়লাঘাটায় বিধুভূষণ রচিত 'মীরকাশিম' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। তবে নাটকটি শেষ পর্যন্ত অভিনীত হতে পারেনি। ব্রিটিশ সরকারের পুলিশ নাটকটির অভিনয় বন্ধ করে নাটকের মঞ্চ ভেঙে দেয়।[৪২] এ সময় নাটকের অভিনয় বন্ধ করে দিলেও পরবর্তীকালে নাটকটি বাজেয়াপ্ত করা হয়।

বিধুভূষণ বসু শুধু একজন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক ছিলেন না, তিনি খুলনা-বাগেরহাট অঞ্চলের প্রথম সারির কংগ্রেস নেতা এবং একজন সাংবাদিক ও পত্রিকা সম্পাদক ছিলেন। সাহিত্যিক সাংবাদিক এবং রাজনীতিক হিসেবে তিনি গুরুত্বপূর্ণ সভায় এ অঞ্চলের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন। ১৯০০ সালে বঙ্গ সাহিত্যের প্রথম সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হয় মুর্শিদাবাদের কাশিম বাজারের রাজবাড়িতে। সে অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। খুলনা-বাগেরহাট অঞ্চল থেকে তিনজন প্রতিনিধি সে সম্মেলনে যোগদান করেন। এঁরা হলেন উমেশচন্দ্র রায়, কামাখ্যাচরণ নাগ ও বিধুভূষণ বসু।[৪৩] ভারতীয় কংগ্রেস গঠিত হওয়ার পর ১৮৮৬ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সে সম্মেলনে ঐ সময় যে প্রতিনিধি দল যোগ দেন তার মধ্যে অন্যতম ছিলেন বিধুভূষণ বসু।[৪৪] বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে সকল রাজনৈতিক সামাজিক আন্দোলনে তিনি সবসময় সামনের সারিতে থাকতেন। স্বদেশী আন্দোলনের বিরুদ্ধবাদী এমএলএ পদপ্রার্থী গোবরডাঙ্গার (বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগণা জেলার একটি থানা) এক জমিদারকে ব্যঙ্গ করে 'ভোটরঙ্গ' নামক কাব্য লিখে মানহানির মামলায় অভিযুক্ত হন। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে গ্রেফতার হয়ে কারারুদ্ধ হন।

সাংবাদিক হিসেবে বিধুভূষণ আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৮৯৯ থেকে ১৯০২ সাল পর্যন্ত মাসিক 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।[৪৫] এরপর তাঁর সম্পাদনায় বাগেরহাট থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'পল্লীচিত্র' পত্রিকা।[৪৬] প্রথম থেকেই 'পল্লীচিত্র' পত্রিকায়

দেশাত্মবোধক ও স্বাধীনতার আদর্শমূলক লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। সশস্ত্র বিপ্লবীদের গোপন আস্তানায় যে সময় সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কর্মসূচি পরিকল্পনা করা হচ্ছিল, সে সময় এদশের লেখক বুদ্ধিজীবীরা পত্র পত্রিকায় স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করছিলেন। সে কারণে ব্রিটিশ সরকারের 'পল্লীচিত্র' পত্রিকার উপর প্রচণ্ড ক্ষোভ ছিল। সরকার সুযোগের সন্ধানে ছিল। ১৩১৬ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় (১৯০৯ সালের জুন-জুলাই) 'এসো মা পল্লীরাণী' নামক কবিতা এবং 'শিকার' নামে একটি গল্প প্রকাশের দায়ে বিধুভূষণকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯০৯ সালের ২১ ডিসেম্বর খুলনায় তৎকালীন পুলিশ সুপার (এসপি) মিঃ স্যালে (MR. W.A.P. Saley) সদলবলে বাগেরহাটে এসে বিধুভূষণকে গ্রেফতার করেন।[৪৭] শুধু 'পল্লীচিত্র' পত্রিকার সম্পাদককে গ্রেফতার নয়, প্রেস এবং 'পল্লীচিত্র' পত্রিকা প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়া হয়। সরকারের অভিযোগ 'এসো মা পল্লীরাণী' কবিতায় এবং 'শিকার' গল্পে শ্বেতাঙ্গ ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা গ্রহণে জনগণকে প্ররোচিত করা হয়েছে। এই অজুহাতে 'পল্লীচিত্র' পত্রিকার ঐ সংখ্যার সব কপিই নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্ত করা হয়।[৪৮] একই সাথে গ্রেফতার করা হয় পত্রিকাটির মুদ্রাকর ও প্রেসের মালিক শরৎচন্দ্র মিত্র এবং 'এসো মা পল্লীরাণী' কবিতার রচয়িতা নগেন্দ্রনাথ চন্দকে। 'শিকার' গল্পটি লিখেছিলেন বিধুভূষণ বসু।

'পল্লীচিত্র' পত্রিকার সম্পাদক ও অন্যদের বিরুদ্ধে ১২৪ (ক) ও ১৫৩ (ক) ধারা অনুযায়ী খুলনা ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে মামলা দায়ের করা হয়। এই ঘটনার মাত্র কয়েকদিন পর খুলনা শহর থেকে প্রকাশিত 'খুলনাবাসী' পত্রিকার সম্পাদক গোপাল চন্দ্র মুখার্জীকে গ্রেফতার করা হয় রাজদ্রোহমূলক লেখা প্রকাশের দায়ে।[৪৯] এই দুটি পত্রিকার সম্পাদকের পক্ষ সমর্থন করে আইনী সহায়তা দেন তৎকালীন খুলনার দুইজন জাতীয়তাবাদী নেতা ও বিশিষ্ট উকিল ইন্দ্রভূষণ মজুমদার ও নগেন্দ্রনাথ সেন। এই দুটি মামলা সম্পর্কে তৎকালীন বাংলা সরকারের মুখ্যসচিবের লেখা খুলনা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের এই চিঠিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ :

Khulna, Dated 29. 1. 10
(Camp-Kalaroa) 30th Jan.

Dear Mr. Duke,

I send the following note about Khulna political Matters for the past week to keep you informed.

The conditional order attaching the pallichitra press was made aboslute by me on 25th January.

The conditional order attaching the Khulnavasi (now called Kamala) Press was similarly made absolute on 28th January.

I frame charges under section 124A and 153A against the Pallichitra Editor and Printer and have adjourned the case for defence to the 4th February. Similarly, I have framed charges under the same section against the Khulnavasi Editor and Printer and have adjourned the case to the 5th for the defence.

Yours sincerely,
Sd/R. C. Hamilton

To
Mr. F.W. Duke, I.C.S
Chief Secretary to the Government of W. Bengal [৫০]

'পল্লীচিত্র' পত্রিকার সম্পাদকের বিরুদ্ধে সরকারের মনোভাব বরাবরই ছিল খুব কঠোর। তার কারণ ঐ বছর সে মাসে বিধুভূষণ তাঁর পত্রিকায় বিজয় নাগের জেলের অভিজ্ঞতার বর্ণনা বেশ ফলাও করে প্রকাশ করেন। সেই লেখাতে বিপ্লবীদের বহু চাঞ্চল্যকর কর্মকাণ্ডের উল্লেখ ছিল। রাজদ্রোহমূলক লেখা হিসেবে সে সংখ্যার সব কপি বাজেয়াপ্ত করে সরকার। এরপর 'এসো মা পল্লীরাণী' এবং 'শিকার' এই দুটি লেখার ইংরেজি অনুবাদ পড়ে তৎকালীন সরকার ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়। 'এসো মা পল্লীরাণী' কবিতার ইংরেজি অনুবাদ নিম্নরূপ :

Esho ma polli-rani

Come Oh mother Queen of the village, the day is drawing its full length to a close. Let thy children rise up with bounding hearts hearing thy great voice. I have sacrificed my life to take away the crown of victory from the enemy's brow and decorate thee thou Queen of Queens with it in the battle of life.

Led by mistaken ideas and tormented by passion, I did not preceive and could not feel at heart when (thy) golden seat disappeared.

Under the stamp of Asur's feet there are no Parijat flowers in the Nandan Gardens' and in the garb of a beggar, Indrani is sorely suffering in the most recess [sic] of her heart.

The Suras who have conquered death, see all this before them

and like cowards shut up their eyes for hatred and shame. Oh, mother, I do not know when for the Swadesh, the gods will rise up in a body, and buring with rage as fierce as the world-destroying fire kill the force of their adversaries, and relying on their own strength and taking up their won arms, re-establish the throne of the Heavens by offering drinks of blood to the manes.[৫১]

১৯০৯ সালের ৮ ডিসেম্বর ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারি এক চিঠিতে বাংলা সরকারের মুখ্যসচিবকে জানান, খুলনা জেলার বাগেরহাট থেকে প্রকাশিত 'পল্লীচিত্র' পত্রিকার বিরুদ্ধে ১৯০৮ সালের নিউজ পেপার এ্যাক্ট অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।[৫২] ১৬ ডিসেম্বর বাংলা সরকারের মুখ্যসচিব খুলনার এসপিকে এই মর্মে নির্দেশ পাঠান। এসপি সেই নির্দেশ মতো ২১ ডিসেম্বর বিধুভূষণকে গ্রেফতার করেন। আমরা পূর্বে সে বিষয়টি উল্লেখ করেছি। উল্লেখ্য যে, 'পল্লীচিত্র' পত্রিকার বিরুদ্ধে যে এ্যাক্ট অনুসারে ব্যবস্থা নেয়া হয়, ইতোপূর্বে মাত্র চারটি পত্রিকার বিরুদ্ধে এই আইন প্রয়োগ করা হয়। পত্রিকাগুলো হলো– 'বন্দেমাতরম', 'সন্ধ্যা', 'সোনার ভারত' ও 'প্রভাত'।[৫৩]

খুলনা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে 'পল্লীচিত্র' পত্রিকার বিচারপর্ব শেষ হয় ১৯১০ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি। সম্পাদক বিধুভূষণ দুই বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং মুদ্রাকর শরৎচন্দ্র মিত্রকে দুই মাস সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।[৫৪] Robert Darnton তাঁর 'Books in the British Raj : The Contradictions of Liberal Imperialism' গ্রন্থে লিখেছেন–

"Consider the following poem, which was published in a literary review, Pallichitra, in 1910 and typifies the material condemned and seditious in the courts. Because its author could not be identified (he was later found and sent to prison for two years), the editor of the volume, Bidhu Bhusan Bose, was put on trial before a district magistrate, R. C. Hamilton in Khulna, Bengal. After pronouncing Bose guilty of sedition under section 124A of the indian penal code, the judge declared that he deserved to be transported for life, so heinous was his crime. In the end he was sentenced to two years of rigorous imprisonment, and his printer had to serve two months as an accomplice. What, then, was the wickedness in the following words, which are given in the translation from the Bengali provided by the official court translator.?"[৫৫]

'এসো মা পল্লীরাণী' কবিতার লেখক নগেন্দ্রনাথ চন্দ ইতোপূর্বে বাংলা স্বদেশী ডাকাতী মামলায় গ্রেফতার হয়ে দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন।[৫৬] 'পল্লীচিত্র' পত্রিকার মামলার রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করা হয়। কিন্তু হাইকোর্ট খুলনা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের রায়ই বহাল রাখেন। তবে 'পল্লীচিত্র'

প্রেসের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়।[৫৭] এই রায় সম্পর্কে কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'অমৃতবাজার' পত্রিকার সম্পাদক মতিলাল ঘোষ তাঁর সম্পাদকীয়তে লেখেন– "সম্পাদক সচেতন তাই অপরাধী, ছাপাখানা অচেতন তাই নিরাপরাধ।"[৫৮] হিতবাদী পত্রিকার সম্পাদক শ্রী ভুবনমোহন দেব 'পল্লীচিত্র' পত্রিকার মামলায় বিধুভূষণের পক্ষ নিয়ে চার কিস্তি সম্পাদকীয় প্রকাশ করেন। তাতে ব্রিটিশ সরকারের দমননীতির কঠোর সমালোচনা করা হয়।[৫৯] 'সন্ধ্যা' পত্রিকার সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়[৬০] সেটাকে অপমানজনক মনে করে জরিমানা দিয়ে শর্তসাপেক্ষে পত্রিকা প্রকাশের চেয়ে বন্ধ করে দেয়াকে শ্রেয় মনে করেছিলেন।[৬১] জেল থেকে মুক্তি পেয়ে বিধুভূষণ বসু পুনরায় 'পল্লীচিত্র' পত্রিকা প্রকাশে আত্মনিয়োগ করেন। তবে পত্রিকাটি নানা কারণে বেশিদিন চলেনি। তবে যতদিন টিকে ছিল সে সময় অগ্নিযুগে স্বাধীনতা সংগ্রামকে উজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে গৌরবময় ভূমিকা রেখেছিল। পরবর্তীকালে ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর বিধুভূষণ বসু কলকাতায় চলে যান। ১৯৭২ সালের ৩১ জানুয়ারি তিনি পরলোকগমন করেন।

উপসংহার

বিশ শতকের গোড়ায়-ভারতবর্ষে বিশেষ করে বাংলায় ব্রিটিশ বিরোধী নানামাত্রিক আন্দোলন শুরু হয়। নতুন নতুন সংগঠন তৈরি করে দেশপ্রেমিক তরুণরা প্রথমে শরীরচর্চা ও অন্যান্য কর্মসূচির আড়ালে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। একদিকে বিপ্লবীদের সশস্ত্র সংগ্রাম, অন্যদিকে কংগ্রেস ও অন্যান্য রাজনৈতিক সংগঠনের বিভিন্নমুখী আন্দোলন চলতে থাকে। এর পাশাপাশি দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবী, লেখক, সংবাদকর্মীরা তাঁদের অবস্থান থেকে লেখালেখির মাধ্যমে জনগণকে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত করতে থাকেন। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী কখনও কখনও বোমার চেয়ে এই লেখা ও লেখকদের বেশি ভয় পেতে শুরু করেছিল। সেজন্যে তারা বিভিন্ন কালো আইন তৈরি করে সংবাদপত্র, গ্রন্থসহ নানারকম সৃষ্টিশীল প্রকাশনা বন্ধ, বাজেয়াপ্ত, নিষিদ্ধ করে। লেখক, প্রকাশক, সংবাদকর্মীদের বিরুদ্ধে শুরু করে নির্বিচারে নির্যাতন ও দমনপীড়ন। এক কথায় তারা সচেতন জনগণ, লেখক ও পত্রপত্রিকার কণ্ঠরোধ করে। এর প্রেক্ষিতে তাদের বিরুদ্ধে অজ্ঞাতস্থান থেকে ছদ্মনামে বা বেনামে আরো বেশি লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। তাছাড়া বাজেয়াপ্ত, নিষিদ্ধ বইপত্র স্বাভাবিক আগ্রহে ও কৌতূহলে জনগণ খুঁজে খুঁজে পড়তে থাকে। মানব সভ্যতার উষালগ্ন থেকে অগণতান্ত্রিক, বৃহত্তর জনগণের বিরুদ্ধচারী সরকার তার ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য মানুষের মুক্তচিন্তা, স্বাধীনতাকামী ভাবনা প্রকাশের ক্ষেত্রে সংকোচন নীতি গ্রহণ করেছে; পত্র-পত্রিকা বইপত্র ইত্যাদি নিষিদ্ধ করেছে। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনামলে সুদীর্ঘ সময় ধরে তৎকালীন সরকার এই কাজ করেছে পুলিশ, গোয়েন্দা, আমলাসহ অন্যদের দ্বারা। প্রকৃতপক্ষে তা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকারের দমননীতির স্বরূপ জনগণের কাছে প্রকাশিত হয়।

তথ্যসূত্র

১. শিশির কর, *ব্রিটিশ শাসামলে বাজেয়াপ্ত বাংলা বই*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ জুলাই ২০১৫, পৃষ্ঠা ১৭

২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৭

৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৩

৪. মেকলে ভারতীয়দের জন্য প্রণীত শিক্ষানীতিতে এক সুচতুর পরিকল্পনা করেছিলেন–"To form a class who may be interpreters between us (The British) and the millions whom we give, a class of persons Indian in blood and colours but English in test, in morals and in intellect."

৫. শিশির কর, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৬

৬. No 7454-58. S.B dated 27.7.1909. To all commissioners in E. Bengal and Assam. By chief Secretary, E. Bengal and Assam.

৭. *Letters of sister Nivedita.* Edited by Prof. Sankari Prasad Basu, vol. 11, Advaita Ashrama, Kolkata; 2017, P. 1115

৮. শিশির কর, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩০

৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩২

১০. ১০ অক্টোবর, ১৯০৫ জারি হয় কার্লাইল সার্কুলার। ৮ নভেম্বর ১৯০৫ পূর্ববঙ্গের চিফ সেক্রেটারি লায়ন ঢাকা বিভাগের কমিশনারের কাছে দুটি সার্কুলার পাঠান। তাতে রাস্তায় প্রকাশ্য স্থানে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দেওয়া, প্রকাশ্য স্থানে রাজনীতিমূলক আলোচনার জন্য সভা সমিতি করা, দলবদ্ধভাবে 'বন্দেমাতরম' গান করা নিষিদ্ধ হয়।

১১. শিশির কর, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪৬

১২. অজিত কুমার নাগ, *স্বাধীনতা সংগ্রামে খুলনা*, সেলস এ্যালায়েনস, কলিকাতা, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ৩৬

১৩. চিন্মোহন সেহানবীশ, *রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবী সমাজ*, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা পৌষ ১৪০৪ (১ম প্রকাশ ১ বৈশাখ ১৩৯২), পৃষ্ঠা ২৭

১৩ (খ) অজিত কুমার নাগ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪৫

১৪. অজিত কুমার নাগ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩১

১৫. প্রশান্ত কুমার পাল, *রবিজীবনী (ষষ্ঠখণ্ড)*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ৫ম মুদ্রণ ১৪১৮, পৃষ্ঠা ৩৪

১৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৪

১৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৪

১৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা৩৪

১৯. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রনাথের কথা*, ১৩৫৩, কলিকাতা, পৃষ্ঠা ২৮

২০. চিন্মোহন সেহানবীশ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৭

২১. চিন্মোহন সেহানবীশ তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবী সমাজ' গ্রন্থের ৩৩নং পৃষ্ঠায় শ্রী দিলীপ মজুমদারের 'বন্দীহত্যা বন্দীমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের ভূমিকায় শ্রী প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা উদ্ধৃত করেছেন "...সরকারের

দৃষ্টিতে কবি নিজেও একজন 'দাগী' ছিলেন। শুনেছি কলকাতায় থাকাকালীন তিনি যখন ঘোড়ার গাড়িতে চেপে রাস্তা দিয়ে যেতেন সেই সময় জোড়াসাঁকো থানা থেকে পুলিশ হেঁকে জানিয়ে দিত অমুক নম্বর আসামী যাচ্ছে।"

২২. চিন্মোহন সেহানবীশ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৭–২৮

২৩. প্রশান্ত কুমার পাল, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৪

২৪. শিশির কর, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১০২ ও অজিত কুমার নাগ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৭

২৫. প্রশান্ত কুমার পাল, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৪

২৬. চিন্মোহন সেহানবীশ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৮

২৭. প্রশান্ত কুমার পাল, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৫

২৮. চিন্মোহন সেহানবীশ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৮

২৯. প্রশান্ত কুমার পাল, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৫

৩০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৫

৩১. তুহিন শুভ্র ভট্টাচার্য, *ব্রিটিশ পুলিশের 'টিকটিকি' ও অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের গুপ্তচর*, পত্রলেখা, কলকাতা, ২০১৯, পৃষ্ঠা ৪৫

৩২. শিশির কর, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫৯

৩৩. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৮

৩৪. প্রশান্ত কুমার পাল, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৫

৩৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৫

৩৬. ড. শেখ গাউস মিয়া তাঁর রচিত *আলোকিত মানুষের সন্ধানে : বৃহত্তর খুলনা জেলা (১ম খণ্ড)* গ্রন্থে বিধুভূষণ বসুর জন্ম সন উল্লেখ করেছেন ১৮৭৫। তিনি তারিখ উল্লেখ না করলেও মাসের নাম লিখেছেন মে মাস। পৃষ্ঠা ৩৬৬

৩৭. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা) *বাংলাপিডিয়া ৭ম খণ্ড*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩, পৃষ্ঠা ৯৭

৩৮. ড. শেখ গাউস মিয়া, *আলোকিত মানুষের সন্ধানে : বৃহত্তর খুলনা জেলা, (১ম খণ্ড)* সাঁকো বাড়ি প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৫, পৃষ্ঠা ৩৬৬

৩৯. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৯৭

৪০. ড. শেখ গাউস মিয়া, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৬৮

৪১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৬৯

৪২. ড. শেখ গাউস মিয়া, *বাগেরহাটের ইতিহাস ১ম খণ্ড*, বেলায়েত হোসেন ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত, বাগেরহাট, ২০০১, পৃষ্ঠা ২৭০

৪৩. ড. শেখ গাউস মিয়া, *আলোকিত মানুষের সন্ধানে : বৃহত্তর খুলনা জেলা*, পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৩৬৭

৪৪. সুকুমার মিত্র (সম্পা), *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যশোর ও খুলনা*, কলকাতা, কালান্তর প্রেস, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ৩৮

৪৫. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৯৭

৪৬. বাগেরহাট থেকে প্রকাশিত মাসিক 'পল্লীচিত্র' পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশনার সময়কাল ড. শেখ গাউস মিয়া তাঁর 'আলোকিত মানুষের সন্ধানে : বৃহত্তর খুলনা জেলা' গ্রন্থের ৩৭০নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন ১৯০৬ সাল ১৩১৪ বঙ্গাব্দ এবং সুশান্ত সরকার বাংলাপিডিয়া (সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত) ৭ম খণ্ডের ৯৭নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন ১৯০৮ সাল।

৪৭.অজিত কুমার নাগ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫৮

৪৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫৯

৪৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫৯

৫০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫৯

৫১. Robert Darnton, Books in the British Raj : *The Contradictions of Liberal Imperialism,* The Johns Hopkins University Press, September 2001, USA, P. 18

৫২. অজিত কুমার নাগ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬১

৫৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬১

৫৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬১

৫৫. Robert Darnton, Do, P.18

৫৬. ড. শেখ গাউস মিয়া, *আলোকিত মানুষের সন্ধানে : বৃহত্তর খুলনা জেলা*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৭১

৫৭. অজিত কুমার নাগ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬১

৫৮. ড. শেখ গাউস মিয়া, *বাগেরহাটের ইতিহাস* ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৯৭

৫৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৯৭

৬০. ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের প্রকৃত নাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ছাব্বিশ বছর বয়সে দীক্ষা নেন ব্রাহ্মধর্মে। ব্রাহ্ম থেকে প্রোটেস্টান্ট, প্রোটেস্টান্ট থেকে ক্যাথোলিক এবং অবশেষে ফিরে আসেন হিন্দুধর্মে। বাংলা সাংবাদিকতাকে তিনি এলিট শ্রেণির বৈঠকখানা থেকে বের করে এনেছিলেন হাটে বাজারে; সাধারণ মানুষের মুখে-মিছিলে।

৬১. ড. শেখ গাউস মিয়া, *আলোকিত মানুষের সন্ধানে : বৃহত্তর খুলনা জেলা*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৭২

BL College Journal

ISSN 2664-228X
Volume -1, Issue-2, 2019
pp. 26-39

দিনের রশিতে গিটঠু : ব্রাত্যজনের দ্রোহকথা

রামী চক্রবর্তী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর, আসাম-৭৮৮০১১, ভারত
ই-মেইল : ramichakraborty12@gmail.com

সারসংক্ষেপ

মুক্তিযুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' বলে আখ্যায়িত করতে চেয়েছিলেন ঔপন্যাসিক সেলিনা হোসেন। এই 'জন' বলতে কাদের বোঝায় এ প্রশ্নের নিরপেক্ষ জবাব হওয়া উচিত আপামর জনসাধারণ অর্থাৎ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, সব বয়সের নারী পুরুষের সমান উপস্থিতি। কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা এবং চিন্তাচেতনায় প্রভাবিত ইতিহাস তথা সাহিত্য সবসময়ই একপেশে নির্বাচনে নারীকে তার যোগ্য অবস্থান এবং মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করে এসেছে চিরকাল। তাই ইতিহাসে যেমন নারীর কর্মযজ্ঞের দলিলের অন্তর্ভুক্তি ঘটেনি তেমনি সাহিত্যেও সমর্থিত হয়নি এদের স্বাতন্ত্র্যের আখ্যান। আর যেটুকু হয়েছিল তা ছিল পিতৃতন্ত্র কথিত, নির্দেশিত এবং সমর্থিত। কিন্তু তবুও সময়ের উজানে কথার পরম্পরা এগিয়ে চলে। অলক্ষ্যে ঘটে যাওয়া নারীর নিজস্ব বয়ানে উঠে আসে তাদের অলিখিত ইতিহাস। সময়ের প্রবহমানতায় হাজারো বাধা সত্ত্বেও মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে রচিত হয় 'দিনের রশিতে গিটঠু'-র মতো উপন্যাস। সহস্র নারীর অন্তঃস্বরে ইতিহাস আর সাহিত্য একাকার হয়ে যায়।

বীজশব্দ

মুক্তিযুদ্ধ, নারীর অন্তঃস্বর, ইতিহাস, অন্তর্বয়ন

উদ্দেশ্য

ইতিহাস যখন সাহিত্যের বিষয় হয়ে ওঠে তখন দু'য়ের যৌক্তিক পারম্পর্যের প্রয়োগে লেখককে সাবধানী প্রহরীর ভূমিকা নিতে হয়। লেখকের দ্রষ্টা চক্ষুকে সর্বদা জাগিয়ে রাখতে হয় যেন একটি অপরটিকে আচ্ছন্ন না করে ফেলে। এ উপন্যাসে একদিকে যেমন 'মুক্তিযুদ্ধ' এর মতো একটি ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে কেন্দ্র করে আখ্যান রচিত হয়েছে, ঠিক তেমনি সমান্তরালভাবে সমাজে নারীর অবস্থান মর্যাদা ইত্যাদি নিয়েও স্বাতন্ত্র্যের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। নারীকে যুদ্ধ করতে হয় তার বহির্জগত তথা অন্তর্জগতের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধেও। কখনো ঐতিহাসিক ব্যক্তিবর্গের সরাসরি উপস্থাপনে তো কখনো সাহিত্যের শর্ত মেনেই কিছুটা পরিবর্তিত পরিচয়ে এ উপন্যাসে নারীর মৌলিক অবস্থানকে নানা ভূমিকায় চিহ্নিত এবং বিশ্লেষণের প্রয়াসই এই প্রবন্ধ।

বিশ্লেষণ

> 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ একটি জনযুদ্ধ। জনযুদ্ধে সম্পৃক্ত হয় দেশের আপামর মানুষ। ব্যাপক জনগোষ্ঠীর দুঃখ কষ্টের অনুষঙ্গ যুদ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। সে কারণে জীবন ও যুদ্ধ সমান্তরাল হয়ে যায়। সেটি সৃজনশীল সাহিত্যের উপাদান হিসেবে আর দুরূহ থাকে না। তখন তা যে কোনো লেখকের জীবনের কাহিনী হিসেবে প্রস্ফুটিত হয় বিকশিত হয় সৃজনশীলতার সৌন্দর্যে, কাঠিন্যে, রঙে এবং আকারে।'[১]

মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে এরকমই মন্তব্য করেছিলেন স্বনামধন্য ঔপন্যাসিক সেলিনা হোসেন। বাংলাদেশের হয়ে ওঠার যে প্রক্রিয়া, যে ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধ সেই সময় পরিসরের ঐতিহাসিক স্বাক্ষর। বাংলাদেশের সাহিত্যে তাই মুক্তিযুদ্ধকে ঘিরে প্রত্যয়-প্রত্যাশার বয়ান যেমন রচিত হয়েছে, ঠিক তেমনি অনভিপ্রেত হতাশার উচ্ছ্বাসও কম বর্ণিত হয়নি। সেটাই স্বাভাবিক। দেবেশ রায় তাঁর উপন্যাস বিষয়ক প্রবন্ধগ্রন্থ 'উপন্যাসের নতুন ধরণের খোঁজে' গ্রন্থটিতে বলেছিলেন, 'সমকালকে ধরতে না পারলে উপন্যাস বাঁচে না, আবার সমকালকে ধরেও উপন্যাস বাঁচে না। সময়ের কাছে দায়বদ্ধ বলেই ঔপন্যাসিক লেখেন, ...'[২]

কথাটির অন্তর্নিহিত মূল্যটাকে বুঝতে চাই একজন নিবিড় পাঠক হিসেবে। সময়ের প্রহরী হিসেবে, সত্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বাস্তবের রূপকার হিসেবে একজন ঔপন্যাসিকের অন্বিষ্ট তাহলে কী বা কতটুকু? শুধুমাত্র 'সমাজ, সময় আর ইতিহাসধৃত ব্যক্তিমানুষের' যাপিত জীবন। প্রাবন্ধিক দেবেশ রায়ের কথার অনুসরণে বলা যায় যেখানে সময়, সমাজ আর ইতিহাসের প্রাধান্য বেড়ে যায়, সেখানে ব্যক্তিমানুষ অবাধ চলার পথে হোঁচট খায়। ফলে সময় আর মানুষের মধ্যে সঙ্গতি বিধান করে চলাটাকেই একজন ঔপন্যাসিকের 'শিল্পগত জরুরি প্রশ্ন' বলতে চেয়েছেন প্রাবন্ধিক। এই একই দৃষ্টিভঙ্গিগত ভাবনার বিস্তার থেকেই কোনও একটি নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে রচিত উপন্যাস কিংবা সাহিত্যের যেকোনও মাধ্যম সম্পর্কে পাঠকের মনে প্রত্যয়-প্রত্যাশা কিংবা নিরাশার বোধটিও জেগে ওঠে। এক একজন পাঠকের কাছে তার নিজস্ব অনুভবের দৃষ্টিতে এক একটি লেখা হয়ে উঠবে 'সব পেয়েছির দেশ' এমনটাই অভিপ্রেত থাকে। একজন লেখকও সেই অনুভবের জগতকেই ধরতে চান, তবে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিতে। 'সময়ান্বিত ব্যক্তি'-র আবিষ্কারক যেহেতু লেখক নিজেই তাই তাঁর উপস্থাপনার করণ-কৌশলও ভিন্ন। এখানেই লেখক এবং পাঠকের পাঠজাত দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন বলে মনে হয়। প্রত্যাশা-নিরাশার দিগন্ত তৈরি হয়। সেলিনা তাই বলেন,

> 'নিজের প্রতি সৎ থেকে নিজের অনুভবকে শক্ত মেরুদণ্ড দেওয়া লেখকের কর্তব্য। তিনি যেন কখনো পরগাছা না হন, অন্যের ইচ্ছে অনিচ্ছের দাসত্ব স্বীকার না করেন। জনপ্রিয়তা ভালো লেখকের বিবেচনার বিষয় নয়। রাজনৈতিক কমিটমেন্ট লেখকের মানসিক আশ্রয়। মানবিক উচ্চারণ লেখকের প্রাথমিক শর্ত, দেশকাল তাঁর জীবনযাপনের অষ্টপ্রহর যন্ত্রণা। এতোকিছুর পরও শর্ত ভালো লেখা- বিপ্লবী দায়িত্ব ভালো লেখা।'[৩]

এই ভালো লেখার বৈপ্লবিক শর্ত পালনের দায় থেকেই সেলিনা লেখেন। তাঁর লেখার বিষয় বিচিত্র। সাধারণ থেকে অসাধারণ, খেটে খাওয়া মানুষের রোজনামচা তথা মধ্যবিত্ত জীবন, মুক্তিযুদ্ধ দেশভাগ, আবার সমকালকে চিরকালের সঙ্গে একসূত্রে গেঁথে দিয়ে মিথের পুনর্বয়ানেও সেলিনার

লেখনী প্রাক্-আধুনিক সাহিত্যের উপাদান খুঁজে বেড়ায়। যিনি বলেন 'আমার একহাতে লেখালেখি, অন্যহাতে জীবনের বাকিটুকু' তাঁর কাছে লেখা মানে যে এক অর্থে ব্যক্তিগত তো বটেই সামাজিক দায়ও, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা এলেই নারীর প্রসঙ্গটি আলোচনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। যুগের পর যুগ ধরে নানা খাতে বঞ্চিত হয়ে আসা নারীর জীবন সত্যি অর্থেই বিশ্লেষণের দাবি রাখে। সভ্যতার প্রাক্‌মুহূর্তে সব দিক থেকে সামাজিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থেকেও একটা সময় ধীরে ধীরে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াতেই সে উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে সমাজ সভ্যতার দলিল হিসেবে ইতিহাস লিখনের প্রক্রিয়া থেকেও বাদ পড়ে নারীর জীবন। কেননা ইতিহাসের স্রষ্টা এবং সৃষ্টির বিষয় পাকেচক্রে পিতৃতন্ত্রাধীন হওয়ার ফলে নারীর কোনও ভূমিকাই সেখানে লিখিত হয় না। অসূর্যম্পশ্যা অন্তঃপুরের অবলা জীব হয়েই নারীকে যাপনের অভিশাপ বয়ে নিয়ে চলতে হয় আজীবন। কিন্তু কালচক্র থেমে থাকে না। তাই নিয়ত পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থায় একদিন নারীকেও স্বরূপ সন্ধানের মুখোমুখি হতে হয়। সব অবরোধের পিঞ্জরকে ঠেলে দিয়ে একদিন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সবস্তরেই নারীর অংশগ্রহণ বাস্তবতার নিজস্ব শর্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু সূচনা থেকে বাস্তবায়নের যে দীর্ঘ পথযাত্রা তাকে স্বীকৃতি দিতে কোনও কালেই রাজি ছিল না এই পিতৃতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন প্রশাসন, সমাজ, পরিবার কেউই। ফলে নারীর সংগ্রামের আন্দোলনের কোনও ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিত হয় না। যেটুকু পাওয়া যায় সবই বিক্ষিপ্ত এবং পুরুষের ইচ্ছা নির্ধারিত। ফলে একজন নারীকেই সেই দায়িত্ব নিতে হয়। এতে কি শুধু তার নিজস্ব বয়ানই লিপিবদ্ধ হয়? মনে হয় না, এতে ভিন্ন প্রেক্ষিতে সময়োপযোগী ঘটনার ভিন্নপাঠের সঙ্গেও আমরা পরিচিত হই। শুধুমাত্র যথাপ্রাপ্ত সাহিত্যের পুনরাবলোকন এবং পুনঃপাঠের মাধ্যমেই নারীর বিকল্প বয়ান নির্মিত হতে পারে। আমাদের আলোচ্য উপন্যাসেও আমরা এক নারীর বয়ানে সেই মুক্তিযুদ্ধোত্তর একটি দেশের নারীর অবস্থানকে পাঠ করব যাদের সংগ্রামের কথা লিপিবদ্ধ হয় না দেশের সমকালীন ইতিহাসে। এক নারীর কথনে উঠে আসে হাজারো নিরক্ষর নারীর দেশভাবনার স্বতন্ত্র আখ্যান। হেলেন সিঁখো বলেছিলেন,

> 'The voice in each woman, moreover, is not only her own, but springs from the deepest layers of her psyche: her own speech becomes the echo of the primeval song she once heard, the voice of the incarnation of the first voice of the love which all women preserve alive.'[৪]

এভাবে একই স্বরের মধ্যে জেগে ওঠা অজস্র স্বরের ঐকতানেই নারীর ইতিহাসে অন্তর্ভুক্তির মহাকালীন ইশারা বিম্বিত হয়ে ওঠে।

'দিনের রশিতে গিটঠু' উপন্যাসটিতে মুক্তিযুদ্ধোত্তর দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীর অবস্থানের কথা তুলে ধরা হয়েছে কথক যুথিকার দৃষ্টিতে। উপন্যাসের শুরু হয়েছে একটি কাহিনি বর্ণনার মধ্য দিয়ে। রহিমুন, সিতারা আর সুলেখাকে নিয়ে আরজাতুন এবং আব্দুল হান্নান এর

সংসার। একমাত্র ছেলে আব্দুল মালেক যুদ্ধে গেছে দেশ স্বাধীনের স্বপ্ন নিয়ে। এই যুদ্ধ যুদ্ধ স্বপ্ন ধীরে ধীরে পরিবারের গণ্ডিতে বদ্ধ মেয়েদের মধ্যেও শেকড় ছড়িয়েছে। তাই সুলেখাও স্বপ্ন দেখে যুদ্ধে যাবার। শুধু তাই নয় যুদ্ধের কাজে লাগার মতো ঘটনাকে তারা পবিত্র কাজ বলে মনে করে। যুদ্ধ শুধু ধ্বংসাত্মক কোনও ঘটনা নয় এদের কাছে। যুদ্ধ এক অর্থে হয়ে উঠেছে তাদের যাপনের সঙ্গে জড়িত এক বিশেষ প্রক্রিয়া যা তাদের অস্তিত্ব সংগঠনে সাহায্য করে। যুদ্ধে মৃত্যুর কাছে রাজাকার বা পাকিস্তানী আর্মিদের আক্রমণের ভয়ও তুচ্ছ মনে হয় তাদের। তাই মৃত্যুর নিজস্ব পথ বেছে নিয়েও তারা অকুতোভয় থাকে। যুদ্ধ মুহূর্ত যেন প্রতিটি ব্যক্তিকে তার নিজস্ব যোগ্যতা অনুযায়ী তৈরি করে নেয়। কোল্লাপাথরের এই পরিবারটি সম্পূর্ণ অন্যধরনের একটি কাজে সম্পৃক্ত করেছে নিজেদের। যুদ্ধান্তে শহিদদের শান্তিতে কবর দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে এ পরিবার। আরজাতুনই এর মূল হোতা। সম্পূর্ণ নতুনভাবে স্বাধীন দেশের স্বাধীন মনের নারী হিসেবেই ঔপন্যাসিক এঁকেছেন এদের। যুদ্ধাহত ব্যক্তির যে কোনও ধর্ম হয় না, পরিচয় হয় না, তাদের একটাই পরিচয় 'ওনারা মুক্তিযোদ্ধা' এই ভাবনার শরিক কিন্তু অজ পাড়াগাঁয়ের এক নিরক্ষর নারী। নিজেই সে নিজেকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেছে। তবে তাৎক্ষণিক চেতনাই তার প্রশিক্ষক। যুদ্ধকালীন পরিবেশই তার প্রশিক্ষণের কর্মক্ষেত্র।

> 'আরজাতুনের মনে হয় ও যুদ্ধের অন্য একটি ক্ষেত্রের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য নিজেকে তৈরি করছে। এখন শক্ত পায়ে দাঁড়ানোর সময়। ... আমাগো সামনে এখন মেলা কাম। কিসের কাম আম্মা? শহীদের দাফনের। মুক্তিযোদ্ধার লাশ দাফন।'[৫]

আবার তার ভাবনায় যখন ভালোবাসার যোগ্য পুরুষের কল্পনায় বিপরীতধর্মী চিন্তাও উঠে আসে,

> 'যারা দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন বাজি রাখে, তারাই তো যোগ্য পুরুষ দু'বোনের বুকের ভেতরে ভালোলাগার শালদা নদী বয়ে যায়। কিন্তু সেটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না ভাবে, দেশের জন্য যুদ্ধ করলেই কি তারা মেয়েদের জন্যও ভালো মানুষ হবে যদি তা-ই হতো, তাহলে চারপাশের এ মেয়ের জীবনে এত দুঃখ কেন?'[৬]

তখন মনে হয়, এভাবেই বোধহয় মেয়েদের নিজস্ব উপনিবেশ তৈরি হয়ে যায় নিজস্ব নিয়মেই, চেতনায়- কর্মজগতে সর্বত্রই। লেখক স্বর আখ্যানের স্বাভাবিকতা বজায় রেখেও নারী সম্পর্কিত ভাবনায় নিজস্ব প্রত্যয়ের শরিক করে নেন পাঠককে। '… Language was always more than a cultural concern.'[৭] যুদ্ধের সাংস্কৃতিক আবহেও যে মেয়েদের জন্য সবসময় পৃথক এক যুদ্ধক্ষেত্র তৈরি থাকে শুধুমাত্র নারী হওয়ার সুবাদে, লেখকের প্রত্যয়ী বাচন আমাদের এই নারীচেতনাবাদী পাঠে সংবেদী করে তোলে। প্রকৃত যোদ্ধা একজন প্রকৃত 'মানুষ' না-ও হতে পারেন। তিনি একজন পুরুষ আর তার এই পরিচয় এবং আচরণের সঙ্গেই একটি মেয়ের কাছে 'ভালো মানুষ' হওয়ার আখ্যা বিচার্য হয়ে থাকে। একজন পুরুষ স্রষ্টার বয়ানে যেখানে 'মুক্তিযোদ্ধা' এই বিশেষণের চাপে তার অন্য সব চারিত্রিক বা মানবিক খামতি ঢাকা পড়ে যেত কিন্তু নারী লেখক বলেই সেই লৈঙ্গিক

চেতনার দিকটি পৃথক ভাবে উদ্ভাসিত হয়। 'Because feminist criticism centralises 'woman' it is sociolinguistic in nature, describing woman's writing with a practical attention to the physical use of words.'[৮]

শব্দের এই আক্ষরিক ব্যবহারও আবার সময় বিশেষে ব্যঞ্জনার্থে সাংকেতিক হয়ে ওঠে। সাংস্কৃতিক ভাবাদর্শের চিহ্নায়নে যখন একজন নিরক্ষর অজ্ঞাতকুলশীল মাতৃসত্তাই রাজনৈতিক চেতনায় যুদ্ধে হারানো হাজারো সন্তানের মা হয়ে ওঠেন। নিজের মুক্তিযোদ্ধা সন্তান আব্দুল মালেকের নিথর দেহটি তাদের কাছে মনে হয় 'ঝাঁঝরা বুকটাই যুদ্ধক্ষেত্র'। আরজাতুনের স্তব্ধ কান্না আর বিদীর্ণ নীরবতাতেই শহিদের দাফনের ব্যবস্থা করে দেওয়া এক সামান্য নারী হয়েও সে প্রকৃত 'মুক্তিযোদ্ধা'র সম্মান অর্জন করে। 'তারপর রক্তমাখা আঁচলটা পিঠের ওপর টেনে মাথায় উঠিয়ে দেয়। ... তার মাথায় রক্তমাখা আঁচলটা পতাকার মতো উড়ছে। আরজাতুন একা নয় কোটি কোটি মানুষের একটি অবয়ব। একটি প্রতীকী ভাস্কর্য হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।'[৯]

সেলিনা তাঁর প্রবন্ধে বলেছিলেন যে বক্তব্যের গভীরতা এবং নির্মাণ কৌশল এই দুটি শর্তই একজন লেখকের ক্ষেত্রে সতত ক্রিয়াশীল থাকে। তাঁর কথার সূত্র ধরেই বলা যায় বক্তব্যের গভীরতা এবং নির্মাণের অভিনবত্বে মৃত শহিদ সন্তানের রক্তমাখা মায়ের আঁচলই কখন যেন ব্যক্তিগত-এর সীমানা ছাড়িয়ে স্বাধীনতার সার্বিক আকাঙ্ক্ষার সম্ভাবনার প্রতীক পতাকায় রূপান্তর ঘটেছে।

এটা আসলে মূল আখ্যান নয়। আখ্যানের ভেতরে গড়ে ওঠা আরেক আখ্যান। আলোচ্য উপন্যাসের মূল চরিত্র যুথিকার বয়ানে লিপিবদ্ধ হয়। অজস্র স্বরবিন্যাস তো উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রাসঙ্গিক হতে পারে দেবেশ রায়ের এই মন্তব্যটি,

> 'উপন্যাসের লেখকের কোনো নিজস্ব ভাষা নেই কিন্তু সমস্ত ভাষার মধ্যেই উপন্যাস লেখকের ভাষা ছাড়িয়ে থাকে। উপন্যাস বা উপন্যাস হিসেবে আমরা পাঠ করতে চাই এমন রচনাগুলিকে বিভিন্ন চরিত্রের কণ্ঠস্বরের বলয়ে বা বিভিন্ন চরিত্রের সক্রিয়তার বলয়ে আমরা ভাগ করে নিতে পারি।'[১০]

এভাবেই আখ্যানের ভিতরে আখ্যানের বহুমাত্রিক স্তর পেরিয়ে সেলিনা পৌঁছে যেতে চান মূল চরিত্রে। হয়তো এভাবেই ঔপন্যাসিক 'অতিনির্দিষ্ট অন্তর্ঘাতে'র মধ্য দিয়ে উপন্যাস রচনার মূলভাবটিকে 'অতিনির্দিষ্টতা' দিতে চান। পাঠক হিসেবে আমরাও কাহিনির নির্মোক সরিয়ে প্রচ্ছন্ন নির্যাসকে আবিষ্কার করি। প্রকৃত অর্থে গোটা উপন্যাসটিই কতকগুলো বিক্ষিপ্ত ঘটনার সমবেত দলিল। যার সূত্রধর বা কথক যুথিকা নিজেই। এই যুথিকা চরিত্রটিকেও যুদ্ধকালীন ইতিহাস থেকেই চয়ন করেছেন সেলিনা। ইতিহাসের সাক্ষ্য থেকেই এই অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধা সম্পর্কে জানতে পারি,

> 'বহু অনুসন্ধানের পর আবিষ্কৃত অসংখ্য নারী মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন বীথিকা বিশ্বাস ও শিশির কণা। জনকণ্ঠ পত্রিকার প্রতিবেদক মোয়াজ্জেম হোসেন তাঁদের কথা লিখেছেন :

... একাত্তরের ১১ জুলাই। বৃষ্টিভেজা রাত। টিপটিপ বৃষ্টির মধ্যে যৈজ্ঞ কাকার নৌকায় উঠলেন দুই তরুণী। বীথিকা বিশ্বাস এবং শিশির কণা। দুজনেরই কোমরে বাঁধা হ্যান্ড গ্রেনেড। পাক আর্মি এসেছে স্বরূপকাঠিতে, বড় নদীতে নোঙ্গর ফেলেছে তাদের গানবোট। খবর চলে এলো মুক্তিবাহিনীর কাছে, ক্যাপ্টেন বেগ সিদ্ধান্ত নিলেন, গ্রেনেড চার্জ করতে হবে গানবোটে। কে যাবে? আগ্রহ দেখালেন দুই অকুতোভয় তরুণী বীথিকা এবং শিশির কণা। ... নৌকা থেকে পানিতে নেমে সাঁতার দিয়ে গানবোটের দিকে এগিয়ে গেলেন দুই তরুণী। কচুরিপানার সঙ্গে মিশে অন্ধকারে ভেসে ভেসে গিয়ে ভিড়লেন লঞ্চের গায়ে। পাশাপাশি তিনটি লঞ্চ। বাতাসে রান্নার গন্ধ ভাসছে, লঞ্চের ভিতরে পাকবাহিনীর খানাপিনার আয়োজন। বৃষ্টিটা যেন হঠাৎ করে আরও জোরে এলো। দুই তরুণী উৎকণ্ঠিত হলেন। ... শিশির কণার কাঁধে চাপ দিলেন বীথিকা, এখনই সময়, আর দেরী করা যাবে না। দাঁতে গ্রেনেডের রিং কামড়ে ধরলেন বীথিকা, টান দিয়ে ছুঁড়ে মারলেন গ্রেনেড। শিশির কণার হাত থেকেও ছুটে গেল গ্রেনেড। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল পাকবাহিনীর গানবোট। ... তারপর বীথিকা আর শিশির কণা জীবন্মৃত অবস্থায় অন্ধকারে লঞ্চের আড়ালে ভেসে ছিলেন। ... অনেকক্ষণ পর অন্ধকারে কচুরিপানার নিচ দিয়ে সাঁতারে তীরে ফিরলেন। অন্ধকারে হেঁটে এক সময় পৌঁছে গেলেন মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে। বীথিকা বিশ্বাসের বয়ানে সংক্ষেপে এই হচ্ছে অপারেশন স্বরূপকাঠির কাহিনী। মুক্তিযুদ্ধের এই অজানা যোদ্ধা তুলে ধরলেন মুক্তিযুদ্ধের সেই চাপা পড়া অধ্যায়, রণাঙ্গনে বাংলার নারীদের অবিশ্বাস্য সাহসিকতার কাহিনী।'[১১]

পিরোজপুরের আটকুড়িয়ানা গ্রামের বাসিন্দা বীথিকা বিশ্বাসই এই উপন্যাসের কথক যুথিকা। উপন্যাসের বয়ান সেই সাক্ষ্যই দেয়। এই যুথিকার মাধ্যমেই লেখিকা যুদ্ধোত্তর দেশের সামাজিক পরিস্থিতিতে নারীর অবনমনের চিত্র তুলে ধরেন সে সঙ্গে ঔপন্যাসিকের নিজস্ব অভিজ্ঞতার মিশেলে উপন্যাসের কথাবস্তু নির্মিত হয়।

'মুহূর্ত সময় মাত্র। লঞ্চের ইঞ্জিন স্টার্টের ঘর্ঘর শব্দ শুরু হয়েছে। দু'জনে গ্রেনেডের রিং দুটো দাঁতে কামড়ে ধরে এবং ফিতাটা টান মেরে ছুঁড়ে মারে সঙ্গে সঙ্গে। লঞ্চের একটি অংশ প্রবল শব্দে টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

যুথিকা আর রত্না খুঁটির সাথে আটকানো শেকল বেয়ে সিঁড়ির পাটাতনের একেবারে তক্তার নিচে গিয়ে সাঁতার কেটে চরের কোণায় ওঠে। কাছাকাছি ছিল যজ্ঞের নৌকা। ওদের জন্য অপেক্ষা করছিলো মুক্তিযোদ্ধার দলবলসহ ক্যাপ্টেন হুদা। ভিজে পোশাকেই ক্যাপ্টেন ওদের জড়িয়ে ধরে বলে, অসাধারণ কাজ করেছো। ... তোমরা আমাদের গর্ব। তোমাদের অপারেশনের সাফল্য আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসে লেখা থাকবে।'[১২]

যথার্থই বলেছেন প্রাবন্ধিক- সমালোচক সুমিতা চক্রবর্তী তাঁর একটি বই এর মুখবন্ধে, 'সাহিত্য জন্ম নেয় ইতিহাসের পরিমণ্ডলে। ইতিহাসও প্রায়শই নিজেকে খুঁজে পায় সাহিত্যের ভাষায় এবং ভাষ্যে।'[১৩]

সত্যিই তো, ইতিহাস-দর্শন-সমাজনীতি-রাজনীতি সবই সাহিত্যের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন সংযোগ রক্ষা করে চলে। ইতিহাসের নানা অনুষঙ্গ অন্তর্বয়নে সাহিত্যের অবয়ব গড়ে ওঠে। আবার এও তো সত্যি যে নিয়ত পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পারিপার্শ্বিক ব্যক্তিসত্তার জিজ্ঞাসাকেও সংগঠিত করে। কেননা প্রতিটি ব্যক্তিগত উচ্চারণ এক অর্থে সামাজিক বলেই প্রতিটি সম্পর্কও সামাজিক সম্পর্ক। এই সামাজিক দায়ই এককালের মুক্তিযোদ্ধা বর্তমানে স্কুল শিক্ষিকা তথা

লেখক যুথিকাকে তাড়িত করে।

> 'ওর মনে হয় রশি ছিঁড়ে গেছে, গিটঠু দিয়ে টান দিলে সেটাও ফেঁসে যায়। ও কুঁকড়ে থাকে এবং আকস্মিকভাবে আবিষ্কার করে ও এক বিশাল ডাস্টবিনে বসবাস করছে। এক অদ্ভুত ডাস্টবিনে- এখানে বেঁচে থাকার ভান আছে, নষ্টামী আছে- প্রকৃত জীবনযাপনের চিহ্ন খুবই কম- তা ব্যক্তির জীবনে যেমন কম, সমষ্টির জীবনেও তেমন কম। সঙ্গতি খুঁজে পেতে কষ্ট হয় এবং সবচেয়ে খারাপ নষ্ট রাজনীতির লীলাখেলা। এখানে নাগরালির চতুরতা যুদ্ধকালের গৌরবের সময়টুকু থেঁতলে দিয়েছে- বেশি থেঁতলেছে নারী।'[১৪]

এ যে শুধু উপন্যাসে বর্ণিত কথক স্বরের ভাবনা বাহিত বয়ান নয়, এতে বিবরণকারের নিজের স্বরে প্রচ্ছন্নভাবে মিশে আছে লেখকের চেতনা সঞ্জাত উচ্চারণ- পাঠকের অনুভবী মন তা সহজেই অনুভব করে। এক অর্থে এই স্বর কথক এবং লেখকের দু'জনেরই। উপন্যাস গড়ে ওঠে এই লেখক স্বর এবং বহুস্বরের আততিতেই, প্রাবন্ধিক দেবেশ রায় এমনটাই বলতে চেয়েছেন বাখতিনের উপন্যাস ভাবনার নির্যাস শুষে নিয়ে। একটু আগে অন্তর্বয়নের প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছিলাম। এবার পাঠকৃতিতে কীভাবে এর প্রয়োগ ঘটে বা সার্থকভাবে ঘটিয়েছেন ঔপন্যাসিক সেলিনা, তার কথা বলতে চাই। আর এর সঙ্গে জুড়ে রয়েছে যে চিরাচরিত নারীর অবদমনের ইতিহাস, সেটাও বিশ্লেষণ সাপেক্ষ।

Intertexuality বা অন্তর্বয়নের প্রসঙ্গে বাখতিনীয় ভাবনার নির্যাস নিয়ে ক্রিস্তেভা-ই ফরাসি ভাষা এবং সাহিত্যে এর প্রথম অন্তর্ভুক্তি ঘটান। The Bounded Text-এই শব্দবন্ধটির ব্যাখ্যায় ক্রিস্তেভা বলতে চেয়েছিলেন যে এটা একটা প্রক্রিয়া যেখানে এই ধারণাকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয় যে প্রতিটি পাঠকৃতির নির্মাণই পূর্ববর্তী কোনও প্রতিবেদনের অস্তিত্ব নির্মাণের মধ্যে নিহিত থাকে। অর্থাৎ,

> 'Authors do not create their texts from their own original minds, but rather compile, them from pre-existent texts, so that, as Kristeva writes, a text is a permutation of texts , an intertexuality in the space of a given text, in which several utterances, taken from other texts, intersect and centralize one another.'[১৫]

মানে আরও একটু বিশদভাবে বলতে গেলে,

> 'Texts are made up of what is at times styled the cultural (or social) text, all the different discourses, ways of speaking and saying, institutionally sanctioned structure and systems which make up what we call culture.'[১৬]

বাখতিন এবং ক্রিস্তেভা দু'জনের ধারণা থেকেই এটা স্পষ্ট যে,

> 'texts cannot be separated from the larger cultural or social textuality out of which they are constructed.'[১৭]

এই সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অন্তর্বয়নের সূত্র ধরেই সুদূর আসামের নিকটবর্তী রাজ্য মণিপুরে ঘটে

যাওয়া রাজ্যের প্রশাসনিক কর্তৃত্বের হাতে নারীর অবনমনের প্রতিবাদে বারোজন নারীর নির্বস্ত্র প্রতিবাদের বিষয়টিও যুথিকার অবচেতনে সাড়া তোলে।

> 'বারোজন মধ্যবয়সী নারী নগ্ন হয়ে ইম্ফলের কাংলা ফোর্টের আসাম রাইফেলসের সদর দফতরের সামনে ব্যানার হাতে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ... নারীর শরীর যে কতকিছুর ব্যাখ্যা দেয়- পুরুষ তাকে যে কতভাবে ব্যাখ্যা করে এটা নারীর চেয়ে বেশি আর কে জানে। ... ওরা ক্ষমতার দম্ভে বুটের নিচে মাড়িয়ে যায় মানুষের শরীর - থেঁতলে দেয় শরীর- ... আমার সামনে ভেসে ওঠে প্রতিবাদী কল্পনা চাকমার মুখ, যাকে সেনাবাহিনীর সদস্য ধরে নিয়ে যায়, সে আর কোনোদিন ফিরে আসে না। তাঁদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অর্থ মৃত্যু। ... এখন মৃত্যুর মতো কঠিন সময় আমার চারপাশে। জঙ্গীবাদের উত্থান মৃত্যুকে আমার দোরগোড়ায় সেঁটে রেখেছে। কারণ যুদ্ধের সময় আমি ওদের প্রতিপক্ষ ছিলাম। এখনও ওদের প্রতিপক্ষ। অনবরত ওদের বিরুদ্ধে লিখছি। লেখাকে আমার নৈতিক কর্তব্য বলে মনে করি। আমি মৃত্যুকে ভয় পাই না।'[১৮]

ভৌগোলিক দূরত্ব কোনও মানে রাখে না, নারীর অবদমনের বিষয়টি যে চিরটাকাল সব পরিসরেই সমান থাকে। তবে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের চিত্রটি একটু একটু করে বদলে যাচ্ছে গোটা পৃথিবীতে। যুথিকার নানা দেশ ভ্রমণের মাধ্যমে গোটা দেশের নারীর অবস্থানগত সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্যকে একটু একটু করে গুটিয়ে আনেন নিজের লেখনীর আয়ত্তে। আখ্যান যত এগোয় আমরা লক্ষ করি এক নারীকে অনেক নারী তাদের নির্ভরস্থল করে জীবনে এগিয়ে যায়। একদিকে যেমন বহু প্রতীক্ষিত স্বাধীন ভূখণ্ডে খুশী- হনুফাদের মতো নির্যাতিতরা যুথিকাকে ঘিরে নিরাপত্তার বলয় দৃঢ় করে বাঁচতে চায়, অন্যদিকে আবার 'মুক্তিযোদ্ধা' এই বিশেষণের অন্ধকারে তলিয়ে যাওয়া নারীদের বিস্মৃত ইতিহাসকে কুড়িয়ে আনার অনন্য সাধনে ব্যাপৃত রয়েছে যুথিকা নিজেই। স্বাধীন দেশে রাজা বদলায় শুধু, কিন্তু ক্ষমতা মুখোশ পালটে নেয়। তাই খুশি কিংবা হনুফা এদের জীবনে নির্যাতনের কোনও হেরফের ঘটে না। নারীর যুদ্ধ সবসময় দ্বিমুখী। প্রথমে তাকে লড়তে হয় চেনা ক্ষমতাসীন অর্থাৎ পারিবারিক পারিপার্শ্বিকতার বিরুদ্ধে আবার বাইরেও লড়তে হয় রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতাপের বিরুদ্ধে যা তাদের যে কোনও পরিস্থিতিতেই শিকার করে নেয়। যেকোনো যুদ্ধের সময় পরিস্থিতির শিকার হয় যত সংখ্যক নিরীহ মানুষ, বলতে বাধা নেই সমসংখ্যক নারীও সেই সময়ে পিতৃতান্ত্রিক আগ্রাসনের শিকার হয়।

যুথিকার বিদেশ সফরের সূত্র ধরে উঠে আসে নারীর হেনস্থার চিত্র। সবক্ষেত্রেই পিতৃতন্ত্রের ক্ষমতাকে ধরে রাখে যে প্রধান স্তম্ভগুলো সেগুলোই এই নির্যাতনের প্রেক্ষাপট তৈরি করে। কোথাও ধর্ম তো কোথাও আইন ইত্যাদি। চারদিকে 'উজেলি', 'মীনা'র মতো ছবি তৈরি হয়, ঢাকঢোল পিটিয়ে নারী নির্যাতনের সংবাদ পরিবেশিত হয়। হয়তো কোনও নারীই এসব কর্মকাণ্ডের হোতা হন; কিন্তু বাস্তবের কোনও পরিবর্তন ঘটে না। প্রতাপের পরিচিত শর্ত মেনে কোনও নারী যদি ক্ষমতার শীর্ষে চলে আসেন, তখন তাঁদের মধ্যেও মানবিকতার চাইতে ক্ষমতার ভারে উপেক্ষার উদাসীন দৃষ্টিই লক্ষিত হয় এসব নারীর পরিস্থিতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে। এভাবে যুথিকার কলমে সত্যের দাবি নিয়েই একের পর এক বন্দি হতে থাকে যুদ্ধোত্তর নারীর জীবন। নারীর লেখার কোনও বিষয় হতে

পারে না বা উল্টো করে ঘুরিয়ে এভাবেও বলা যায় যেকোনও মুহূর্তের ঘটনাবন্দি সময়ই মেয়েদের লেখার বিষয় হয়ে ওঠে।

> '... at the present time, defining a feminine practice of writing is impossible with an impossibility that will continue; for this practice will never be able to be theorized, enclosed, coded, which does not mean it does not exist.'[১৯]

-'ecriture feminine' বা নারীর লিখন সম্পর্কে এ ধারণাই পোষণ করেন হেলেন সিঁখো।

যুথিকারও মনে হয়,-

'কি করে যে পারি আমি নিজেও বুঝি না। শুধু এটা বুঝি যে এভাবে আমি ভুবন গড়তে পারি। সময়ের ওলোটপালোট করতে পারি। আর, এমন তছনছ সময়কে ভীষণ উপভোগ করি।'[২০] লেখকস্বরও বা বলতে পারি ঔপন্যাসিকও নিজের অজান্তেই ঢুকে পড়েন বিবরণের মধ্যে, 'ভাবনা ওকে আচ্ছন্ন করে। এমন পরিস্থিতিতে ও সবসময় নিজের সঙ্গে কথা বলে। কথা বলতে বলতে নানা সময় পার করে দেয়।'[২১]

নারীর ক্ষেত্রে তো এটাই সত্যি তারা যখন লেখে, তখন নিজের সঙ্গেই অনবরত কথা তৈরি করে চলে। তার সত্তার অন্য একটি অংশই যেন তার সামনে 'অপর' হয়ে এসে দাঁড়ায়। এই নিজের সঙ্গে নিজের কথোপকথনেই কথার সৌধ তৈরি হয়। হেলেন সিঁখো বলেছিলেন,

> 'I can only try to understand, I can only work on, or take note of why and how one is knocked off one's feet, I can only ask myself what that means, if I begin by noticing it in myself, myself as the first other.'[২২]

যুদ্ধোত্তর স্বাধীন দেশে নারীর জীবন সম্পর্কে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অপরিবর্তিত আগ্রাসী মনোভাব যুথিকাকে আহত করে। তার নিজেকে অসহায় মনে হয় 'অথর্ব, মুমূর্ষু মানুষের শারীরিক কাঠামোয় আমার দিনগুলো ফ্যাকাসে বিবর্ণ'। কিন্তু তবুও সে নিজের বিক্ষিপ্ত চিন্তার সূত্রগুলো সংগঠিত করে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হয়। নির্যাতিত পরিবেশ থেকে উঠে আসা খুশির অস্তিত্ব, হনুফা ওরফে উজেলির নিরুজ্জ্বল পিঠ জুড়ে ভেসে ওঠা পিতৃতন্ত্রের পাশবিক নিষ্ঠুরতার চিহ্ন, নারীর ভূলুণ্ঠিত অস্তিত্বকে কেন্দ্র করে ধর্মের বিচিত্র প্রহসন, - সবকিছু যুথিকার উদ্বিগ্ন সত্তাকে এক 'ডাস্টবিন' শহরের ছবি উপহার দেয়। এই নিরাপত্তাহীন শহরে প্রতিনিয়ত হারিয়ে যাওয়া খোলামকুচির মতো জীবন যাদের, সেইসব নারীদের জীবন-দর্পণে যুথিকা আসলে নিজের পরান্মুখ ব্যর্থতাকেই আবিষ্কার করে। যে শহর উজেলি খুশিদের বেঁচে থাকার স্থায়ীত্বের বদলে অস্থির রাত এনে দেয়, সরকার তার দায়িত্বের হাত নিরপেক্ষ দূরত্বে সরিয়ে রাখে, এমনকি পারিবারিক পরিসরটুকু মান বাঁচিয়ে শামুকের খোলসে মুখ লুকোয়। যুথিকার ব্যর্থতার অনুভবে ঔপন্যাসিক

স্বাধীনোত্তর দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির অসারতাকে ব্যক্ত করেন।

> 'জ্বলজ্বলে তারায় ভরা আকাশের কালো রঙ উজেলির মুখ হয়ে আমার দুঃখ ভোলায়। ... একটি বস্তুর আড়ালে আর একটি বস্তু হয়ে? কেন আকাশ আমার প্রিয়? আকাশে উজেলিদের মতো মেয়েরা নেই, মানুষের ছাদহীন বেড়াহীন উদোম জীবনযাপন নেই, খুদকণা শূন্য ভাতের থালা নেই। এজন্য আকাশ আমার প্রিয়। বুঝতে পারি যুদ্ধ করার সাহস নিয়েও আমি বাস্তবের মুখোমুখি হতে ভয় পাই।'[২৩]

চেনা শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অনেক সহজ। কিন্তু পোশাকি স্বাধীনতার রঙিন দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে বাস্তবের স্বরূপকে। তাতে নারীর লড়াই আবার ঘরে বাইরে। যুথিকার জীবনচিত্রে ঔপন্যাসিক এক নারীর আজীবনের সংগ্রামকে তুলে ধরেন। যুথিকার জন্মের সময় তাকে ঘিরে তার বড়দিদির আত্মহত্যা, শুধুমাত্র মেয়ে বলে বড়ো হয়ে ওঠার দিনগুলোতে সমাজের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তাঁদের 'মেয়ে' জন্মটাকে উপেক্ষা করা এবং মেয়ে হয়েও 'সাহসী' বলে প্রেমিকের উদাসীন দূরত্ব রচনা এসবই যুথিকার নারীজীবনের এক একটি অন্তরায়, যা তাকে পেরিয়ে যেতে হয়েছিল।

কাঁকনবিবি, কাঞ্চনমালা, আদুরজান, নসিমুনআরা এসব সরকারি স্বীকৃতিবিহীন (তৎকালীন) মুক্তিযোদ্ধাগণ যুথিকার সংগঠিত চেতনার এক একটি স্তম্ভ যেন। যুথিকার সঙ্গে কথোপকথনে এদের অভিজ্ঞতাকেই কাজে লাগিয়ে ঔপন্যাসিক সেলিনা যেন নারী মুক্তিযোদ্ধাদের সাহিত্যে দলিলীকরণের সুবিশাল দায়িত্বটি নিজের কাঁধে তুলে নেন। কিন্তু একজন নারীর কলমে যখন আর এক নারীর জীবন অঙ্কিত হয়, তখন তাতে দৃষ্টিভঙ্গিগত কারণেই আরো অনেক কিছু উঠে আসে। কেননা,

> 'Women speak in a sexually distinctive way from men. The experience of gender in writing and reading is symbolized in style, and style, therefore, must represent the articulation of ideology by any particular writer or critic reader.' [২৪]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কাঁকনবিবি এখন হয়তো অনেকটাই পরিচিত নাম। কিন্তু তার জীবনের অনিচ্ছা ও অন্ধকারের দিকগুলোকেই যে আমাদের আলোকময় করে তুলতে হবে। এটাই যেন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চান ঔপন্যাসিক।

> 'আমার শরীরটা ছিল আমার দেশ। ওটা আমি দিয়ে দিয়েছিলাম দেশকে। যে যেখানে ধরে নিয়ে চিৎ করে শুইয়ে দিয়েছিল, আমি শুয়েছিলাম।... আমার শরীরটা বাংলাদেশ। ন্যাংটো হয়ে তোকে দেখাতে পারলে দেখতি শরীরটায় নির্যাতনের খানাখন্দ। এই শরীরটা দেখলেই মুক্তিযুদ্ধ দেখা যায়।'[২৫]

এভাবেই বোধহয় নারীর ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার শিকড় ছড়িয়ে গিয়ে তার নারীত্বের গভীর উপলব্ধিকে স্পর্শ করে। তাই অনুভবের গভীরতায় ভাষাও নতুন সংরূপ গড়ে নেয়।

> 'This is because ideology is what we construct to explain our experience, and the experience of others, to ourselves. Ideology is our way of coping with the contradiction of experience.'[২৬]

নারীর অভিজ্ঞতার বয়ানে তার শরীর আর দেশ এক হয়ে যায়। তাই দেশের জন্য যুদ্ধ যে কখন তার নিজের সব প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধে রূপান্তর ঘটে যায়, এটা শুধুমাত্র এক নারীর কলমে নারীর অভিজ্ঞতার রূপায়নেই পাঠ করা সম্ভব। কিংবা কাঞ্চনমালা যখন তার পারিবারিক অবস্থানের কথা জানায়, তখন আমরা দেখি কত নিঃশব্দে এক নারীর কলমে দলিলীকৃত হয় বঞ্চিতা নারীর ইতিহাস। অনিচ্ছায় শত্রুপক্ষের ক্যাম্পে কাটিয়ে আসা কাঞ্চনমালার বীভৎস দিনগুলি আরো ভয়ানক হয়ে ওঠে তার পারিবারিক পরিমণ্ডলে ফিরে আসার পর। কেননা নারী তো প্রতিমুহূর্তে তার ইজ্জত হারায় তাতে তার সহমত থাকা বা না থাকা নিয়ে কেউ বিচার করে না। তবে কাঞ্চনমালার ক্ষেত্রে আমরা এক সহৃদয় পুরুষের ভূমিকাকেও অস্বীকার করতে পারি না। যার সদিচ্ছার কাছে কাঞ্চনমালার অমানুষ স্বামীর পাশবিক জেদ হার মানতে বাধ্য হয়। সে স্বামীগৃহে থাকার সুযোগ পায়। কিন্তু এই পরগৃহে কাটানো নারীর শরীরটি কিন্তু তার স্বামী নামক পুরুষটির কাছে অপবিত্র ত্যাজ্যবস্তু থাকে না। পুরুষ হওয়ার কর্তৃত্ব সে এই নারীর শরীর ভোগেই প্রমাণ করে। 'এত অন্ধকারের মধ্যে লোকটি যৌনসুখ মেটাতে ছাড়েনি। এই এক জায়গায় আমার পাপ ছিল না। সন্তানেরও জন্ম দিয়েছি।'[২৭] তবে স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ের মতো অপমান এই নারী মেনে নিয়ে পারেনি। তাই প্রতিবাদে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে।

উপসংহার

উপন্যাস যত শেষের দিকে এগোয়, ঔপন্যাসিকও তার 'অতিনির্দিষ্ট' ভাবনাকে আরও জোরালো করে তুলতে বক্তব্যকে সংহত করে আনেন। ঘুড়িকে মাঝ আকাশে উড়তে দিতে অনেকটা সুতো ছাড়তে হয়। আবার শেষে গুটিয়ে আনতে হয় একটু একটু করে অতি সাবধানে, যাতে অন্য ঘুড়ির সুতো লেগে কেটে না যায়। একজন ঔপন্যাসিকও তেমনি ঘটনার ভেতর ঘটনার বর্ণনা করতে করতে নানা কথার সংযোজনে সমে ফিরে আসার মতো করে তাঁর বক্তব্যের নির্যাসে ফিরে আসেন। আমরা দেখি যুথিকার শৈশবের স্মৃতিচারণে উঠে আসে আমাদের পরিবারে সেই শৈশবের দিনগুলি যখন থেকেই ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে পার্থক্য করে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিটি রপ্ত হয়ে যায়। ছেলেটি যেমন আশৈশব এটা ভেবেই বড়ো হয় পৃথিবীর সবকিছুতেই তার অবাধ অধিকার। পক্ষান্তরে, মেয়েটি দেখে তার গোটা জগতটাই নিষেধের বেড়াজালে ঠাসা। মানিয়ে নেওয়া মেয়েগুলো কোনও রকমে টিকে যায় আর ব্যতিক্রমী যে দু'চারজন মুখ ফিরিয়ে বসে, তাঁদের প্রতিমুহূর্তেই উল্টো স্রোতে চলার মানসিকতা এবং সাহস জুগিয়ে এগোতে হয়। আমরা যুথিকাকেও দেখেছি যে এমন একটা মিছিল বের করতে চায় যেখানে সমাজের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অনালোকিত, অচর্চিত মানুষগুলো (নারী) এই মিছিলের মুখ হয়ে উঠবে।

উপন্যাসের সমাপ্তি অনেকটা প্রতীকী হয়ে ওঠে। যেখানে এক বিশাল নারী মুক্তিযোদ্ধাদের মিছিল শহর ছাড়িয়ে দেশ পরিক্রমা করে। পালা করে সবাই এর নেতৃত্ব দেয়, যারা এতদিন অন্ধ বিবরে দিন কাটাচ্ছিল। কিন্তু সত্যিই কি স্বাধীন দেশে নারীর অবস্থা পরিবর্তিত হয়? এই বহুমূল্য প্রশ্নটি ঔপন্যাসিক আমাদের সামনে তুলে ধরেন। ছাদের কার্ণিশ থেকে কুড়িয়ে পাওয়া অনামী শিশু

কন্যাকে যখন যুথিকা এবং তার মর্ম-সঙ্গী অনিমেষ সন্তান হিসেবে পরিচিতি দেয় তখন সবচেয়ে মোক্ষম প্রশ্নটি উঠে আসে যুথিকার মন থেকে। যুথিকা অনিমেষকে বলে, 'আমরা দু'জন যুদ্ধ করা মানুষ ওকে কি স্বাধীন দেশের একটি বাঙ্কার থেকে বের করে আনলাম? যে অদৃশ্য বাঙ্কারে নারীরা এখনও প্রবলভাবে নিপীড়িত হচ্ছে? যার কোনো বিচার নেই। এখনও যেখানে নারী সমাজ কর্তৃক উপেক্ষিত।'[২৮]

এভাবেই যুথিকা হয়তো তার ব্যক্তিগত জীবনে একটু আপাত বিশ্রামের অবস্থান খুঁজে নেয়। সিঁখোর এই মন্তব্যটি কি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে না এক্ষেত্রে,

> 'She travels a hundred thousand years … before coming to an end of this painstaking journey from which not a single step can be omitted otherwise it would all be over, she would have skipped a stage in this step – by – step process.'[২৯]

কিন্তু পথচলার প্রক্রিয়া প্রজন্মের পর প্রজন্ম চলতে থাকে অবিরাম। অনেকেই জীবনের স্বাভাবিক নিয়মে কাঁকনবিবির মতো এ নারীর বাসযোগ্য না করে যাওয়ার বিষণ্নতা নিয়েই পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। আর সেই শূন্যস্থান পূরণে খুশিরা এগিয়ে আসে। লতিফারা সংগ্রামী পথচলার নতুন কৌশল তৈরি করে। খুশির দৃষ্টিতে 'কাঁটাতারের ব্যারিকেডে ফাটল' ধরার দৃশ্যকে সামনে আনেন ঔপন্যাসিক। আর লতিফা দেখে মিছিলের শেষটুকু আজ আর দেখা যায় না। অগণিত মানুষের সম্মিলিত যাত্রায় তা ভূখণ্ডকেও ছাড়িয়ে গেছে।

কোনও পরিকল্পিত শেষদৃশ্য পরিকল্পনায় উপন্যাসের ইতি টানেন না ঔপন্যাসিক সেলিনা।

> 'হাজার হাজার নারীর মাথার উপর দিয়ে ঝড় বয়ে যায়। বাতাসে ঝরা পাতা বনবন ঘোরে। তুমুল বৃষ্টি নামে। পায়ের নিচে বন্যার জল গড়ায়। নদী ভেঙে ঘরহীন হয়। ... আমরা খোঁজ রাখি না। কারণ ক্ষমতা বদলে আমাদের কিছু এসে যায় না। হা-হা করে হাসে নারীরা। নারীদের হাসি বয়ে যায় বাতাসের বেগে। পৌঁছে যায় বঙ্গোপসাগরে সুন্দরবনে কেওক্রাডনের মাথায়। ওরা অফুরান শক্তি নিয়ে কাঁটাতারের বেড়ি ভাঙার কাজে নিজেদের ধরে রাখে।'[৩০]

লতিফার প্রশ্নের উত্তরে যুথিকা জানায় তাদের আরও 'পঞ্চাশ হাজার দুই সাল পর্যন্ত হাঁটতে হবে।' রাষ্ট্র-সমাজ-প্রশাসন-পরিবার যেখানে যোগ্য সম্মান দিতে পারে না নারীকে সেখানে সেই 'বাঙ্কার' বা যদি বলি এক আপাত উপনিবেশের কথা; যেখানে উপনিবেশক 'প্রভু'কে চেনা পোশাকে দেখা যায় না, অথচ এদের অদৃশ্য ক্ষমতার হাত উপনিবেশিতের ওপর সদা সক্রিয় থাকে- ঔপন্যাসিকও গাণিতিকভাবে শেষ কথা বলতে পারেন না। ফলে তাকে সেই ভয়ঙ্কর- অনভিপ্রেত- অনাকাঙ্ক্ষিত সত্যের দিকেই মুখ ফেরাতে হয়। তা না হলে যে উপন্যাসে বিবৃত ঘটনাই বলি কিংবা ক্ষমতার কেন্দ্র বিকেন্দ্রিত হতে পারে না। যা অভিপ্রেত ছিল তা হয় না বলেই ঔপন্যাসিককে সেই সম্ভাব্য মানবসত্যের দিকে তাঁর কলমকে তুলে ধরতে হয়। সেলিনাও তাই করেছেন। তাই 'চড়াগলায়

মানবতার গান' গেয়ে ইতিহাস- সমাজ বাস্তবতাকে কলুষিত না করে বরং নারীর আপন শক্তিতে সমর্থ হয়ে ওঠার মধ্য দিয়েই শিল্পের দাবি পূরণের মাধ্যমে লেখকের কঠিন দায় কাঁধে তুলে নিয়েছেন।

তথ্যসূত্র

১. 'অগ্রবীজ' পত্রিকা, সাক্ষাৎকার সেলিনা হোসেন, পৃষ্ঠা ৪৭
২. দেবেশ রায়, *উপন্যাসের নতুন ধরণের খোঁজে*, পৃষ্ঠা ৮৬
৩. সেলিনা হোসেন, *স্বদেশে পরবাসী*, পৃষ্ঠা ১৫৪
৪. তপোধীর ভট্টাচার্য, *প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব*', পৃষ্ঠা ১২৩
৫. সেলিনা হোসেন, '*দিনের রশিতে গিটঠু*', পৃষ্ঠা-৩৬
৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৩
৭. Maggie Humm, *Feminist Criticism,* p. ৪৩
৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৪
৯. সেলিনা হোসেন, *দিনের রশিতে গিটঠু*, পৃষ্ঠা-৫১
১০. দেবেশ রায়, *উপন্যাসের নতুন ধরণের খোঁজে*, পৃষ্ঠা-৩৩
১১. মালেকা বেগম, *মুক্তিযুদ্ধে নারী*, *পৃষ্ঠা*-৯৭-৯৮
১২. সেলিনা হোসেন, *দিনের রশিতে গিটঠু*, পৃষ্ঠা-১৫২-৫৩
১৩. সুমিতা চক্রবর্তী, *ইতিহাস চিহ্নিত সাহিত্য*, মুখবন্ধ-'বই প্রসঙ্গে কিছু কথা'
১৪. সেলিনা হোসেন, *দিনের রশিতে গিটঠু*, পৃষ্ঠা-৫২
১৫. Graham Allen, *Intertexuality,* p. ৩৫
১৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৫-৩৬
১৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৬
১৮. সেলিনা হোসেন, *দিনের রশিতে গিটঠু*, পৃষ্ঠা-৫৫-৫৬
১৯. Helen Cixous, *Authorship, Autobiography of Love,* p. ০১
২০. সেলিনা হোসেন, *দিনের রশিতে গিটঠু*, পৃষ্ঠা-৫৪
২১. সেলিনা হোসেন, *দিনের রশিতে গিটঠু*, পৃষ্ঠা-৫৪
২২. Helen Cixous, *Rootprints,* p. ৯০
২৩. সেলিনা হোসেন, *দিনের রশিতে গিটঠু*, পৃষ্ঠা-৬৩
২৪. Maggie Humm, *Feminist Criticism,* p. ০৭
২৫. সেলিনা হোসেন, *দিনের রশিতে গিটঠু*, পৃষ্ঠা-১০৩
২৬. Maggie Humm, *Feminist Criticism,* p. ০৭
২৭. সেলিনা হোসেন, *দিনের রশিতে গিটঠু*, পৃষ্ঠা-৭৪
২৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৭১
২৯. Helen Cixous, *Authorship, Autobiography and Love,* p. ১৭
৩০. সেলিনা হোসেন, *দিনের রশিতে গিটঠু*, পৃষ্ঠা-১৭৫

গ্রন্থঋণ

আকরগ্রন্থ

সেলিনা হোসেন, *দিনের রশিতে গিটঠু*, মাওলা ব্রাদার্স, ২য় মুদ্রণ, ঢাকা, ২০১৪

সহায়ক গ্রন্থ (বাংলা)

সুমিতা চক্রবর্তী, *ইতিহাস চিহ্নিত সাহিত্য*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৬

মালেকা বেগম, *মুক্তিযুদ্ধে নারী*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১১

তপোধীর ভট্টাচার্য, *প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব*, অমৃতলোক, কলকাতা, ২০০২ (দ্বিতীয় সংস্করণ)

দেবেশ রায়, *উপন্যাসের নতুন ধরণের খোঁজে*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৬

সেলিনা হোসেন, *স্বদেশে পরবাসী*, জনতা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১০

সহায়ক গ্রন্থ (ইংরেজি)

Allen, Graham, *Intertexuality,* Routledge, New York, 2007

Cixous, Helen, *Authorship, Autobiography and Love* (Susan Seller), Polity Press, Cambridge, 1996

Cixous, Helen, and Mireille Caralle Gruber, *Rootprint (Memory and Lifewriting),* Routledge, New York, 1997

Humm, Maggie, *Feminist Criticism Woman A Contemporary Critics,* Harvester Wheatsheaf, Hertfordshire, 1986

পত্রিকা

'অগ্রবীজ' (৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা), সুবিমল চক্রবর্তী (সম্পা), টেক্সাস, ২০০৯

'গল্পকথা' (৫ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা), চন্দন আনোয়ার (সম্পা), রাজশাহী, ২০১৫

BL College Journal

ISSN 2664-228X
Volume -1, Issue-2, 2019
PP. 40-61

স্মৃতিকথায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : প্রাথমিক প্রতিরোধ প্রসঙ্গ

আরমান হোসাইন আজম

পিএইচডি গবেষক, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং সহকারী অধ্যাপক, বাংলা (বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা)।

ই-মেইল : ahazam01@gmail.com

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক প্রতিরোধ প্রসঙ্গটি মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথায় পাওয়া যায়। একাত্তরের মার্চ-এপ্রিল মাসে প্রতিরোধ যুদ্ধে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছেন, যাঁরা প্রতিরোধ যুদ্ধের ঘটনাকে দেখেছেন এবং যাঁরা দেশের বিভিন্ন জায়গায় সংঘটিত প্রতিরোধের ঘটনাকে শুনেছেন তাঁদের অনেকেই নিজেদের অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণ করে গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। যাঁরা প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে স্মৃতিচারণ করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন মুক্তিযোদ্ধা, পুলিশ, ইপিআর, আনসার এবং সামরিক বাহিনীর বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিদ্রোহী সদস্যগণ। তাছাড়া পাকিস্তানি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যাঁরা কূটনৈতিক প্রতিরোধে অংশ নিয়েছেন এবং বিদেশের মাটিতে সভাসমাবেশ করে প্রতিবাদ-প্রতিরোধে অংশ নিয়েছেন তাঁদেরও অনেকে স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। স্মৃতিকথামূলক এসব গ্রন্থে প্রতিরোধ যুদ্ধের নানা চিত্র ফুটে উঠেছে। বাংলাদেশের সর্বত্র পরিস্থিতি অনুযায়ী যার যা আছে তাই নিয়ে, যারা যেভাবে পেরেছে সেভাবেই প্রতিরোধ যুদ্ধে সম্পৃক্ত হয়েছেন। স্মৃতিকথায় এসব প্রতিরোধের পাঁচটি দিক লক্ষ করা যায়। দিকগুলো হলো শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধ, রাস্তাঘাট অবরোধ, অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা, কূটনৈতিক প্রতিরোধ এবং সশস্ত্র প্রতিরোধ।

মূলশব্দ

স্মৃতিকথা, বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ, মুজিবনগর সরকার, মুক্তিবাহিনী, গণবাহিনী, রাজাকার, পুলিশ, ইপিআর

ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথার বড়ো একটি অংশ জুড়ে রয়েছে প্রতিরোধ প্রসঙ্গ। প্রতিরোধ যুদ্ধের স্মৃতিকথাগুলোতে অনেকে সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণের স্মৃতিচারণ করেছেন, অনেকে প্রতিরোধ যুদ্ধের ঘটনাকে যেমন দেখেছেন তার স্মৃতিচারণ করেছেন, আবার অনেকে বিভিন্ন জায়গার প্রতিরোধ

যুদ্ধের ঘটনা শুনে তার বিবরণ দিয়েছেন। যাঁরা প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশগ্রহণের স্মৃতিচারণ করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন মুক্তিযোদ্ধা, পুলিশ, ইপিআর, আনসার, ও সামরিক বাহিনীর বেঙ্গল রেজিমেন্টের সদস্য। প্রবাসী বাংলাদেশী যাঁরা পাকিস্তানি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বিদেশের মাটিতে বিভিন্নভাবে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছেন তাঁরা স্মৃতিচারণ করেছেন। স্মৃতিচারণগুলোতে প্রতিরোধের নানা প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিস্থিতি অনুযায়ী যার যা আছে তাই নিয়ে, যারা যেভাবে পেরেছে সেভাবেই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ ও প্রতিহত করার ক্ষেত্রে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করেছেন। স্মৃতিকথায় এসব প্রতিরোধের পাঁচটি দিক দেখা যায়। দিকগুলো হলো শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধ, রাস্তাঘাট অবরোধ, অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা, কূটনৈতিক প্রতিরোধ এবং সশস্ত্র প্রতিরোধ।

গবেষণার উদ্দেশ্য

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থ থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক পর্বে মুক্তিযোদ্ধাসহ সর্বস্তরের মুক্তিকামী জনগণের প্রতিরোধ সম্বন্ধে নানা দিক অনুসন্ধান করা এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য।

গবেষণার পদ্ধতি

মুক্তিযোদ্ধা, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, প্রত্যক্ষদর্শী, শহিদ পরিবারের সদস্য, বিদেশী সাংবাদিক প্রমুখের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থের পাঠবিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধ

স্মৃতিকথায় মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে সভাসমাবেশ, শ্লোগান, মিছিল ইত্যাদির মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে পাকিস্তান সরকার ও সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধের চিত্র পাওয়া যায়। এসব চিত্রে দেখা যায় প্রাথমিক প্রতিরোধ পর্বে লাঠি, বর্শা, বল্লম, দেশি বন্দুক ইত্যাদি সাধারণ অস্ত্র নিয়ে জনগণ রাস্তায় নেমেছে। প্রতিরোধ যুদ্ধের জন্য যারা সংগঠিত হয়েছে সাধারণ জনতা তাদেরকে খাবার, আশ্রয় ও সমর্থন দিয়ে সহযোগিতা করেছে। শহর ও শহরতলী থেকে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর ভয়ে যারা পালিয়ে এসেছে তাদেরকে সর্বপ্রকার সহযোগিতা দিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছে। যাঁদের স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থে শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধের চিত্র পাওয়া যায় তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আবু আক্কাস আহমেদ, জিয়াউদ্দিন আহমেদ, মুকুল মোস্তাফিজ, আবু সাঈদ খান প্রমুখ।

আবু আক্কাস আহমেদ 'মুক্তিযুদ্ধ : রণাঙ্গন নেত্রকোণা' গ্রন্থে লিখেছেন, ''১লা এপ্রিল পাকিস্তান সরকার ও সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে তাঁদের যে মিছিল হয় সেখানে ছিলো লাঠিসোঠা, বল্লম ইত্যাদি সাধারণ গ্রাম্য অস্ত্র।''[১] নেত্রকোণায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হেলিকপ্টার হামলার পর ছাত্র, যুবক ও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের তদারকিতে বিপুল সংখ্যক ছাত্র-যুবক সীমান্তের ওপারে চলে

যায়। মহেশখলা, মহাদেও, রংরা, বাগমারায় স্থাপন করা হয় ইয়ুথ ক্যাম্প। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার অদম্য বাসনা নিয়ে যুবকরা ছুটে যায় সেসব ক্যাম্পে। আবু আক্কাস লিখেছেন, "নেত্রকোণায় গোলাম এরশাদুর রহমানরা যতোটা এগিয়ে যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে পড়তো, প্রবীণ নেতৃবৃন্দ ততোটাই সাবধানে ও সুকৌশলে পদক্ষেপ নেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁরা বলতেন বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো বাংলাদেশ স্বাধীন করো। আর আমাদের নেতারা বলতেন, অস্ত্র ধরার জন্য প্রস্তুতি নাও, ট্রেনিং নাও।"[২]

জিয়াউদ্দিন আহমেদ 'মুক্তিযুদ্ধে সুন্দরবন' গ্রন্থে প্রতিরোধ যুদ্ধে পিরোজপুরের সাধারণ জনতার ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। সে সময় আওয়ামী লীগ এবং স্বাধীনতার পক্ষের শক্তিসমূহের আহ্বানে সমগ্র জনতা তাদের বাড়ি থেকে খাবার পাঠাতো। বিভিন্ন শহর থেকে জীবন বাঁচানোর জন্য পালিয়ে আসা অভুক্ত লোকদেরকে তাঁরা খাবার দিয়েছে। এ সময় তাঁরা জনগণের কাছে আরও বেশি খাবার পাঠানোর আহ্বান জানান। প্রতিদিন প্রচুর রুটি, গুড়, অন্যান্য শাকসব্জি, ডাব, নারিকেল– খেয়ে বাঁচা যায় এমন ধরনের খাবার প্রচুর পরিমাণে পান। এগুলো দিয়ে তাঁরা হাজার হাজার লোকের জীবন ধারণের ব্যবস্থা করেন। পিরোজপুরের বিভিন্ন জায়গায় ক্যাম্প করেন খাবার বিতরণ করার জন্য। এসময় খুলনায় লড়াই চলছে। সে লড়াইয়ের ময়দানে রুটি এবং অন্যান্য খাবার পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।[৩]

মুকুল মোস্তাফিজ 'মুক্তিযুদ্ধে রংপুর' গ্রন্থে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি রংপুরে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রতিরোধ যুদ্ধে তাঁদের অংশ নেওয়ার স্মৃতিচারণ করেছেন। জাতীয় চেতনা জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে তাঁরা নিরলসভাবে কাজ করেছেন। মুকুল মোস্তাফিজ অন্যান্যের পাশাপাশি নিজেও গান লিখে জনতাকে মুক্তিযুদ্ধে উজ্জীবিত করেছেন।[৪] মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে শিল্পীদলগুলো রংপুর শহরসহ শহরতলী এবং গ্রামাঞ্চলে ভ্রাম্যমাণ দল হিসেবে অনুষ্ঠান করেছে। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে সশস্ত্র যুদ্ধের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অনেকেই সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন, আবার অনেকে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ জনগণের মনোবলকে ঠিক রাখার জন্য শরণার্থী ক্যাম্প ও রিক্রুটিং ক্যাম্পগুলোতে তাঁদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে যুদ্ধে তাঁদের ভূমিকা রাখেন। যুদ্ধের প্রথম দিকে অনেক সাংবাদিক দেশের অভ্যন্তরে থেকে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞের রিপোর্ট করে তাঁদের প্রতিবাদ প্রতিরোধের ধারাকে অব্যাহত রাখেন। মুকুল মোস্তাফিজ লিখেছেন যে, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে রংপুর থেকে যেসব পত্রিকা প্রকাশিত হয় সেগুলো হলো 'রণাঙ্গন', 'সোনার বাংলা', ও 'স্বাধীন বাংলা'।

আবু সাঈদ খান 'মুক্তিযুদ্ধে ফরিদপুর' গ্রন্থে ফরিদপুরের অম্বিকা ময়দানে ২৯শে মার্চ অনুষ্ঠিত জনসভার স্মৃতিচারণ করেছেন। সেখানে সভাপতিত্ব করেন অ্যাডভোকেট আদেলউদ্দিন আহমেদ। হাজার হাজার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাঁশের লাঠি, ঢাল, সড়কি, দা-কুড়াল, দেশীয় বন্দুক ইত্যাদি নিয়ে উপস্থিত হন। সভায় সশস্ত্র যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানিয়ে রাজনৈতিক ও ছাত্রসংগঠনের নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করেন।

রাস্তাঘাট অবরোধ

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথায় প্রাথমিক প্রতিরোধ প্রচেষ্টাগুলোর মধ্যে রাস্তাঘাট অবরোধ অন্যতম। রাস্তায় রাস্তায় গাছপালা কেটে, বাস-ট্রাক রেখে পাকিস্তানিদের আগমনে প্রতিবন্ধকতা তৈরির চেষ্টা করা হয়েছে। অধিকাংশ স্মৃতিকথায় এমন চিত্র পাওয়া যায়। মুক্তিযোদ্ধারা কখনো পাকিস্তানি বাহিনীকে ফাঁদে ফেলবার জন্য রাস্তাঘাটে ব্যারিকেড দিয়েছে। সামরিক বাহিনী যখন ব্যারিকেড সরাবার চেষ্টা করেছে মুক্তিবাহিনী তখন তাদের ওপর আক্রমণ করেছে। যাঁদের স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থে রাস্তাঘাট অবরোধের মাধ্যমে প্রতিরোধের চিত্র পাওয়া যায় তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আবুবকর সিদ্দিক, মাহফুজুর রহমান, কাদের সিদ্দিকী, আবু সাঈদ খান প্রমুখ।

আবুবকর সিদ্দিক তাঁর 'একটি স্বস্তিকর মৃত্যুসংবাদ ও অবরুদ্ধ যুদ্ধদশা' স্মৃতিকথামূলক লেখায় বাগেরহাটের মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলির স্মৃতিচারণ করেছেন। বিদ্রোহের দিনগুলোতে স্কুল-কলেজ থেকে শিক্ষকরাও ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে প্রতিবাদী মিছিলে পথে নেমেছেন। তিনি লিখেছেন,

"মনে আছে, ২৫শে মার্চের পরে এমনি এক উত্তাল দিনে বাগেরহাটে খবর পৌঁছে গেলো, খুনী গভর্নর টিক্কা খান নিহত। সেদিন বাগেরহাট শহরের মুক্ত সড়কে বাঁধভাঙা জলস্রোতের মতো জনতার মত্ত মিছিল ভেঙে পড়েছিলো। আমি চাউলপট্টির গোবিন্দমন্দিরের পাশ দিয়ে প্রধান রাস্তায় উঠতেই দেখতে পাই, রিকশা না জিপ কিসের ওপর মঞ্চের মতো খাড়া করে আজ আর সঠিক মনে নেই, এক অছাত্র গ্রাম্য তরুণ মুখে মাইকের মাউথপিস ধরে উৎক্ষিপ্ত শার্দুলের মতো ঝম্ফ দিয়ে দিয়ে বাগেরহাটের খাস আঞ্চলিক টানে শ্লোগান দিচ্ছে, "মরেসে মরেসে– টেক্কা খান মরেসে।"[৫]

২৬শে মার্চ বেলা বারোটার দিকে বাগেরহাটের নিউমার্কেটের দোতলায় আওয়ামী লীগের অফিসে ২৫শে মার্চ ঢাকায় সংঘটিত পাকিস্তানি আর্মির গণহত্যায় উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনায় বসেন শেখ আবদুর রহমান, সরদার জলিল, আবদুস সাত্তার খান, আবদুল লতিফ খন্দকার, অজিয়র রহমান, ছাত্রনেতা তোসারফ হোসেন (সাপ্তাহিক 'রোববারে'র নির্বাহী সম্পাদক), আমিরুজ্জামান বাচ্চু প্রমুখ। সেখানে আচমকা আসেন অয়ারলেস অপারেটর রবীন। তিনি সঙ্গে করে নিয়ে আসেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে স্বাধীনতার ঘোষণার বেতার বার্তার কপি। আবু বকর সিদ্দিক লিখেছেন, "এই বার্তা পেয়ে সবাই সশস্ত্র যুদ্ধের জন্য দৃঢ় সংকল্প হয়ে ওঠেন মনে মনে । জনগণ যুদ্ধংদেহী। রূপসা বাগেরহাট রাস্তায় গাছ কেটে ফেলে ব্যারিকেড খাড়া করেন তাঁরা।"[৬]

মাহফুজুর রহমান 'মুক্তিযুদ্ধে হবিগঞ্জ' গ্রন্থে হবিগঞ্জে যুদ্ধপরিস্থিতি এবং প্রাথমিক প্রতিরোধের স্মৃতিচারণ করেছেন। হবিগঞ্জের পার্শ্ববর্তী সিলেট ও মৌলভীবাজারে তখন পাকিস্তানি সৈন্যরা অবস্থান করছিলো। সৈন্যরা যাতে হবিগঞ্জের দিকে না আসতে পারে সেজন্য রশিদপুর এলাকায় হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজারের সীমান্তে পাহাড়ি এলাকায় রাস্তার ওপর ঢাকা সিলেট মহাসড়কে বহুসংখ্যক ব্যারিকেড সৃষ্টি করা হয়। এতে চা শ্রমিক, রাজনৈতিক কর্মী ও মুক্তিযোদ্ধারা অংশগ্রহণ করে।

কাদের সিদ্দিকী 'স্বাধীনতা '৭১' গ্রন্থে টাঙ্গাইলে তাঁর প্রতিরোধ যুদ্ধের স্মৃতিচারণ করেছেন। ২৯শে মার্চ রাতে সিদ্ধান্ত নেন ঢাকার রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি করবেন। রাত আটটার দিকে তাঁরা পুল ভাঙতে যান। কয়েকটি দল বিভিন্ন দিকে গাছ কেটে ব্যারিকেড তৈরি করতে যান। পুল ভাঙার অস্ত্র হিসেবে সঙ্গে নেন কেরোসিন, ডিজেল, ১০–১৫ সের ওজনের অনেকগুলো হাতুড়ি, শাবল, গাঁইতি ও কয়েক মণ কাঠ। তাঁদের ধারণা, কংক্রিটের ব্রিজে অনেকক্ষণ আগুন জ্বালাতে পারলে এবং বড়ো বড়ো হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করলে পুল ভেঙে যাবে। রডমিস্ত্রি সবুরকে নিয়ে প্রথমে যান কোদালিয়া ব্রিজে। সেখানে টিনের পর টিন কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেন। ব্রিজের অনেক অংশ পুড়ে লাল হয়ে গেলে হাতুড়ি মারেন, কিন্তু ব্রিজের এক চিলতে সিমেন্টও ওঠে না। হতাশ হয়ে দুপাশের পাঁচ ছয়টা বড়ো গাছ কেটে রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি করেন। মির্জাপুর ব্রিজ ভাঙার ক্ষেত্রটি ছিলো ভিন্ন রকমের। সেখানে শত শত জনতা ব্রিজ আগলে রাখে। জনতার ধারণা ব্রিজ ভাঙলে মিলিটারিরা আশেপাশের বাড়িঘর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেবে। তাঁরা ব্রিজ ভাঙতে পারলেন না। অবশেষে সারা রাস্তার ২৫-৩০ জায়গায় শতাধিক গাছ কেটে, ইট ফেলে, ভাঙা গাড়ি রেখে ব্যারিকেড তৈরি করেন।[৮]

আবু সাঈদ খান 'মুক্তিযুদ্ধে ফরিদপুর' গ্রন্থে লিখেছেন,

"২৬শে মার্চ সন্ধ্যায় ছাত্র-যুবকরা যশোর-ঢাকা রোডের ওপর গাছ কেটে রেখে পথরোধ করতে শুরু করে। তখন রাস্তার দুই ধারে বড়ো বড়ো গাছ ছিলো। সারা রাত ধরে গাছ কাটার কাজ চলে। রাস্তার দুই পাশের গ্রামবাসী দা কুড়াল নিয়ে কাজে অংশ নেয়। গোয়ালন্দে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাজবাড়ির নেতাদের সঙ্গে তাৎক্ষণিকভাবে যোগাযোগ করা হয়। গোয়ালন্দে কাজী হেদায়েত হোসেন, ছাত্রনেতা আবদুল জব্বার প্রমুখের নেতৃত্বে ছাত্র, জনতা, আনসার, পুলিশের সমন্বয়ে গোয়ালন্দ ঘাটে ব্যারিকেড তৈরি হয়।"[৯]

অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথায় প্রাথমিক প্রতিরোধে অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতার চিত্র প্রায় সর্বত্র লক্ষ করা যায়। রাস্তাঘাট কেটে, ব্রিজ-কালভার্ট ভেঙে, রেললাইন উপড়ে ফেলে মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ জনতা পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর আগমনকে প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করেছে। কোনো কোনো জায়গায় পাকিস্তানি আর্মি এসব রাস্তাঘাট পুনর্নির্মাণ করে তাদের আক্রমণ পরিচালনা করেছে। কিন্তু প্রাথমিকভাবে চলার পথে তারা বাধাগ্রস্ত হয়েছে, আক্রমণ পরিচালনায় তাদের সময় নিতে হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আর্মিদেরকে অন্য পথে আক্রমণ পরিচালনা করতে হয়েছে। যাঁদের স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থে অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতার মাধ্যমে প্রতিরোধের চিত্র পাওয়া যায় তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মনজুর মোরশেদ সাচ্চু, এ কে এম ওয়াহেদুল ইসলাম, আবু জাফর শামসুদ্দীন, চিত্তরঞ্জন দত্ত প্রমুখ।

মনজুর মোরশেদ সাচ্চু 'মুক্তিযুদ্ধ ও দেরাদুনে ষাট দিন' গ্রন্থে রাজবাড়ির পাংশায় যাতে শত্রুরা প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য তাঁদের প্রতিরোধ কার্যক্রম ও সাধারণ জনতার ভূমিকার স্মৃতিচারণ

করেছেন। ২৫শে মার্চ ঢাকায় পাকিস্তানি আক্রমণের পর ঢাকা থেকে তাঁদের কাছে পাংশার রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার নির্দেশনা পৌঁছায়। রাতে রেলওয়ের কর্মচারীরা পাংশার দুপাশের রেল লাইনের নাটবল্টু খোলা আরম্ভ করে। ঘণ্টা খানেক পর ছাত্রলীগ ও স্বাধীনতার পক্ষের বিভিন্ন সংগঠনের ছাত্রকর্মীরা আসে। খবরটা রাতের অন্ধকারে আশেপাশের গ্রামে খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ভোরের আলো কিছুটা উজ্জ্বল হতেই হাজার হাজার লোক শ্লোগান সহকারে রেললাইন টেনে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। হাজার হাজার লোকের সমাগমে তখন স্টেশন বাজার সয়লাব হয়ে যায়।[১০]

মনজুর মোরশেদ সাচ্চু কুষ্টিয়ায় অবস্থানরত পাকিস্তানি বাহিনীকে আক্রমণ করার একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনা মতে সাধারণ জনতা ও রেল কর্মচারীরা খুলে ফেলা রেল লাইনটি পুনঃস্থাপন করে। পর দিন বেলা তিনটায় রাজবাড়ি থেকে আনসার ও পুলিশ নিয়ে একটি ট্রেন পাংশায় পৌঁছায়। পাংশা থেকে কিছু আনসার সদস্য স্বেচ্ছায় যুদ্ধে যাওয়ার জন্য হাজির হয়। পাংশা থেকে একটি মেডিকেল টিম গঠন করা হয়। পাংশা স্টেশন লোকে লোকারণ্য হয়ে গগনবিদারী শ্লোগান দেয়। গ্রামের হাজার হাজার মানুষ ছুটে আসে তাঁদের স্বাগত জানানোর জন্য, কিন্তু কেউ খালি হাতে আসেনি। কারও হাতে ডাব, কারও হাতে রুটি, কারও হাতে কলা, কারও হাতে গুড়– যে যেভাবে পেরেছে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। এগুলো সঙ্গে নিয়ে তাঁরা কুষ্টিয়ায় পাকিস্তানি বাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য রওনা দিলেন। এই যুদ্ধে মুক্তিবাহিনী জয়লাভ করে, কিন্তু দিয়ানত নামের একজন আনসার শহিদ হন। দিয়ানতের লাশ দেখার জন্য পথে পথে অগুণতি মানুষের ভিড় জমে। তারা গগনবিদারী শ্লোগান দেয়। গোয়ালন্দ ঘাটে ব্যারিকেড দেওয়ার ঘটনা উল্লেখ করে মনজুর মোরশেদ সাচ্চু বিস্ময় প্রকাশ করে লিখেছেন—

"এবার গোয়ালন্দ ঘাটে ব্যারিকেড দিয়ে রাখতে হবে, যাতে আরিচা থেকে কোনো পাকিস্তানি সেনার দল নৌপথে এদিকে আসতে না পারে। আমাদের পাংশা থেকেও কিছু আনসার এই ব্যারিকেডে অংশ নেওয়ার জন্য গোয়ালন্দ রওনা হলো। আমরা পাংশাতেও রাতের বেলা পাহারা দেওয়ার জন্য একটা দল গঠন করলাম, যাতে পাকিস্তানি বাহিনী পাংশাতে প্রবেশ করতে না পারে। আজও সেই প্রস্তুতির কথা মনে পড়লে হাসি পায়। আমাদের হাতে ছিলো কয়েকটা একনলা-দোনলা বন্দুক, লাঠি, দা, কুড়াল এসব অস্ত্র। ...তবে আমাদের মনোবল ছিলো প্রচুর। যার ফলে এই সামান্য অস্ত্র নিয়ে একটা বিশ্বসেরা সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করা আমাদের কাছে কোনো ব্যাপারই মনে হতো না।"[১১]

এ কে এম ওয়াহেদুল ইসলাম 'দিনাজপুরে মুক্তিযুদ্ধ' গ্রন্থে দিনাজপুরে প্রাথমিক প্রতিরোধের স্মৃতিচারণ করেছেন। ২৫শে মার্চের পর ১০ থেকে ১২ দিন দিনাজপুর মুক্ত ছিলো। মহনপুর ব্রিজ তাঁর বাড়ি থেকে দেড় দুই মাইল দূরে। ফুলবাড়ি থেকে যেন কোনো পাকিস্তানি সৈন্য আসতে না পারে সেজন্য তাঁরা ইপিআর নিয়ে সেখানে অবস্থান করেন। তাঁর ইউনিয়নে তিনি মিটিং করেন। তাঁরা মহনপুরের রাস্তা কেটে প্রতিরোধ গড়তে গেলে মহেশপুরের খলিল চেয়ারম্যান সেখানে বাধা দেন। পরে অঞ্চলের সবাই মিলে তাঁর কাছে গেলে তিনি সরে দাঁড়ান। তখন রাস্তা কেটে পাকিস্তানি বাহিনীর গতিরোধের চেষ্টা করা হয়। ১৩ই এপ্রিল পাকিস্তানি বাহিনী ভাঙা রাস্তা পুনরায় নির্মাণ করে এক পর্যায়ে দিনাজপুর শহরে ঢুকে পড়ে।[১২]

আবু জাফর শামসুদ্দীন 'আত্মস্মৃতি' গ্রন্থে জনসাধারণের অবকাঠামোগত প্রতিরোধচিত্রের স্মৃতিচারণ করেছেন। তিনি ঢাকা থেকে ১লা এপ্রিল জামালপুরের দক্ষিণবাগে তাঁর গ্রামের বাড়ি পৌঁছান। সেখানে তিনি আর্মির অগ্রযাত্রাকে প্রতিরোধ করবার প্রাথমিক প্রচেষ্টা লক্ষ করেন। তিনি লিখেছেন,

"দস্যু বাহিনী রেললাইন মেরামত করে আড়িখলা পর্যন্ত এসেছে বলে সংবাদ পাওয়া গেলো। এ সংবাদ সত্য বলে মনে হয় না। তবু এ সংবাদ পাওয়া মাত্র স্থানীয় লোকজন ঘোড়াশালের রেলসেতুর ওপরের রেললাইন খুলে ফেলেছে শুনলাম। নীচের মূল স্ট্রাকচার ঠিকই থাকে, ওপরের রেল ও স্লিপার খুলে নদীতে ফেলে দেয়। জ্যেষ্ঠপুত্র খোকা জামালপুর বাজারে ছিলো। সে ফিরে এসে এ সংবাদ দিলো। ... (১২ এপ্রিল) ঘোড়াশালে আগত ট্রেনটিতে তিনটি বগি, দুটিতে পাঞ্জাবি সেনা, অন্যটিতে রেললাইন মেরামতের জন্য রেলস্লিপার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি।"[১৩]

মুক্তিযুদ্ধে ৪ নং সেক্টর সিলেটের দায়িত্বে ছিলেন ব্রিগেডিয়ার চিত্তরঞ্জন দত্ত। তিনি সিলেট এলাকার যুদ্ধের স্মৃতিচারণ করেছেন। সিলেটে তখন দুটি সাব-সেক্টর খোলা হয়। বিডিআর, আনসার, মুজাহিদ ও পুলিশকে নিয়ে গড়ে ওঠে 'সেক্টর ট্রুপস' আর স্কুল-কলেজের ছাত্রদের নিয়ে গড়ে ওঠে 'গণবাহিনী।' সেক্টর ট্রুপসের কাজ ছিলো শত্রুদের ধ্বংস ও অ্যামবুশ করা, এবং গণবাহিনীর কাজ ছিলো পুল ধ্বংস করা, মাইন পোঁতা ও ছোটোখাটো শত্রু ঘাঁটি ধ্বংস করা। সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক থেকে তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিলো তাঁর এলাকার সকল চা বাগান অকেজো করে দেওয়া।

কূটনৈতিক প্রতিরোধ

মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাংলাদেশীদের স্মৃতিকথায় পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে তাঁদের কূটনৈতিক ভূমিকার চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা, বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকার প্রধান ও পদস্থ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সঙ্গে বাংলাদেশের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে, সভা-সমাবেশের আয়োজন করে পাকিস্তান আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তাঁরা প্রতিবাদ জানিয়েছেন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেছেন। বিদেশের মাটিতে পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে কূটনৈতিকভাবে প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশ নিয়ে তাঁরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করেছেন। পরবর্তীকালে প্রবাসীদের মধ্যে যাঁরা স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আবু সাঈদ চৌধুরী, আবদুল মতিন, আবুল মাল আবদুল মুহিত প্রমুখ।

আবু সাঈদ চৌধুরী 'প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি' গ্রন্থে তাঁর প্রবাস জীবনে পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে যেসব কার্যক্রম সম্পাদন করেছেন সেসব ঘটনার বিস্তৃত স্মৃতিচারণ করেছেন। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্য পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসেবে আবু সাঈদ চৌধুরী সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় ছিলেন। তিনি সেদিন সকাল বেলায় বিবিসির মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের ওপর পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর 'অপারেশন সার্চলাইট' প্রয়োগের সংবাদ পান।[১৫] ঐদিনই তিনি আন্তর্জাতিক বিশ্বের কাছে পাকিস্তানের বর্বরোচিত হামলার সংবাদটি পৌঁছে দেন। তিনি লিখেছেন,

"যথারীতি সাড়ে দশটায় জেনেভাস্থ জাতিসংঘ প্রাসাদে মানবাধিকার কমিশনের কাজ শুরু হলো। চেয়ারম্যানের অনুমতি নিয়ে সভার প্রারম্ভে বিবিসির খবরের কথা উল্লেখ করে বললাম : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হিসেবে আমি অত্যন্ত শংকিত হয়ে পড়েছি। আমি এখনই আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। আজকেই লন্ডনে ফিরে যাবো এবং সেখান থেকে সম্ভব হলে ঢাকায়। আজকের সন্ধ্যায় বর্তমান অধিবেশনের সমাপ্তি পর্যন্ত থাকতে পারছি না।"[১৬]

কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশে ফিরতে পারেননি। ব্রিটেনে অবস্থান করে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শেষ অবধি কূটনৈতিক যুদ্ধ চালিয়ে যান। জেনেভা থেকে লন্ডনে ফিরে ২৭শে মার্চ শনিবার তিনি ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের প্রধান ইয়ান সাদারল্যান্ড এবং ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর একান্ত সচিব ব্যারিংটনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।[১৭] আবু সাঈদ চৌধুরী লিখেছেন যে, সাক্ষাতের সময়ে সাদারল্যান্ডের নিকট ঢাকাস্থ ব্রিটিশ ডেপুটি হাইকমিশনার ফ্রাংক সার্জেন্টের একটি টেলেক্স পৌঁছায়। টেলেক্সের মাধ্যমে তাঁরা ২৫শে মার্চ রাত্রির ভয়াবহ গণহত্যার বিস্তারিত তথ্য জানতে পারেন। জানতে পারেন, সান্ধ্য আইন শিথিল হলে একজন ফার্স্ট সেক্রেটারি অল্পক্ষণের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। তিনি দেখতে পান ইকবাল হলের সিঁড়ি বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। জগন্নাথ হলে গণকবর খনন করে সেখানে ছাত্র-শিক্ষকদের মৃত দেহ ছুড়ে ফেলা হয়েছে। গুলির ভয় দেখিয়ে যে ছাত্রদের দ্বারা মৃত দেহ গণকবরের সামনে আনা হয় পরে তাদেরকেও গুলি করে সেই কবরেই ফেলা হয়। ঢাকার অন্যান্য জায়গায়, রাস্তায় রাস্তায় তাঁরা অনেক মৃত দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। সাদারল্যান্ড জানান, সেখানে ব্রিটিশ নাগরিকদের ফিরিয়ে নেওয়ার অনুরোধ রয়েছে এবং জানানো হয়েছে আর কোনো টেলেক্স পাঠানো সম্ভব হবে না। কারণ প্রত্যেক দূতাবাসকে পাকিস্তান সরকার টেলেক্স ব্যবহার করতে নিষেধ করেছে। আবু সাঈদ চৌধুরী লিখেছেন,

"ক্ষোভে, দুঃখে, বেদনায় ও অপমানে আমি তখন বিহ্বল। আমি সাদারল্যান্ডকে বললাম, এই মুহূর্ত থেকে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্ক রইল না। আমি দেশ থেকে দেশান্তরে যাবো আর পাকিস্তানি সৈন্যদের এই নিষ্ঠুরতা-নির্মমতার কথা বিশ্ববাসীকে জানাবো। তারা আমার ছেলে-মেয়েদের হত্যা করেছে। এর প্রতিবিধান চাই।"[১৮]

মুজিবনগর সরকার পরবর্তীকালে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে ব্যাপক আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করেন। আবু সাঈদ চৌধুরী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশ সফরকালে সরকারি ও বেসরকারি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দাবির মর্মার্থ ব্যাখ্যা করেন এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেন।

আবদুল মতিন 'মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি : যুক্তরাজ্য' গ্রন্থে যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সংগঠিত আন্দোলন, সভা-সেমিনার এবং কূটনৈতিক নানা তৎপরতার সমর্থনে পরিচালিত কর্মকাণ্ডের বিবরণ দিয়েছেন। তিনি একজন সাংবাদিক। সাংবাদিক হিসেবে যুক্তরাজ্যে মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের পক্ষে তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন।

আবুল মাল আবদুল মুহিত 'স্মৃতি অম্লান ১৯৭১' গ্রন্থে ওয়াশিংটনে পাকিস্তান দূতাবাসে কর্মরত অবস্থায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে যেসব ভূমিকা পালন করেছেন তার স্মৃতিচারণ করেছেন। ২৫শে মার্চ বাংলাদেশে যখন গণহত্যা শুরু হয় ওয়াশিংটনে তখন দুপুর বেলা। কিন্তু সংবাদটি তাঁরা পান বারো ঘণ্টা পর ২৬শে মার্চ ভোর বেলা। ২৬শে মার্চের ভোরে স্টেট ডিপার্টমেন্টের পাকিস্তান ডেস্কের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ক্রেইগ ব্যাক্সটার টেলিফোনে তাঁকে খবরটি জানান এবং রেডিও শুনতে বলেন। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সূচনার সংবাদ তিনি রেডিওর মাধ্যমে জানতে পারেন। ওয়াশিংটনে বাঙালিরা খবরটি শুনে খুব ক্ষুব্ধ হন। আবুল মাল আবদুল মুহিত লিখেছেন,

"সাতাশে বিকেলে ওয়াশিংটনের বাঙালি সমাজ আমার বাসায় হাজির। যে খবর পেয়েছে সেই এসেছে। আমার মনে হলো পরিবার পরিজন নিয়ে আমাদের সংখ্যা ছিলো প্রায় সত্তর। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সবাই হাজির, পাকিস্তানি ধ্বংসযজ্ঞের প্রতিবাদ করতে হবে এবং একে প্রতিহত করার কথা ভাবতে হবে। ঢাকার হত্যাযজ্ঞ এবং দেশব্যাপী ধ্বংসলীলা পাকিস্তানের কবর রচনা করেছে। এখন বিবেচনার বিষয় একটি, কি করে, কতো দ্রুততার সঙ্গে পাকিস্তানি সামরিকবাহিনীকে বাংলাদেশ থেকে উৎপাটন করা যাবে। উদ্যোক্তা হিসেবে আমাকেই বলতে হলো আমরা এখন আর পাকিস্তানি নই এবং পাকিস্তানি হায়েনাদের শায়েস্তা করা আমাদের কর্তব্য। প্রবাসে আমরা জনমত গড়ে তুলতে পারি। আমাদের দেশে ত্রাণকার্য এবং যুদ্ধ উদ্যোগে সাহায্য করতে পারি এবং পাকিস্তানকে সর্বতোভাবে অপদস্থ করতে পারি। তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত হলো যে, মার্কিন ও আন্তর্জাতিক নেতাদের কাছে বার্তা পাঠাতে হবে। আরো ঠিক হলো যে, সোমবারে শোভাযাত্রা হবে– কংগ্রেস সিঁড়িতে, বিশ্বব্যাংক ও মুদ্রা তহবিলের সামনে আর স্টেট ডিপার্টমেন্টের সামনে।"[১৯]

২৯শে মার্চ তাঁরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। কূটনৈতিক তৎপরতার অংশ হিসেবে ২৮শে মার্চ তাঁরা তারবার্তা পাঠান। বাংলাদেশের নাগরিকদের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট নিক্সন, সেক্রেটারি রজার্স, নিরাপত্তা সহকারী কিসিনজার এবং সিনেটে বৈদেশিক বিষয়ের চেয়ারম্যান সিনেটর ফুলব্রাইটের নিকট বার্তা পৌঁছানো হয়। এই সঙ্গে জাতিসংঘের মহাসচিব উথান্ট এবং নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির নিকট আবেদন পাঠানো হয়। বিক্ষোভ প্রদর্শনে প্রায় দুশো লোকের র‍্যালি হয়। এই বিক্ষোভ কংগ্রেসের অনেক জনপ্রতিনিধির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়।

সশস্ত্র প্রতিরোধ

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের সশস্ত্র প্রতিরোধের চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। এসব চিত্রে দেখা যায় যে, প্রাথমিক প্রতিরোধ হিসেবে মিছিল-মিটিং, রাস্তাঘাট অবরোধ, অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদির পাশাপাশি সশস্ত্র যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। প্রাথমিক পর্যায়ে থানা সদরের অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্র, স্কুল কলেজের ক্যাডেট কোরের অস্ত্র এবং ব্যক্তিগত অস্ত্র নিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা সশস্ত্র প্রতিরোধের চেষ্টা করেন। ইপিআর, আনসার, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর বিদ্রোহী সদস্যরা তাঁদের অস্ত্র নিয়ে প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন জায়গায় পাকিস্তানি বাহিনীকে পরাজিত করে তাদের অস্ত্র নিয়ে মুক্তিবাহিনী নিজেদের অস্ত্রভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেন। এরপর

ভারত সরকারের সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হলে সশস্ত্র যুদ্ধে গতি সঞ্চার হয়। যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ের সশস্ত্র প্রতিরোধের স্মৃতিচারণ করে যাঁরা গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন– এম এ জলিল, গোলাম মোস্তফা গিয়াসপুরী, হাফিজ উদ্দিন আহমদ, কাজী আনোয়ারুল ইসলাম, কাদের সিদ্দিকী, মনসুর আহমদ খান, গিয়াসউদ্দিন চৌধুরী, মো. জহুরুল ইসলাম বিশু, কাজী আব্দুর রশিদ, এম আব্দুর রহিম, কে. এম. সফিউল্লাহ্, নাসির উদ্দিন, সুকেশচন্দ্র দেব, আখতার আহমেদ, শাফায়াত জামিল, রফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

এম এ জলিল তাঁর স্মৃতিকথায় মুক্তিযুদ্ধে বরিশালে ১৭ই এপ্রিলের প্রতিরোধ যুদ্ধের ঘটনা তুলে ধরেছেন। সেদিন বরিশালে পাকিস্তানি একজন গোয়েন্দাকে গ্রেফতার করেন এবং বরিশাল স্টেডিয়ামে জনতার সামনে প্রকাশ্যে তাকে গুলি করে হত্যা করেন। এই ঘটনার ফলশ্রুতিতে পাকিস্তানি বিমান বাহিনীর দুইখানা স্যাবর-জেট বিমান বরিশালের আকাশে উড়তে দেখেন। বরিশালে পাকিস্তানি বাহিনীর এটা প্রথম আক্রমণ। এই বিমান আক্রমণকে প্রতিরোধ করার অস্ত্র তাঁদের কাছে ছিলো না। তবে সাহসী মুক্তিযোদ্ধারা তাঁদের রাইফেল দিয়ে গুলি করার অনেক চেষ্টা করেছেন। শহরের বিভিন্ন বেসামরিক অবস্থানের ওপর বিমান থেকে তারা নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করেছে। এতে মুক্তিযোদ্ধাদের ছোটোখাটো আঘাত ছাড়া বিশেষ কোনো ক্ষতি হয়নি।[২০]

গোলাম মোস্তফা গিয়াসপুরী 'মুক্তিযুদ্ধের কিশোর ইতিহাস : রাজবাড়ী জেলা' গ্রন্থে গোয়ালন্দ ঘাট প্রতিরোধ যুদ্ধের স্মৃতিচারণ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্ন থেকেই গোয়ালন্দ ঘাটের বীর জনতা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ দুর্গ গড়ে তোলেন। আরিচা থেকে নগরবাড়ি ঘাট ও গোয়ালন্দ ঘাট পতনের জন্য পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী মরিয়া হয়ে ওঠে। সন্ধ্যা হলেই নৌ তরীতে সার্চলাইট জ্বালিয়ে গতিপথ অনুসন্ধানে মেতে ওঠে। এদিকে পদ্মার নদীপাড়ের মানুষ দিনরাত সারিবদ্ধভাবে দেশীয় অস্ত্র, ঢাল তলোয়ার, তীর ধনুক, বল্লম ইত্যাদি নিয়ে 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,' ইত্যাদি শ্লোগান দিয়ে প্রস্তুত হতে থাকে। রাজবাড়ি শহর থেকে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ গোয়ালন্দ প্রতিরোধ রণাঙ্গনের শক্ত ঘাঁটি গড়ে তোলার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এসডিও শাহ মো. ফরিদ, আনসার প্রশিক্ষক মো. খোরশেদ আলম, আক্কাছ আলী মিয়া, মো. বফু চৌধুরী, আ. রাজ্জাক (অব. সেনা সদস্য), মো. আবদুল হাকিমসহ বেশকিছু যুবক, এবং ৬৩ জন আনসার সদস্য স্পেশাল ট্রেনে রাজবাড়ি থেকে গোয়ালন্দ যাত্রা করে। পথে হাজার হাজার মানুষ তীর ধনুক, লাঠি, বল্লম ইত্যাদি নিয়ে ট্রেনে উঠে পড়ে। তাঁদের শ্লোগান ছিলো 'চলো চলো, গোয়ালন্দ চলো', 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু' ইত্যাদি। মাইকে মাইকে, মুখে চুঙ্গা লাগিয়ে গোটা গোয়ালন্দ এলাকায় প্রচার শুরু হয়। অসংখ্য মানুষ রাতের অন্ধকারে গোয়ালন্দ ঘাটে ছুটে আসে। এভাবে ২১শে এপ্রিল বুধবার পর্যন্ত বাংলার বীর জনতা গোয়ালন্দ ঘাট শত্রু মুক্ত রাখে। কিন্তু ভোর চারটার দিকে পাকিস্তান বাহিনী ৩টি স্টিমার, ২টি গানবোট, প্যারামিলিটারি সৈন্য, ৩টি লঞ্চ, ২টি হেলিকপ্টার, ট্যাংক রেজিমেন্ট সমরাস্ত্রসহ বাঙালি মুক্তিবাহিনীর ওপর গুলিবৃষ্টির মতো অতর্কিত আক্রমণ চালায়। ভূমিতে গান পাউডার ছড়িয়ে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। হেলিকপ্টার থেকে কভারিং দিয়ে মিলিটারি বাহিনী

কামারডাঙ্গী চরে নেমে আসে। পাকিস্তানি বাহিনীর বেপরোয়া আক্রমণে চরাঞ্চলে অসংখ্য নিরীহ মানুষ নিহত হয়। গোটা গোয়ালন্দ ঘাট আগুনের লেলিহান শিখায় দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। ভেঙে পড়ে বাঙালির প্রতিরক্ষা ব্যূহ।[২১]

হাফিজ উদ্দিন আহমদ তাঁর 'রক্তেভেজা একাত্তর' গ্রন্থে যশোর ক্যান্টনমেন্টে বাঙালি সৈনিকদের বিদ্রোহ ও প্রতিরোধ যুদ্ধের স্মৃতিচারণ করেছেন। এ যুদ্ধটি হয় ৩০শে মার্চ ১৯৭১। যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে ১৫মাইল দূরে জগদীশপুর গ্রামে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রথম ব্যাটালিয়ন শীতকালীন ট্রেনিং এক্সারসাইজে ছিলো। ব্রিগেড সদর দপ্তর থেকে ট্রেনিং অসমাপ্ত রেখে তাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। ২৯শে মার্চ রাত প্রায় ১২টায় তারা ক্যান্টনমেন্টে পৌঁছেন। অস্ত্রাগারে অস্ত্র জমা দিয়ে সবাই ব্যারাকে ফিরে যান। হাফিজ উদ্দিন লিখেছেন,

"পরদিন ৩০ মার্চ, সকাল সাড়ে সাতটা। দীর্ঘ পদযাত্রাজনিত ক্লান্তির জের তখনো কাটেনি, সবেমাত্র হাতমুখ ধুয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসেছি, সামনে এসে দাঁড়ালো আমার অর্ডারলি। চেহারায় দারুণ উত্তেজনার ছাপ, চোখের কোণে পানি টলমল করছে, 'স্যার, সর্বনাশ হয়েছে, আমরা হাতিয়ার সাফ করতে সবাই কোতে (অস্ত্রাগার) গিয়েছিলাম, ব্রিগেড কমান্ডার সাহেব অর্ডার দিয়েছেন আমরা আর হাতিয়ার ধরতে পারবো না। শিগগিরই নাকি বালুচ রেজিমেন্ট এসে আমাদের কোত থেকে সব হাতিয়ার নিয়ে যাবে।"[২২]

এ সংবাদে বাঙালি সৈনিকেরা অস্ত্রাগার ভেঙে অস্ত্র নিয়ে পজিশনে যায়। শুরু হয় উভয় পক্ষের গোলাগুলি। এক পর্যায়ে ক্যাপ্টেন হাফিজ বাঙালি সৈনিকদের নেতৃত্ব নেন। বিকাল সাড়ে তিনটার দিকে বাঙালি সুবেদার মজিদ জানান গুলি প্রায় শেষ। ক্যাপ্টেন হাফিজ সবাইকে নিয়ে পিছু হটার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি লিখেছেন,

"আমরা ছোটো ছোটো গ্রুপে তিন জন করে আলাদাভাবে এগোতে লাগলাম। আমবাগান থেকে বেরিয়ে মাঠে নামতেই গুলিবৃষ্টির মধ্যে পড়লাম। শুকনো মাঠ, গুলির আঘাতে ধুলো উড়ছে চতুর্দিকে। একটি গ্রুপে আমি, হাবিলদার করিম, ইব্রাহিম এবং আরও দু'একজন দ্রুত দৌড়ে গেলাম সামনের খিতিবদিয়া গ্রামের দিকে। মিনিট দশেকের মধ্যেই গাছগাছালিতে ঢাকা গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়লাম আমরা। দেখলাম এক অবিস্মরণীয় দৃশ্য। কয়েকশ' গ্রামবাসী দা, খন্তা, বর্শা, কুড়াল হাতে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্য। 'জয়বাংলা' ধ্বনি দিয়ে আমাদের বুকে জড়িয়ে ধরলো তারা।"[২৩]

যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে পিছু হটে তারা চৌগাছা ইপিআর বাঙালি সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হন। এই যুদ্ধে পিছু হটার সময় লে. আনোয়ার শহিদ হন।

'আমার একাত্তর' গ্রন্থে কাজী আনোয়ারুল ইসলাম খুলনার খালিশপুরে ক্রিসেন্ট জুটমিল এলাকায় পাকিস্তান আর্মি ও বিহারিদের বিরুদ্ধে বাঙালিদের প্রতিরোধ যুদ্ধের স্মৃতিচারণ করেছেন। সে সময়ে তিনি ক্রিসেন্ট জুটমিলের লেবার এডভাইজার পদে চাকরি করতেন। বিহারি বাঙালি মিলে ক্রিসেন্ট জুটমিলে তখন শ্রমিক সংখ্যা প্রায় ১০,০০০। আনোয়ারুল ইসলাম উল্লেখ করেছেন সাতাশে মার্চ

সকাল নয়টার দিকে তাঁরা একটি নেভাল গানবোট অফিসার্স কলোনির দিকে আসতে দেখেন। বোটের সৈন্যরা কলোনির দিকে হাত উঁচিয়ে এমন ভাব দেখায় যে তারা এসে গেছে আর কোনো চিন্তা নেই। বাঙালিদের ধারণা নেভির বাঙালিরা বিদ্রোহ করে বেরিয়ে এসেছে। একটু পরেই গানবোট থেকে কামান দাগা শুরু হয়। কামানের গুলি এসে পড়তে থাকে নদীর দুইধারের জুটমিলের কলোনিগুলোতে। সবারই দিশেহারা অবস্থা। কাজী আনোয়ার কোনোরকমে ছুটে গিয়ে বিল্ডিংয়ের পিছনে আবর্জনার মধ্যে শুয়ে পড়ে প্রাণ বাঁচান।

কাজী আনোয়ারুল ইসলাম দেখেছেন কিভাবে জুটমিলের বাঙালিদের ওপর বিহারিদের লেলিয়ে দিয়ে অন্যদিক দিয়ে আর্মিরা প্রবেশের চেষ্টা করে। বাঙালি পুলিশ ও যুবকরা ট্রেঞ্চ কেটে ব্যারিকেড দিয়ে আর্মিদের প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত। সে মুহূর্তে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর ট্রাক ঢোকার চেষ্টা করে। ব্যারিকেডের জন্য তারা অগ্রসর হতে পারেনি। ট্রাক থামিয়ে দুইধারের বাঙালি শ্রমিকদের ডেকে দুই একটা ব্যারিকেড তারা পরিষ্কার করে। এরপর শ্রমিকদের লাইনে দাঁড় করিয়ে ব্রাশ ফায়ার করে হত্যা করে। অন্যদিকে কাঁধে ঢোল ঝুলিয়ে বিহারি মহিলারা সম্মুখ ভাগে থেকে ঢোল বাজিয়ে আর তাদের পিছনে বিহারি পুরুষেরা হাতবোমা নিয়ে এগিয়ে যায় এবং বাঙালিদের দিকে ছুড়ে মারে। প্রাণভয়ে বাঙালিরা পালাতে থাকে। কেউ নদীতে ঝাঁপ দেয়। আনোয়ারুল ইসলাম লিখেছেন,

"বিহারিরা যখন হাতবোমা মারা শুরু করে তখন থ্রি নট থ্রি রাইফেল নিয়ে তিন-চার জন পুলিশ ট্রেঞ্চে বসেছিলো। তাদের সঙ্গে ছিলো কয়েক জন বাঙালি শ্রমিক, হাতে টু টু বোর রাইফেল। এরা বাইরের মেইন গেটের দিকে তাক করে বসেছিলো। উদ্দেশ্য ছিলো আর্মির আক্রমণ প্রতিহত করা। এরা এখন পিছন দিকে মুখ ঘুরিয়ে বিহারিদের লক্ষ করে গুলি ছোঁড়া শুরু করেছে। থ্রি নট থ্রি রাইফেলের সামনে হাত বোমা বেশিক্ষণ টিকতে পারে না। অল্পক্ষণের মধ্যেই বিহারিরা পিছু হটতে লাগলো। এই খবর পেয়ে যেসব বাঙালি কিছুক্ষণ আগে বিহারিদের ভয়ে নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিলো তারা দলে দলে নদী থেকে উঠে আসতে লাগলো। যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে বিহারিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। কারও হাতে লাঠি, কারও হাতে ছুরি, কারও হাতে বল্লম ইত্যাদি। বিহারিরা প্রাণপণে ছুটে পালাচ্ছে, বাঙালিরা আক্রমণ করছে। হিংস্রতায় ভরপুর ছিলো এই আক্রমণ।"[২৪]

মনসুর আহমদ খান 'মুক্তিযুদ্ধে রাজশাহী' গ্রন্থে রাজশাহীতে পুলিশ বাহিনী কর্তৃক পাকিস্তানি বাহিনীকে প্রতিরোধ যুদ্ধের বর্ণনা দিয়েছেন। শাহ আঃ মজিদ সড়কে পুলিশবাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবক দলের হাতে পাকিস্তানি বাহিনী ২৬শে মার্চ প্রথম বাধাপ্রাপ্ত হয়। পাকিস্তানি আর্মি বাঙালি পুলিশদের তৎপরতা জেনে গেলে ইপিআর ক্যাম্প ও পুলিশ লাইন তাদের প্রধান লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়। পাকিস্তানি সেনারা পুলিশ লাইনের কাছে গিয়ে কয়েক রাউন্ড গুলি ছোড়ে। এসময় পুলিশ লাইনের ভিতর থেকে পাল্টা গুলি ছুড়লে উভয় পক্ষের গোলাগুলি শুরু হয়। এতে বেশ কয়েকজন সাধারণ লোক নিহত হয়। এদিকে শহরের সর্বস্তরের মানুষ রুটি, চা, পানি ও অন্যান্য খাদ্য পুলিশ বাহিনীকে সরবরাহ করে। পুলিশরা সারারাত বিক্ষিপ্তভাবে গুলি ছোড়ে। পুলিশ বাহিনীর তীব্র প্রতিরোধের মুখে

পাকিস্তানি বাহিনী তখন পিছু হঠতে বাধ্য হয়। পুলিশ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আলোচনার মাধ্যমে একমত হয় যে, তাঁরা কেউ কাউকে আক্রমণ করবে না। কিন্তু পাকিস্তানি সেনারা চুক্তি ভঙ্গ করে ২৭শে মার্চ দুপুর বেলায় বিপুল বিক্রমে পুলিশ লাইন আক্রমণ করে। শুরু হয় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। পুলিশ বাহিনী আপ্রাণ চেষ্টা করে কিন্তু পাকিস্তানি সেনাদের ভারী অস্ত্র আর গোলাবারুদের মুখে টিকতে পারেনি। রক্তের বন্যায় ভেসে যায় পুলিশ লাইন চত্বর। ১৭ জন পুলিশের লাশ ফেলে পাকিস্তানি সেনারা চলে যায়।[২৫]

গিয়াসউদ্দিন চৌধুরী 'যুদ্ধে যুদ্ধে একাত্তরের নয় মাস' গ্রন্থে রাজশাহী ও নওগাঁ অঞ্চলে তাঁর সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধের স্মৃতিচারণ করেছেন। তিনি নওয়াবগঞ্জ, রাজশাহী, নওগাঁ ও বগুড়ায় পাকিস্তানি আর্মিদের অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করবার নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি মার্চ মাসে নওগাঁয় ইপিআরের ৭নং উইংয়ের সহকারী কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করছিলেন। মেজর নাজমুল হক ১৮ই মার্চ উইং কমান্ডার হিসেবে নিযুক্ত হন। পরে তিনি রাজশাহী অঞ্চলের সেক্টর কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। নাজমুল হকের সঙ্গে পরিকল্পনা করে গিয়াসউদ্দিন চৌধুরী প্রতিরোধ যুদ্ধে অগ্রসর হন। পরিকল্পনা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

"আমি মেজর নাজমুল হকসহ পরিকল্পনা করলাম যে, ২৮শে মার্চ প্রথমত এক কোম্পানি ইপিআর এবং শ'খানেক ছাত্র নিয়ে বগুড়ার দিকে রওনা হবো এবং আরেক কোম্পানি ইপিআর ফোর্স নাটোরের রাস্তা দিয়ে সারদায় পাঠাবো ক্যাডেট কলেজের অ্যাডজুটেন্ট মেজর রশীদের কাছে। এবং রংপুর থেকে রাজশাহী যাবার রাস্তা বগুড়ায় বিচ্ছিন্ন করে দেবো। অন্যদিকে মেজর রশীদ তাঁর ফোর্সসহ ঢাকা থেকে রিইনফোর্সমেন্ট নিয়ে রাজশাহী আসার রাস্তা বিচ্ছিন্ন করে দেবে।"[২৬]

গিয়াসউদ্দিন চৌধুরী তাঁর বগুড়ার প্রতিরোধ যুদ্ধের বিবরণ দিয়েছেন। ২৮শে মার্চ তিনি লোকজন নিয়ে বগুড়ায় যান। রাস্তায় সাধারণ জনতার অনেক ব্যারিকেড দেখতে পান। সকালে রওনা দিয়ে ব্যারিকেডের জন্য বগুড়ায় পৌঁছান সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায়। সেখানে রংপুরের আর্মিদের পেট্রোলিংয়ের সময় ২৯/৩০শে মার্চ রাতে একটি অ্যামবুশ পার্টি পাঠান। তাতে নওগাঁ থেকে যাওয়া কয়েকজন ছাত্র, ইপিআর ও পুলিশের লোকজন ছিলো। তিনটি তিনটনি গাড়িসহ কমপক্ষে এক প্লাটুন সৈন্য পেট্রোলিংয়ে বের হয়। রাস্তার মধ্যে অ্যামবুশ পার্টি তাদেরকে অ্যামবুশ করে। গাড়ি তিনটি বিধ্বস্ত হয়, তিনটি অয়ারলেস সেট দখল করা হয় এবং ২৩ জন নিহত হয়। বাকি সৈন্য ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে রংপুরের দিকে পশ্চাদপসরণ করে।[২৭]

গিয়াসউদ্দিন চৌধুরী লিখেছেন যে, তাঁর প্রাথমিক পর্যায়ের যুদ্ধের উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ হলো রাজশাহীর প্রতিরোধ যুদ্ধ। এটি ১লা এপ্রিল থেকে ১৪ই এপ্রিলের ঘটনা। ১লা এপ্রিল ভোর ছয়টার মধ্যে রাজশাহী শহরের অদূরে নওহাটায় তাঁদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি করেন। মেজর রশীদ সারদা থেকে অগ্রসর হয়ে রাজশাহীর পূর্ব দিকে প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি করেন। গিয়াসউদ্দিন চৌধুরীর সঙ্গে সশস্ত্র বাহিনী, পুলিশ, আনসার, মুজাহিদ, ছাত্র, ইপিআর মিলে বাহিনীর সদস্য সংখ্যা এক হাজারের ওপরে

পৌঁছে যায়। ওদিকে শত্রুবাহিনী তাদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ আরও শক্তিশালী করে এবং দিনে দুইবার করে বিমান হামলা চালায়। ৬ই এপ্রিল শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করে মুক্তিবাহিনী শহরের ভিতরে ঢুকে পড়ে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বেশ কিছু সংখ্যক লোক নিহত হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের ৩০-৩৫ জন হতাহত হয়। গিয়াসউদ্দিন চৌধুরী লিখেছেন,

"রাজশাহী পুলিশ লাইন প্রভৃতি জায়গা থেকে বিপুল অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করি। রাজশাহী পুলিশ লাইনের অস্ত্রাগার থেকে প্রায় তিন হাজার অস্ত্র, তিন লাখ গুলি উদ্ধার করা হয়। ...৭ই এপ্রিল থেকে ১০ই এপ্রিল পর্যন্ত আমরা শত্রুবাহিনীর ছাউনির অতি নিকটে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলি ...প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে শত্রুবাহিনীর মনোবল সম্পূর্ণরূপে ভেঙে যায়। শত্রুবাহিনী সে এলাকার সমস্ত বিহারিকে বিপুল অস্ত্রশস্ত্র বিতরণ করে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি করে তাদেরকে সাহায্য করতে নির্দেশ দেয়।"[২৮]

এদিকে হেলিকপ্টার, স্টিমার ও ফেরির মাধ্যমে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দুই ডিভিশন সৈন্য নগরবাড়ি ঘাটে অবতরণ করে। ১৩ই এপ্রিল ভোরের দিকে পাকিস্তানি সৈনিকেরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তারা অনবরত আর্টিলারি ফায়ার করতে থাকে এবং জঙ্গি বিমানের হামলা অব্যাহত রাখে। বৃষ্টির মতো গোলা বর্ষণের মুখে গিয়াসউদ্দিন চৌধুরী ১৪ই এপ্রিল তাঁর বাহিনীকে অপসারণ করে নেন এবং নওয়াবগঞ্জের দিকে সরে আসেন।

মো. জহুরুল ইসলাম বিশু 'পাবনা জেলার মুক্তিযুদ্ধের কথা' গ্রন্থে পাবনা নগরবাড়ি ঘাটে তাঁদের প্রতিরোধ যুদ্ধের স্মৃতিচারণ করেছেন। রফিকুল ইসলাম বকুলের নেতৃত্বে পাবনায় তাঁরা সংগঠিত হয়েছিলেন। নগরবাড়ি ঘাট হয়ে পাকিস্তানি আর্মিরা যাতে শহরে প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য বাংকার খুঁড়ে অনেক আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলেন। ৯ই এপ্রিল আরিচা ঘাট হয়ে ১০ই এপ্রিল শনিবার পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী নগরবাড়ি ঘাটে এসে পৌঁছায়। হানাদার বাহিনী ব্যাপকভাবে চতুর্মুখী আক্রমণ শুরু করে। মুক্তিবাহিনীকে লক্ষ করে দুটি যুদ্ধবিমান বৃষ্টির মতো ব্রাশফায়ার করে। দূর থেকে অথবা নদীর মধ্যে গানবোট থেকে নিক্ষেপ করা মর্টারের শেল বিকট শব্দে চারপাশে পড়তে থাকে। শেলের আঘাত বিশাল গর্ত সৃষ্টি করে ধুলোবালি প্রায় হাজার ফুট ওপরে ছড়িয়ে পড়ে। তারা যেসব বাংকারে অবস্থান করছিলো সেরকমের দশটি বাংকারে একটি শেল পড়লে ধ্বংস হয়ে পুকুর হয়ে যেতো। কোনো উপায় না দেখে তাঁরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাংকার থেকে উঠে কোনোরকমে দৌড়ে ব্রিজের কাছে রাখা জিপে যেয়ে ওঠেন। যখন তাঁরা পিছু হটে দ্রুত শহরের দিকে চলে আসে তখন সকাল ৯টা। নগরবাড়ি ঘাট এবং পাবনা শহর পাকিস্তানি আর্মিদের দখলে চলে যায়।[২৯]

কাজী আব্দুর রশিদ তাঁর 'নওগাঁয় মুক্তিযুদ্ধ' গ্রন্থে রাজশাহীর বিভিন্ন প্রতিরোধ যুদ্ধের স্মৃতিচারণ করেছেন। প্রতিরোধ যুদ্ধের জন্য তিনি নওগাঁ থেকে রাজশাহী যান। আত্রাই থানা পার হয়ে দুই কিলোমিটার যাওয়ার পর রাস্তায় কয়েকজন লোক একটা পুকুর দেখিয়ে বলেন, সেখানে তিনজন পাঞ্জাবি সৈনিক লুকিয়ে আছে। তাদের কাছে কোনো হাতিয়ার নেই। কাজী আব্দুর রশিদ তিনজন

সিপাহীসহ অমৃতলাল চাকমা নামের হাবিলদারকে সেখানে পাঠান। সাথে অনেক সাধারণ লোক যায়। সেই সাধারণ লোকজন পাকিস্তানি সৈনিকদের ঘেরাও করে ধরে আনে। অমৃতলাল চাকমা তাদেরকে গুলি করে মেরে ফেলেন। বেয়নেট দিয়ে পাকিস্তানি সৈনিকদের পেট চিরে দেখেন কাঁঠালের মুচি, গাছের পাতা ছাড়া আর কিছু সেখানে নেই।[৩০]

কাজী আব্দুর রশিদ আরো জানাচ্ছেন যে, আর্মিদের অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করবার জন্য এপ্রিলের ১০ তারিখ সেক্টর কমান্ডার নাজমুল হকের নির্দেশে তিনি রাজশাহী থেকে নগরবাড়ি ঘাটে যান। যখন তাঁরা পৌঁছান ততক্ষণে পাকিস্তানি আর্মি পাবনা শহরের টাউন হলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। তিন রাস্তার মোড়ে কলেজের পিছনে তিন ইঞ্চি মর্টার এবং মেশিনগান সেট করে কয়েকবার ব্রাশ ফায়ার করলে পাকিস্তানি আর্মি আর্টিলারি ফায়ার শুরু করে। তাঁরা পশ্চাদপসরণ করেন। পিছিয়ে এসে মুলাটুলি নামক গ্রামে ব্রিজের পাশে পজিশন নেন। উপযুক্ত জায়গায় মর্টার বসিয়ে ব্রিজের দুই পাশে মেশিনগান লাগান। এলাকার লোকজন নিয়ে ব্রিজের ওপর কাঠ ফেলে ব্যারিকেড দেন। আনুমানিক রাত দশটায় পাকিস্তান আর্মির গাড়ির শব্দ পান। ওদের বিশাল বহরে গাড়ির সংখ্যা ১০৮। দুই ধারে সৈন্য মাঝখানে গাড়ি Advance to Contact পদ্ধতিতে ওরা এগিয়ে আসে। ব্রিজের ওপর কিছুক্ষণ থেমে ওরা ব্যারিকেড সরাতে আরম্ভ করে। কাজী আব্দুর রশিদ ফায়ার ওপেন করার নির্দেশ দেন। দুই পক্ষের মধ্যে প্রায় এক ঘণ্টা তুমুল যুদ্ধ হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের একজন সিপাহী মারা যায় আর শত্রুপক্ষের মারা যায় অনেকে। শত্রুপক্ষ ফায়ার বন্ধ করে পিছু হটে।

কাজী আব্দুর রশিদের স্মৃতিকথায় আরো রয়েছে যে, তাঁরা মুলাটুলি থেকে এগিয়ে গিয়ে ঝলমলিয়া নামক জায়গায় পজিশন নেন। শত্রুবাহিনী তাঁদের ফাঁদের মধ্যে ঢোকামাত্র তাঁরা ফায়ার ওপেন করেন। আনুমানিক বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত তাঁদের যুদ্ধ চলে। গাড়ির লম্বা বহর বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত দেখা গেছে। তারপর আর দেখা যায়নি। জীবিত যারা ছিল তারা পালিয়ে গেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের তিন ইঞ্চি মর্টারের বোমাও আর ছিল না। লোকজন এসে খবর জানায় শত্রুপক্ষের ৩০০ লোকের বেশি মারা গেছে। আটটা গাড়ি রাস্তার নিচে পড়ে আছে। জীবিত কোনো লোক নেই। এরপর কাজী আব্দুর রশিদ মর্টারের গোলার খোঁজে চারঘাট যান। খুব জোরে ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হয়। চলে রাত একটা পর্যন্ত। ফিরে এসে বানেশ্বরে বাধাপ্রাপ্ত হন। এরপর আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেননি।[৩১]

এম আব্দুর রহিম দিনাজপুরে প্রতিরোধ যুদ্ধের স্মৃতিচারণ করেছেন। তিনি এই যুদ্ধে সম্পৃক্ত ছিলেন। ২৯শে মার্চ দিনাজপুরের কুঠিবাড়িতে অবস্থানরত কয়েকজন ইপিআরের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করেন। একাজে ইপিআরের মোজাফ্ফর তাঁকে সহযোগিতা করেন। যুদ্ধের জন্য বাঙালি ইপিআর সদস্যরা তখন মানসিকভাবে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। মোজাফ্ফরের মাধ্যমে খবর পেয়ে বাঙালি ইপিআর সদস্যরা বিদ্রোহ করেন। পাকিস্তানি ও অবাঙালি সদস্যরা পাল্টা আক্রমণ করে। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানিরা কুঠিবাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। সেক্টর হেডকোয়ার্টার এবং সার্কিট হাউজ থেকে পালিয়ে ২৯শে মার্চ রাতের আঁধারে তারা সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টে চলে যায়। এই যুদ্ধে ইপিআরদের সঙ্গে

পুলিশ, মুজাহিদ এবং আনসার সদস্যরা যোগ দিয়েছিলেন। সেক্টর হেডকোয়ার্টার থেকে যাওয়ার সময় তাঁরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যান। পাকিস্তানিদের পরাজিত করে এম আব্দুর রহিম ইপিআর সৈনিকদের নিয়ে কোকুইডাঙি আমবাগানে রাত্রিযাপন করেন। সেখানে গ্রামের সাধারণ মানুষ তাঁদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে। এরপর ১৩ই এপ্রিল পর্যন্ত দিনাজপুর হানাদার মুক্ত ছিলো।[৩২]

নাসির উদ্দিন 'যুদ্ধে যুদ্ধে স্বাধীনতা' গ্রন্থে সৈয়দপুরে প্রতিরোধ যুদ্ধের কথা লিখেছেন। সেখানে বাঙালি ক্যাপ্টেন আনোয়ারের নেতৃত্বে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হয়। মেজর নাসির উদ্দিন লিখেছেন,

"পশ্চিম দিক থেকে গোলার আওয়াজ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিলো। সৈয়দপুরে ভোর থেকেই আক্রমণের পর আক্রমণ চললো ৩ ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের ক্ষুদ্র দলটির ওপর। ...রাতভর উপর্যুপরি আক্রমণের মুখে ক্ষতবিক্ষত ক্যাপ্টেন আনোয়ার সকাল ১০টার দিকে তাঁর অসম বাহিনী নিয়ে সৈয়দপুর সেনানিবাস ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলেন। কিন্তু এই প্রতিরোধ যুদ্ধে ইতিমধ্যেই তাঁর বাহিনীর অন্তত ৫০ জন বাঙালি সৈনিক নিহত বা আহত হয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধের ঊষালগ্নে এভাবেই শহিদী মৃত্যুর এই মহান দীপশিখাটি জ্বালিয়ে যায় সৈয়দপুর সেনানিবাসের ক্ষুদ্র একটি অপেশাদার দলের বাঙালি সৈনিকেরা।"[৩৩]

কে. এম. সফিউল্লাহ্ 'মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ' গ্রন্থে ময়মনসিংহে বাঙালি ইপিআর সদস্যদের পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধের বিবরণ দিয়েছেন। কে. এম. সফিউল্লাহ তখন তাঁর বাহিনী নিয়ে টাঙ্গাইল এবং মুক্তাগাছা হয়ে ময়মনসিংহের পথে। ২৭শে মার্চ থেকে ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের বাঙালি সৈন্যরা বিরামহীনভাবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। গভীর রাতে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈনিকদের হাতে যতো অস্ত্র ছিলো এক সঙ্গে গর্জে ওঠে। বাঙালি সৈনিকেরা আগে থেকেই সতর্ক এবং অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত ছিলেন। অবিলম্বে অবস্থান নিয়ে তাঁরা প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশ নেন। প্রায় অর্ধ মাইল দূরে মেজর নুরুল ইসলাম এবং লে. মান্নান সিএন্ডবি রেস্ট হাউসে অবস্থান করছিলেন। সেই রেস্ট হাউসের দিকেও গুলিবর্ষণ করা হয়। তারা দুই জনে পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদের ধার ঘেঁষে পায়ে হেঁটে শহরে পৌঁছেন। ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস লাইনে তখন প্রচণ্ড গোলাগুলি। ২৮শে মার্চ দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত এ অবস্থা অব্যাহত থাকে। বাঙালি সৈন্যরা অদম্য সাহসিকতার সঙ্গে মোকাবিলা করে ছয় জন পাকিস্তানি সৈন্য গ্রেফতার করেন এবং বাকিরা নিহত হয়।[৩৪]

সুকেশচন্দ্র দেব মুক্তিযুদ্ধের একজন প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি 'একাত্তরে সিলেট : প্রতিরোধ ও সশস্ত্র যুদ্ধ' গ্রন্থে সিলেটে প্রতিরোধ যুদ্ধের স্মৃতিচারণ করেছেন। সেখানে ২৮শে মার্চ অবসরপ্রাপ্ত সুবেদার মোশারফ এবং স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যরা ইপিআর ছাউনিতে এবং পুলিশ লাইনে যান। বেঙ্গল রেজিমেন্টের ১২ জন, মুজাহিদ বাহিনীর ৮ জন এবং আখালিয়ার নায়েক সুবেদার আবদুল জলিলের নেতৃত্বাধীন ৩৫ ইস্ট বেঙ্গলের ৬০ জন সৈনিক নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ঐ দিন সন্ধ্যা ৬টার দিকে পাকিস্তানি আর্মি আখালিয়াস্থ ইপিআর ছাউনিতে আক্রমণ করে। মুক্তিবাহিনী প্রতিরোধ যুদ্ধে

অংশগ্রহণ করেন। দক্ষিণ সুরমায় সমবেত হওয়া ছাত্র-জনতা, রাজনৈতিককর্মী মুহুর্মুহু 'জয়বাংলা জয়বঙ্গবন্ধু' শ্লোগান দিতে থাকেন। এলাকার সমবেত লোকজন দেশিয় অস্ত্র নিয়ে প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশ নেন। অনেকে সাঁতরায়ে সুরমা পার হয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে সামিল হন। এ যুদ্ধে পাকিস্তানি আর্মি পরাজিত হয় এবং পালিয়ে সালুটিকর বিমানবন্দরের কাছে সেনা ক্যাম্পে অবস্থান নেয়। পরে শক্তি সঞ্চয় করে রাতে গাড়ির বাতি নিভিয়ে পাকিস্তানিরা আখালিয়ায় আবার আক্রমণ করে। মুক্তিযোদ্ধারা টিকতে না পেরে বাদাঘাটের দিকে সরে পড়ে। পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করে মুক্তিযোদ্ধারা সিলেট শহর আক্রমণ করেন।[৩৫]

আখতার আহমেদ 'বারবার ফিরে যাই' গ্রন্থে খালেদ মোশাররাফের নেতৃত্বে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধের স্মৃতিচারণ করেছেন। ২২শে মার্চ ১৯৭১ খালেদ মোশাররাফের কুমিল্লায় ৪র্থ ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের টুআইসি হিসেবে পোস্টিং হয়। তখন ৪র্থ ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার লে. কর্নেল খিজির হায়াত খান। খিজির হায়াত খান চাচ্ছিলেন না খালেদ মোশাররাফের মতো একজন চৌকস বাঙালি অফিসার ৪র্থ ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের টুআইসি হয়ে সৈন্যদের কাছাকাছি আসার সুযোগ পাক। তাই খিজির হায়াত খান তাঁকে ২২ তারিখেই আলফা কোম্পানি নিয়ে শমসেরনগর পাঠিয়ে দেন। উদ্দেশ্য নকশালদের অত্যাচার দমন করা। কিন্তু ২৫শে মার্চ শমসেরনগর পৌঁছে তিনি কোনো নকশাল পেলেন না। তিনি বুঝলেন ষড়যন্ত্র করে তাঁকে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। খালেদ মোশাররাফ তাঁর কনভয়ে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে বিদ্রোহ করে তেলিয়াপাড়ায় তাঁর ঘাঁটি স্থাপন করেন। নতুন সদস্য রিক্রুট করে পাকিস্তানিদের প্রতিরোধ ও প্রতিহত করার কাজ শুরু করেন। আখতার আহমেদ উল্লেখ করেছেন যে, ২৮শে মার্চ তাঁর ওপর আধাসামরিক, রিটায়ার্ড আর্মি ও স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে একটা নতুন কোম্পানি গঠন করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ২৯শে মার্চ তাঁদের নিয়মিত বাহিনীর কিছু অংশ ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের বিভিন্ন দিকে ডিফেন্সে যায়। বেলা বারোটা নাগাদ শহরের দক্ষিণ দিক থেকে গুলির আওয়াজ পাওয়া যায়। সাধারণ লোক নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ছুটাছুটি করে। এরই মধ্যে শহরের দিক থেকে খালেদ মোশাররাফ জিপ নিয়ে ছুটে আসেন। আর্মির ব্যারেটা ক্যাপ খুলে গাড়ি থেকে তিনি জানালেন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। হুকুম দিলেন কনভয় রেডি করে রওনা দিতে। গাড়িগুলো তৈরি হয়ে একের পর এক লাইন দিয়ে দাঁড়াতে থাকে। এর মধ্যে যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। গোলাগুলির শব্দ থেমে যায়। খবর আসে, ব্রিজের ওপারে আর্মির দুটো জিপ এসেছিলো। তাঁরা বাঙালি আর্মিদের অ্যামবুসে পড়ে যায়। পাকিস্তানি আর্মিরা পালাবার চেষ্টা করে। একটা জিপ কোনো রকমে পালিয়ে যায়। পাকিস্তানের কয়েকজন মারা যায়। কিন্তু বাঙালির কোনো ক্ষতি হয় না। আখতার আহমেদ লিখেছেন এটা তাঁদের যুদ্ধের প্রথম স্বাদ। যুদ্ধ ছোটো হলেও জয়টা বাঙালিদের দিকেই ছিলো।[৩৬]

শাফায়াত জামিল 'মুক্তির জন্যে যুদ্ধ' গ্রন্থে ২৯শে মার্চ কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে পাকিস্তানিদের আক্রমণ এবং বাঙালি সেনাদের প্রতিরোধের স্মৃতিচারণ করেছেন। এদিন বিকেলে ক্যান্টনমেন্টে ৪র্থ বেঙ্গলের

রিয়ার হেডকোয়ার্টারের ওপর পাকিস্তানি আর্মি আর্টিলারি গান ও থ্রি কমান্ডো ব্যাটালিয়নের সাহায্যে প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। বাঙালি যেসব জওয়ান রিয়ার হেডকোয়ার্টারের দায়িত্বে ছিলো তারা সংগঠিত হয়ে প্রবল বাঁধা দেয়। দুই পক্ষের মধ্যে প্রায় ছয় ঘণ্টা যুদ্ধ চলে। রাত নেমে এলে পাকিস্তানিদের আক্রমণ কিছুটা স্তিমিত হয়। তখন কয়েকজন জেসিও এবং এনসিওর নেতৃত্বে অধিকাংশ সৈন্য তাদের পরিবারসহ ক্যান্টনমেন্টের মরণ ফাঁদ থেকে বের হয়ে আসতে সক্ষম হয়। আট-দশ জন জওয়ান এ যুদ্ধে শহিদ হন। পাকিস্তানিদেরও অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়।[৩৭]

রফিকুল ইসলাম তাঁর 'লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে' গ্রন্থে ২৫/২৬শে মার্চ চট্টগ্রামে সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধের স্মৃতিচারণ করেছেন। পাকিস্তানি সৈন্যরা চট্টগ্রামের 'নেভাল বেইজ' থেকে বের হয়ে এসে হালিশহরে বাঙালি ইপিআর বাহিনীর অবস্থানের ওপর আক্রমণ চালায়। তাঁর সৈন্যরা পাকিস্তানি বাহিনীর সে আক্রমণ প্রতিহত করে এবং অনেক পাকিস্তানিকে হতাহত করে। পাকিস্তানিরা ভাবতে পারেনি সংগঠিত এতো বড়ো প্রতিরোধের সম্মুখীন তারা হবে। আক্রমণকারী পাকিস্তানি বাহিনীর অগ্রবর্তী দলটি হালিশহরে প্রতিরক্ষা ব্যূহের মধ্যে আসতেই বাঙালি সৈন্যরা পাকিস্তানিদের লক্ষ করে গুলি চালানো শুরু করে। ঘটনার আকস্মিকতায় পাকিস্তানিরা হতচকিত হয়ে পড়ে এবং দ্রুত তাদের বেইজে ফিরে যায়।[৩৮]

রফিকুল ইসলাম কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রাম অভিমুখী ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফির নেতৃত্বে পাকিস্তানি কনভয়কে প্রতিরোধের স্মৃতিচারণ করে। তিনি লিখেছেন,

"২৬শে মার্চ ভোর ৪টার দিকে টেলিফোনে 'মেসেজ' পেলাম যে ৮০ থেকে ১০০ গাড়ির একটা বড়ো 'কনভয়' কুমিল্লা ছেড়ে চট্টগ্রামের দিকে রওনা দিয়েছে। কুমিল্লা টেলিফোন এক্সচেঞ্জে কর্মরত জনাব শাকুর এই 'মেসেজটি' চট্টগ্রাম টেলিফোন এক্সচেঞ্জের অপারেটরকে পাঠিয়ে দেন এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গে আমাকে পুরো খবরটি জানিয়ে দেন। এ 'মেসেজটি' কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে কর্মরত বাঙালি মেজর বাহার আমাকে পাঠিয়েছিলেন। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গেই আমি হালিশহর থেকে একজন জেসিওর নেতৃত্বে এক কোম্পানি সৈন্য পাকিস্তানের এই দলটিকে অ্যামবুশ করার জন্য পাঠিয়ে দিলাম। হালকা এবং ভারী মেশিনগান ছাড়াও আমাদের এই কোম্পানির সঙ্গে ছিলো মর্টার ও রকেট লাঞ্চার।"[৩৯]

পাকিস্তানের যে কনভয়টি কুমিল্লা থেকে যাচ্ছিলো সেখানে ছিলো ২৪ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সেস রেজিমেন্ট, ফিল্ড ইঞ্জিনিয়ার্সের একটি ছোটো দল, ৮৮ মর্টার ব্যাট্রি এবং ৩ কমান্ডো ব্যাটলিয়ানের সৈন্য। এরা সবাই সকালে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট থেকে চট্টগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করে। কুমিল্লা থেকে ১০০ মাইল দূরে চট্টগ্রামের পথে এই কনভয়টিকে অনেক কালভার্ট এবং ব্রিজ অতিক্রম করতে হয়। পাকিস্তানি সৈন্যদের চলাচলে বাধা সৃষ্টির করার জন্য স্থানীয় জনগণ এসব কালভার্ট, ব্রিজের অধিকাংশ ক্ষতিগ্রস্ত করে দেয়। পাকিস্তানিরা বিকল্প রাস্তা করে এগুতে থাকে এবং 'ফিল্ড ইঞ্জিনিয়ার্সে'র সহায়তায় ব্রিজগুলো সাময়িকভাবে মেরামত করে নেয়। ওদিকে বাঙালি সৈনিকেরা পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী 'শুভপুর ব্রিজ' বেশ ক্ষতিগ্রস্ত করে রাখেন। সেজন্য শুভপুর ব্রিজে গিয়ে পাকিস্তানি কনভয়টি আটকে

যায়। শুভপুর ব্রিজ মেরামত করতে সময় লাগবে দেখে ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফি ইন্‌ফ্যান্ট্রি এবং কিছু মর্টার নিয়ে চট্টগ্রামের দিকে যাত্রা অব্যাহত রাখেন। বাকিদের বলে গেলেন ব্রিজটি মেরামত করে মূল কনভয়টির সঙ্গে যোগ দিতে। ২৬শে মার্চ সন্ধ্যায় ইকবাল শফি এবং তাঁর সৈন্যদল চট্টগ্রাম থেকে ১২ মাইল দূরে কুমিরায় পৌঁছে। কুমিরায় বাঙালি ইপিআর সৈন্যরা তখন অ্যামবুশের অপেক্ষায়। কুমিরায় পৌঁছে ব্রিগেডিয়ার শফি বেশ সন্তুষ্ট ছিলেন চট্টগ্রামের পাকিস্তানি সৈন্যদের সঙ্গে যোগ দিবেন বলে। কিন্তু হঠাৎ করে মারাত্মক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন। সুশিক্ষিত এবং আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত তাঁর সৈন্যদের অর্ধেকের বেশি বাঙালি সৈন্যদের অ্যামবুশের ফাঁদে পড়ে যায়। কুমিরা মহাসড়কের সে পাশে স্থানীয় জনগণ আগে থেকেই ব্যারিকেড স্থাপন করেছিলো। সন্ধ্যা ৭টায় পাকিস্তানি সৈন্যরা যখন ব্যারিকেড সরাবার জন্য থামে, বাঙালি সৈন্যরা পাকিস্তানিদের ওপর তখন একযোগে ব্যাপক গুলিবর্ষণ করে। ডান, বাম এবং সম্মুখ তিন দিক থেকেই ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুটে আসতে দেখে দিশেহারা হয়ে পড়ে ইকবাল শফি এবং তাঁর সৈন্যরা। রফিকুল ইসলাম লিখেছেন যে, কুমিরার সেই অ্যামবুশে পাকিস্তানিদের অনেক যানবাহন ধ্বংস হয় এবং ৭০ জনেরও অধিক হতাহত হয়। অ্যামবুশ সফল হওয়ার পর বাঙালি সৈন্যরা চট্টগ্রাম শহরের দিকে সরে এসে কুমিরা থেকে পাঁচ মাইল দূরে মহাসড়কের ওপরে ভাটিয়ারী এলাকায় অস্থায়ী অবস্থান গ্রহণ করে। কুমিরার অ্যামবুশ এবং পরবর্তী সংঘর্ষে বাঙালিদের ১৪ জন হতাহত হয়। কুমিরায় পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে সফল অপারেশনটি ছিলো মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এর প্রভাব ছিলো সুদূরপ্রসারী। পাকিস্তানি সৈন্যরা বিনা বাঁধায় অনায়াসে চট্টগ্রাম দখল করে নেওয়ার যে পরিকল্পনা করেছিলো বাঙালিদের সময়োচিত অ্যামবুশের কারণে তা নস্যাৎ হয়ে যায়।[৪০]

উপসংহার

অপারেশন সার্চ লাইটের সময় থেকে এপ্রিল পর্যন্ত বাংলাদেশের সর্বত্র অসংখ্য প্রতিরোধ যুদ্ধ সংঘঠিত হয়েছে, কিন্তু সংঘটিত যুদ্ধের অনুপাতে প্রকাশিত স্মৃতিকথার সংখ্যা কম। প্রাপ্ত স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় বাংলাদেশের সাধারণ জনতা ও মুক্তিযোদ্ধারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। প্রায় সকল স্মৃতিকথায় উঠে এসেছে যে, ভারী অস্ত্র না থাকলেও পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে এদেশের মানুষ ঘুরে দাঁড়িয়েছে। দেশের বিভিন্ন জায়গায় তারা শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। অনেক স্মৃতিকথায় সাধারণ জনতা, ইপিআর, আনসার, পুলিশ, মুজাহিদ ও বেঙ্গল রেজিমেন্টের আর্মিদের সম্মিলিত অংশগ্রহণের চিত্র রয়েছে।

অধিকাংশ স্মৃতিকথায় প্রাথমিক প্রতিরোধে বাঙালি জনতার সফলতার চিত্র পাওয়া যায়। তবে অনেকের স্মৃতিচারণে যুদ্ধে তাঁদের বীরত্ব প্রকাশের আধিক্য লক্ষ করা যায়। অনেক স্মৃতিকথায় পাকিস্তানি আর্মির পিছু হটার চিত্র রয়েছে। কোনো কোনো স্মৃতিকথায় পাকিস্তানি আর্মির পাল্টা আক্রমণে মুক্তিবাহিনীর প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেঙে পড়ার চিত্র রয়েছে।[৪১] সর্বোপরি প্রাথমিক প্রতিরোধে যেসব স্মৃতিকথা পাওয়া যায় তাতে বাঙালি জনতার অকৃত্রিম দেশপ্রেম ও দৃঢ় মনোবলের পরিচয় ফুটে উঠেছে।

তথ্যসূত্র

১. আবু আক্কাস আহমেদ, *মুক্তিযুদ্ধ: রণাঙ্গন নেত্রকোণা*, ঢাকা: সেন্টার ফর বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার স্টাডিজ, ২০১৭, পৃষ্ঠা-৩৪

২. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৫

৩. জিয়াউদ্দিন আহমেদ, *মুক্তিযুদ্ধে সুন্দরবন*, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৭, পৃষ্ঠা-৭০

৪. মুকুল মোস্তাফিজ, *মুক্তিযুদ্ধে রংপুর*, ঢাকা: গতিধারা, ২০১১, পৃষ্ঠা-৩৬

৫. আবুবকর সিদ্দিক, "একটি স্বস্তিকর মৃত্যুসংবাদ ও অবরুদ্ধ যুদ্ধদশা", *শৈলী*, ঈদ সংখ্যা ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-৩০১

৬. তদেব, পৃষ্ঠা-৩০৪

৭. মাহফুজুর রহমান, *মুক্তিযুদ্ধে হবিগঞ্জ*, ঢাকা, গতিধারা, ২০০৯, পৃষ্ঠা-১৯

৮. কাদের সিদ্দিকী, *স্বাধীনতা '৭১*, ঢাকা, অনন্যা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-৫২

৯. আবু সাঈদ খান, *মুক্তিযুদ্ধে ফরিদপুর*, ঢাকা, সাহিত্য বিকাশ, ২০১০, পৃষ্ঠা-৪৮

১০. মনজুর মোরশেদ সাচ্চু, *মুক্তিযুদ্ধ ও দেরাদুনে ষাট দিন*, ঢাকা, জাগৃতি প্রকাশনী, ২০১৭, পৃষ্ঠা-১৪

১১. তদেব, পৃষ্ঠা-১৯

১২. সাক্ষাৎকার : এ কে এম ওয়াহেদুল ইসলাম, অন্তর্গত *দিনাজপুরে মুক্তিযুদ্ধ*, মোহাম্মদ সেলিম সম্পা., ঢাকা, বাংলাদেশ চর্চা, ২০১১, পৃষ্ঠা-১৪০

১৩. আবু জাফর শামসুদ্দীন, *আত্মস্মৃতি*, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৫, পৃষ্ঠা-৫৩৭

১৪. সাক্ষাৎকার: ব্রিগেডিয়ার চিত্তরঞ্জন দত্ত, অন্তর্গত *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র-দশম খণ্ড*, হাসান হাফিজুর রহমান সম্পা., ঢাকা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা-৩৩৭

১৫. *বাংলাপিডিয়া* (২০০৩), "অপারেশন সার্চলাইট" ভুক্তি

১৬. আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি*, ঢাকা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯০, পৃষ্ঠা-১

১৭. তদেব, পৃষ্ঠা-২

১৮. তদেব, পৃষ্ঠা-৪

১৯. আবুল মাল আবদুল মুহিত, *স্মৃতি অম্লান ১৯৭১*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা-৩৬

২০. সাক্ষাৎকার: এম, এ, জলিল, বরিশালে রণাঙ্গন, অন্তর্গত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*: দশম খণ্ড,

হাসান হাফিজুর রহমান সম্পা., ঢাকা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা-৫৪৪

২১. গোলাম মোস্তফা গিয়াসপুরী, *মুক্তিযুদ্ধের কিশোর ইতিহাস: রাজবাড়ী জেলা*, ঢাকা: তাম্রলিপি প্রকাশনী, ২০১৭, পৃষ্ঠা-৬৬

২২. হাফিজ উদ্দিন আহমদ, *রক্তে ভেজা একাত্তর*, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-১৮

২৩. তদেব, পৃষ্ঠা-২৫

২৪. কাজী আনোয়ারুল ইসলাম, *আমার একাত্তর*, ঢাকা, অবসর প্রকাশনী, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-৪৯

২৫. মনসুর আহমদ খান, "মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্বে রাজশাহী, যুদ্ধপর্ব বিজয় এবং যাঁদের আত্মত্যাগে এদেশ", অন্তর্গত, *মুক্তিযুদ্ধে রাজশাহী*, মনসুর আহমদ খান সম্পা., ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-৬৬

২৬. গিয়াসউদ্দীন চৌধুরী, "সশস্ত্র প্রতিরোধ: রাজশাহী," অন্তর্গত যুদ্ধে *যুদ্ধে একাত্তরের নয়মাস*, আবুল হাসেম সম্পা., ঢাকা, নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ২০১৪, পৃষ্ঠা-১২৫

২৭. তদেব, পৃষ্ঠা-১২৫

২৮. তদেব, পৃষ্ঠা-১২৮

২৯. মো. জহুরুল ইসলাম বিশু, *পাবনা জেলার মুক্তিযুদ্ধের কথা*, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৯, পৃষ্ঠা-৫৫

৩০. কাজী আব্দুর রশিদ, *নওগাঁয় মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা, একাত্তর প্রকাশনী, ২০১৮, পৃষ্ঠা-৪৬

৩১. তদেব, পৃষ্ঠা-৫৩

৩২. সাক্ষাৎকার: এম আব্দুর রহিম, অন্তর্গত *দিনাজপুরে মুক্তিযুদ্ধ*, সম্পা. মোহাম্মদ সেলিম, ঢাকা, বাংলাদেশ চর্চা, ২০১১, পৃষ্ঠা-৩২

৩৩. নাসির উদ্দিন, যুদ্ধে যুদ্ধে স্বাধীনতা, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯২, পৃষ্ঠা-১৬০

৩৪. কে. এম. সফিউল্লাহ্, *মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ*, ঢাকা, আগামী প্রকাশ, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-৫৫

৩৫. সুকেশচন্দ্র দেব, *একাত্তরে সিলেট: প্রতিরোধ ও সশস্ত্র যুদ্ধ*, সিলেট, বাসিয়া প্রকাশনী, ২০১৮, পৃষ্ঠা-২৪

৩৬. আখতার আহমেদ, *বার বার ফিরে যাই*, ঢাকা, সেন্টার ফর বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার স্টাডিজ, ২০১৭, পৃষ্ঠা-৫৫

৩৭. শাফায়াত জামিল, *মুক্তির জন্য যুদ্ধ*, ঢাকা, দিব্য প্রকাশ, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-২৬

৩৮. রফিকুল ইসলাম, *লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে*, পরিমার্জিত দশম মুদ্রণ, ঢাকা, অনন্যা প্রকাশনী, ২০১৬, পৃষ্ঠা-১৪৭

৩৯. তদেব, পৃষ্ঠা-১৪৮

৪০. তদেব, পৃষ্ঠা-১৫০

৪১. গিয়াসউদ্দিন চৌধুরী বগুড়ায় ২৯/৩০শে মার্চ রাতে রংপুরের আর্মিদের পেট্রোলিংয়ের সময় একটি অ্যামবুশ পার্টি পাঠান। সেখানে তিনটি তিনটনি গাড়িসহ কমপক্ষে এক প্লাটুন সৈন্য পেট্রোলিংয়ে বের হয়। রাস্তার মধ্যে অ্যামবুশ পার্টি তাদেরকে অ্যামবুশ করে। গাড়ি তিনটি বিধ্বস্ত হয়, তিনটি অয়ারলেস সেট দখল করা হয় এবং ২৩ জন নিহত হয়। বাকি সৈন্য ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে রংপুরের দিকে পশ্চাদপসরণ করে। গিয়াসউদ্দীন চৌধুরী, "সশস্ত্র প্রতিরোধ : রাজশাহী", অন্তর্গত যুদ্ধে যুদ্ধে একাত্তরের নয়মাস, আবুল হাসেম সম্পা., ঢাকা, নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ২০১৪, পৃষ্ঠা-১২৫

৪২. কাজী আব্দুর রশিদের নেতৃত্বে রাজশাহীর মুলাটুলি ও ঝলমলিয়া যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা জয়লাভ করে, কিন্তু বিকাল ৫টার পর তাঁদের তিন ইঞ্চি মর্টারের বোমা শেষ হয়ে যায়। তাঁদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেঙে পড়ে। ঐ মুহূর্তে তাঁরা আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেননি। কাজী আব্দুর রশিদ, নওগাঁয় মুক্তিযুদ্ধ, ঢাকা, একাত্তর প্রকাশনী, ২০১৮, পৃষ্ঠা-৪৬

BL College Journal

ISSN 2664-228X
Volume -1, Issue-2, 2019
pp. 62-79

বাংলা ও অসমিয়া উপন্যাসে গ্রামজীবনের প্রতিফলন : একটি তুলনামূলক অধ্যয়ন

সঞ্জয় ভট্টাচার্য
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, আসাম, ভারত
ই-মেইল : brjsanjay24x7@gmail.com

সারসংক্ষেপ

উপন্যাস সাধারণত মানবজীবনের আধারে রচিত হয়ে থাকে। যাপিত জীবনের নানা আলেখ্য চিত্রিত হয় উপন্যাসের পাতায়। মানুষ সামাজিক জীব। মানবসমাজের যে বিন্যাস আমরা প্রত্যক্ষ করে থাকি তা মূলত গ্রামভিত্তিক অথবা শহরকেন্দ্রিক। স্বাভাবিকভাবেই উপন্যাসেও এই জনজীবনই উপস্থাপন করা হয়। বাংলা ও অসমিয়া কথাসাহিত্যে এমন বহু উপন্যাস রয়েছে যেখানে গ্রামীণ জীবনের কথা বলা হয়েছে। এরকমই দুটি উপন্যাস বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইছামতী' ও সৈয়দ আব্দুল মালিকের 'সূরুযমুখীর স্বপ্ন'। দুটি উপন্যাসেরই কেন্দ্রে রয়েছে দুই গ্রাম। 'ইছামতী'তে পাঁচপোতা গ্রাম এবং 'সূরুযমুখীর স্বপ্ন'তে ডালিম গ্রাম। আমাদের প্রস্তাবিত গবেষণাপত্রে আমরা এই দুই গ্রামের জনজীবনের একটি তুলনামূলক আলোচনা করে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটে গ্রামীণ জনপদের স্বরূপ বুঝে নিতে প্রয়াস করবো।

বীজ শব্দ

গ্রামজীবন, কথাসাহিত্য, ইছামতী, সূরুযমুখীর স্বপ্ন, তুলনামূলক আলোচনা, ভারতীয় প্রেক্ষাপট

ভূমিকা

সাধারণত উপন্যাসের আধেয় হয় মানুষ এবং তার বসবাস করা সমাজ। আর এই সমাজ সাধারণত গ্রামকেন্দ্রিক অথবা শহরভিত্তিক। বিশ্বের সমস্ত ভাষাতেই গ্রাম অথবা শহরকে কেন্দ্র করে উপন্যাস রচিত হয়েছে। ভারতীয় ভাষাগুলোতে রচিত উপন্যাসও তার ব্যতিক্রম নয়। বাংলা উপন্যাসে নিশ্চিন্দিপুর বা কেতুপুর কিংবা বাঁশবাদী গ্রাম তাঁদের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে অমর হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি অসমিয়া উপন্যাসেও আমরা পাই ডালিম, মহঘুলি প্রভৃতি গ্রামের প্রসঙ্গ। আমাদের বর্তমান আলোচনায় আমরা বিভূতিভূষণের 'ইছামতী' ও সৈয়দ আব্দুল মালিকের 'সূরুযমুখীর স্বপ্ন' উপন্যাসে প্রতিফলিত গ্রামজীবনের একটা তুলনামূলক আলোচনার চেষ্টা করব।

উদ্দেশ্য

তুলনামূলক সাহিত্য আধুনিক সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকরণ। একাধিক ভাষা বা সাহিত্য বা দেশ বা জনগোষ্ঠী কিংবা সাহিত্য-সমাজের পারস্পরিক তুলনা করে আলোচকেরা যে আলোচনা করেন, তাকে মোটামুটিভাবে এই শ্রেণিতে ফেলা যেতে পারে। এখানে বাংলা ও অসমিয়া সাহিত্যে রচিত দুটি উপন্যাসের তুলনামূলক আলোচনায় পাশাপাশি দুই অঞ্চলের দুটি ভাষায় লেখা দুরকম জনগোষ্ঠীর মধ্যে মিল ও পার্থক্য দেখিয়ে সাহিত্য যে আসলে দেশকাল নিরপেক্ষভাবে মানুষের কথা বলে থাকে, এটি দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য।

সাহিত্যিক প্রকাশনা

বাংলা ভাষায় এরকম কোনো লেখা এই প্রথম। অসমিয়া ভাষায় 'বিভূতিভূষণ ও মালিক' বলে একটি গ্রন্থ রয়েছে। কিন্তু সেখানে এই দুজন লেখকের সার্বিক লেখালেখি নিয়ে আলোচনাই মূল। গ্রাম জীবন নিয়ে আলাদা করে আলোচনা করা কোনো গ্রন্থ বা অন্য কোনো লেখা নেই।

পদ্ধতি

এই আলোচনায় মূলত বর্ণনাত্মক ও তুলনামূলক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে।

বিষয়বস্তু

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন 'ইছামতী' (১৯৫০) উপন্যাস লেখার পরিকল্পনা করেন, তখন থেকেই তাঁর মনে একটি স্পষ্ট ধারণা ছিল এই উপন্যাসের স্থান-কাল-পাত্র-সম্পর্কে। এই বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে তার দিনলিপিগুলোতে বিভূতিভূষণ সেই পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করেছেন বহুবার।

তাঁর দিনলিপি 'স্মৃতির রেখা'য় তিনি লিখেছেন,

> "... কলবলিয়াতে স্নান করতে এলাম। ঠাণ্ডা জলে নাইতে নাইতে ভাবছিলাম- ওই আমাদের গ্রামের ইছামতী নদী।... গাঁয়ে গাঁয়ে গ্রামের ঘাট, আকন্দফুল । ... স্নিগ্ধ পাটা শ্যাওলার গন্ধ বার হয়, জেলেরা জাল ফেলে। ধারে ধারে কত গৃহস্থের বাড়ি। কত হাসি কান্নার মেলা। আজ পাঁচশত বছর ধরে কত গৃহস্থ এল, হাসিমুখ শিশু প্রথম মায়ের সঙ্গে নাইতে এল-কত বৎসর পরে বৃদ্ধাবস্থায় তার শ্মশানশয্যা হলো ওই ঠাণ্ডা জলের কিনারাতেই। ওই বাঁশবনের ঘাটের নীচেই। কত কত মা, কত ছেলে, কত তরুণ-তরুণী সময়ের পাষাণবর্ত্মে বেয়ে এসেছে গিয়েছে মহাকালের বীথিপথ বেয়ে। ঐ শান্ত নদীর ধারে ঐ আকুন্দ ফুল, ওই পাটা শেওলা, বনঝোপ ছাতিম বন।
>
> এদের গল্প লিখবো, নাম হবে ইছামতী।"[১]

'উৎকর্ণ' তে লিখেছেন,

> "এই পল্লীগ্রামের যে জীবনযাত্রা, শতাব্দীর পর শতাব্দী এইরকম, এই বাঁশ শিমুল বনে অপরাজেয় শোভা এমনি ধারা দেখা যায় - ঝিঙে ক্ষেতে এমনি ফুল ফোটে- কত বনসিমতলার ঘাট, কত গ্রাম্য মেয়ে, কত হাসি

> কান্না প্রেম-বিরহ-এইরকম চলবে। এদের নিয়ে একটা উপন্যাস লিখব আজ মাথায় এসেছে....মহাকাল যেন উপন্যাসের পটভূমি– নায়ক-নায়িকা গ্রাম্য নর-নারী । Da-Vinci-র শেষ জীবনের মতো গভীর তার আকুতি।"[২]

'হে অরণ্য কথা কও'-তে লিখেছেন, "ইচ্ছে আছে এবার একটা বইয়ে হাত দেবো, নাম দেবো তার ইছামতী। বড় উপন্যাস। তাতে থাকবে ইছামতীর ধারের গ্রামগুলির অপূর্ব জীবন প্রবাহের ইতিহাস-বন নিকুঞ্জের মরা-বাঁচার ইতিহাস। কত সূর্যোদয়। কত সূর্যাস্তের নিষ্কিঞ্চন শান্ত ইতিহাস।"[৩]

অতএব একথা বেশ জোর দিয়ে বলা যায় যে, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উপন্যাসে সমাজের যে দিকটার কথা তুলে ধরা হয়েছে তা ইছামতী নদী সন্নিহিত অঞ্চলের সমাজ এবং তাঁর উল্লিখিত বক্তব্যগুলি ধরে যদি এগিয়ে যাওয়া যায়, তবে আরও পরিষ্কারভাবে যে কথাটি পরিস্ফুট হয় তা হলো, সেই নদী তীরবর্তী গ্রাম সমাজের কথা বলাই তাঁর উদ্দেশ্য। লক্ষ্য স্থির করে ইছামতী তীরের যে গ্রামটিকে তিনি উপন্যাসের স্থান হিসাবে নির্বাচন করলেন, তার নাম পাঁচপোতা। স্মরণযোগ্য যে, ইছামতী উপন্যাসে যে সময়ের কথা আছে সেই সময় বেশ দীর্ঘ, প্রায় ৬০-৭০ বছর। সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তী বা সমসাময়িক নীলকরদের প্রসঙ্গ রয়েছে উপন্যাসের প্রথম দিকে। শেষের দিকে চাকদা থেকে চুয়াডাঙ্গা পর্যন্ত রেল লাইনের কথা আছে। অর্থাৎ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে কুড়ি শতকের প্রথমার্ধে অনেকটা সময় ধরে শতকের ঘন্টা সময় ধরে চলেছে এই উপন্যাসের কাহিনীর ধারা। বাংলা তথা ভারত সেই সময় ইংরেজ শাসনাধীন। ফলে ঔপনিবেশিক বাংলার, বিশেষত গ্রামবাংলার জীবনাচরণের একটা স্পষ্ট রূপরেখা অঙ্কিত হয়েছে এই উপন্যাসে। যদিও যশোর ২৪ পরগণা জেলার এক প্রান্তীয় অঞ্চলের জনজীবন উপন্যাসের আলোচ্য, তবুও সেই অর্থে একে আঞ্চলিক উপন্যাস বলা যায় না। কিন্তু একথাও কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না যে,

> "একটি বিশেষ অঞ্চলের মানবজীবনের সুখ-দুঃখের নানা বৈচিত্র্য প্রকৃতির পটভূমিতে চমৎকার শিল্পরূপ লাভ করেছে। সমসাময়িক ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ, সমাজ জীবনের চিত্র, প্রকৃতি-বৈচিত্র্য প্রভৃতি পারিপার্শ্বিকের মধ্যে এখানে যে কয়েকটি ব্যক্তি চরিত্রের বিকাশ ঘটেছে, তাদের মধ্যে ঐ অঞ্চল-জীবনের নানা বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়ে তাদের চরিত্রকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে।"[৪]

যে সমাজের কথা 'ইছামতী' উপন্যাসে আছে সেটি মূলত গ্রামীণ ব্রাহ্মণ্যশাসিত সমাজ। সেই সমাজের অর্থনৈতিক ক্ষমতা অনেকটাই ইংরেজ নীলকর সাহেবদের দখলে। নীলকরদের অত্যাচার কিংবা তাদের অধীনস্ত কর্মচারীদের জুলুমবাজি, হত্যা, ঘরে আগুন লাগানো, কৃষিজমি জবরদখল ছিল তখনকার স্বাভাবিক ঘটনা। দীনবন্ধু মিত্র লিখিত 'নীলদর্পণ' নাটকেও এমন কথা আছে। নীলকুঠির বাইরের যে সাধারণ জনসমাজ, সেটাও অশিক্ষা, দারিদ্র্য, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, কৌলিন্য প্রথা, জাতিভেদ ও বর্ণবৈষম্যের যাঁতাকলে পিষ্ট। সমাজ শিরোমণি ব্রাহ্মণেরাও বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে দলাদলিতে ব্যস্ত। সামাজিক নিম্নশ্রেণির লোকেরা বেশিরভাগ দারিদ্র্য কবলিত এবং উচ্চবর্ণের দ্বারা অবহেলিত। তাদের স্থান সমাজে থাকলেও নির্দিষ্ট গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ। ইছামতীর তীরে মানবজীবনের

সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না বয়ে চলেছে নদীর জলধারার মতো। উপন্যাসে দেখি নীলকর সাহেবদের অত্যাচার সহ্য করতে করতে একসময় প্রজারা বিদ্রোহ করে, কৃত্রিম নীল আবিষ্কারের ফলে নীলকুঠির দিন ক্রমাগত শেষ হয়ে আসে। এদিকে সাধারণ ব্রাহ্মণ্য শাসিত গ্রামসমাজেও কৌলিন্য প্রথা, গ্রাম্য সংস্কার, সংকীর্ণ সমাজজীবনের অন্ধকারে চকিতে উদ্ভাসিত হয় মানবতার ক্ষীণ আলোক। তথাকথিত নিম্নশ্রেণির নর-নারীর মধ্যে যেমন এখানে দেখি অকৃত্রিম মমতার পরশ, তেমনি দুর্ধর্ষ ডাকাতের মধ্যেও দেখা যায় সরল মানুষকে।[৫]

শুধু তাই নয় কোনো নিম্নবর্গের ব্যক্তি ব্যবসা করে ক্রমশ ধনী হয়ে গোটা সমাজের ঈর্ষার কারণ ও সম্মানের পদে আসীন হয়ে যায়। উপন্যাসে সমকালীন জীবনযাত্রার এই ঘটনাগুলি সযত্নে চিত্রিত হয়েছে।

ইছামতী উপন্যাসের সমাজজীবন মূলত মোল্লাহাটের নীলকুঠিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। নীলকুঠি শাসিত সমাজের উপর বড়সাহেব শিপটন ও ছোট সাহেব ডেভিড এবং তাদের দেওয়ান রাজারাম রায়ের অত্যাচারের দৃশ্য উপস্থাপন করেছেন বিভূতিভূষণ। রামকানাই কবিরাজের মতো নিরীহ লোককে তারা যেভাবে হেনস্থা করেছে তা পাঠকের কাছে তৎকালীন সমাজের এক জ্বলন্ত বাস্তবকে তুলে ধরেছেন। সেটি ঔপনিবেশিক প্রভুদের এই অত্যাচারের চিত্র। তাদের অত্যাচারের বাহন ছিল তাদেরই তৈরি ভারতীয় বৃত্ত। তাই প্রসন্ন আমিন বা রাজারাম রায় বা নফর মুচির কিছুমাত্র অনুতাপ হয় না, বৃদ্ধ, অসহায়, শীর্ণ রামকানাই এর উপর অত্যাচারের। রামকানাই ও নফর মুচির কথোপকথন এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করা যায়-

রামকানাই- "আমারে মেরো না বাবা। আমার বাত শ্লেষ্মার অসুখ আছে। আমি তাহলে মরি যাব।"

নফর- "মরে যাও বাঁওড়ের জলে ভাসিয়ে দেবানি। তার জন্যে ভাবতি হবে না। অমন কত এ হাতে ভাসিয়ে দিইচি।"[৬]

অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিধ্বস্ত ও প্রধানত নীলকুঠি নির্ভর গ্রামীণ সমাজে কর্মসংস্কৃতির ছিলনা কোনো বালাই। তাই সকাল-সন্ধ্যা গৃহস্থের আঙিনায় চণ্ডীমণ্ডপে বসতো দাবা ও পাশা খেলার আসর। সেযুগে চণ্ডীমণ্ডপ ছাড়া পল্লীবাংলার সমাজজীবন কল্পনা করাও যায় না, তারাশংকরও তাঁর উপন্যাসে চণ্ডীমণ্ডপের কথা উল্লেখ করেছেন। এই চণ্ডীমণ্ডপের সঙ্গে দেবী চণ্ডীর যোগ থাকলেও আসলে এটা হচ্ছে অলস ও কর্মহীন লোকের আড্ডার জায়গা। বিভূতিভূষণ 'ইছামতী' উপন্যাসে চণ্ডীমণ্ডপের যে বর্ণনা দিয়েছেন তার মধ্য দিয়ে সমাজজীবনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক পরিষ্কাররূপে দৃশ্যমান হয় এবং সেই অঞ্চলের জীবনচর্যার প্রাণস্পন্দনটি অনুভব করা যায়। ঔপন্যাসিক এর বর্ণনাও সুন্দর দিয়েছেন–

> "চণ্ডীমণ্ডপ হচ্ছে পল্লী গ্রামের একটি প্রতিষ্ঠান। এখানে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিষ্কর্মা, ব্রহ্মোত্তর বৃত্তিভোগী, মূর্খ ব্রাহ্মণের দল জুটে কেবল তামাক পোড়ায় আর দাবা পাশা (তাসের প্রচলন এসব পাড়াগাঁয়ে আদৌ নেই,

ওটা বিলিতি খেলা বলে গণ্য) চালে। তবে সম্পন্ন গৃহস্থের চণ্ডীমণ্ডপে আড্ডা জোর বসে থাকে, কারণ সারা দিনে অন্তত আধসের তামাক জোগাবার ক্ষমতা সব গৃহস্থের নেই । গ্রামের মধ্যে চন্দ্র চাটুজ্জে, ফণি চক্কোত্তি ও মহাদেব মুখুজ্যের চণ্ডীমণ্ডপই প্রথম শ্রেণির প্রতিষ্ঠান। রাজারাম রায় যদিও সম্পন্ন গৃহস্থ, তিনি নীলকুঠির কাজে অধিকাংশ সময়ই বাড়ির বাইরে থাকেন। তাঁর চণ্ডীমণ্ডপে আড্ডা বসে না।

এরা সারাদিন এখানে বসে শুধু গল্প করে ও পাশা দাবা খেলে। জীবন-সংগ্রামে এদের অজ্ঞতা, ব্রহ্মোত্তর জমিতে বছরের ধান হয়, প্রজাদের কাছ থেকে কিছু খাজনা মেলে, আম কাঁঠালের বাগান আছে, লাউ কুমড়ার মাচা আছে, আজ মাছ ধারে কিনে গ্রামের জেলেদের কাছে দুমাস পরে দাম দেওয়াই বিধি। সুতরাং ভাবনা কিসের? গ্রাম্য কলু ধারে তেল দিয়ে যায় "বাখারির গায়ে দাগ কেটে। সেই বাখারির দাগ গুনে মাসকাবারি দাম শোধ হয়। এত সহজ ও সুলভ যেখানে জীবনযাত্রা সেখানে অবকাশযাপনের এইসব অলস ধারাই লোকে বেছে নিয়েছে। আলস্য ও নৈষ্কর্ম থেকে আসে ব্যর্থতা ও পাপ। পল্লীবাংলার জীবন ধারার মধ্যে শ্যাওলার দাম আর ঝাঁজি জমে ওঠে জলের স্বচ্ছতা নেই, স্রোতে কলকল্লোল নেই, নেই তার নিজের কক্ষপথে অসীম আকাশের উদার প্রতিচ্ছবি।"[৭]

বুঝতে অসুবিধা হয় না, উনিশ শতকের উত্তরার্ধের প্রথমদিকে অর্থনৈতিক পরনির্ভরতা গ্রাম্য জীবনের শীর্ষস্তরে এমন এক কর্মহীনতা এনেছিল যার ফলে সমাজ নিমজ্জিত হয়েছিল অধিকতর অন্ধকারে। ব্যতিক্রম অবশ্য ছিল এর। নালু পাল ও সতীশ কলুর মতো তথাকথিত নিম্নবর্ণের দুটি লোক শুধুমাত্র কঠিন শ্রম ও বুদ্ধিমাত্র সম্বল করে চরম দারিদ্র্য থেকে ক্রমে সমাজের একজন ধনী ব্যক্তিতে পরিণত হয়, তা দেখিয়েছেন লেখক। উপন্যাসের প্রথমেই মামার বাড়িতে আশ্রিত ও মামির গঞ্জনায় ব্যথিত নালু পালকে দেখি মোল্লাহাটির হাটে যাচ্ছে পান সুপারির মোট মাথায় করে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই নালু পালই হয়ে ওঠে লালমোহন পাল। গ্রামের তীর্থযাত্রীদের উদ্দেশে সে তীর্থ যাত্রার পূর্বে এবং তীর্থভ্রমণের শেষে পর্যাপ্ত ফলাহারের আয়োজন করে। এই আয়োজন উপলক্ষে সেই সময়কার গ্রাম্য সমাজের একটি চিত্র ফুটে উঠেছে উপন্যাসে। ব্রাহ্মণ্যবাদের দাপটের চিত্রও জীবন্ত হয়ে উঠেছে এখানে–

"নালু গড় হয়ে সবাইকে একসঙ্গে প্রণাম করে জোড় হাতে বললে- আমার একটা আবদার আছে আপনাদের রাখতি হবে। আপনারা নাকি তীথ্থি যাচ্ছেন শোনলাম। একদিন আমি ব্রাহ্মণ তীথ্থযাত্রী ভোজন করাবো। আমার বড় সাধ। এখন আপনারা অনুমতি দিন, আমি জিনিস পাঠিয়ে দেবো চক্কোত্তি মহাশয় এর বাড়ি। কি কি পাঠাবো হুকুম করেন।

... চন্দ্র চাটুজ্জে বললেন- কি ফলার করাবে?

নালু হাতজোড় করে বল্লে- আজ্ঞে, যা হুকুম।

–আধ মন সরুচিড়ে, দই, খাঁড়গুড়, ফেনি বাতাসা, কলা, আখ, মঠ আর –ফণি চক্কোত্তি বললেন- মুড়কি ।

–মুড়কি কত?

–১০ সের

–মঠ কত?

–আড়াই সের দিও কেষ্ট ময়রা ভালো মঠ তৈরি করে, ওকে আমাদের নাম করে বলো। শক্ত দেখে কড়া পাকের মঠ করে দিলে ফলারের সঙ্গে ভালো লাগবে ।

চন্দ্র চাটুজ্জে বললেন- দক্ষিণে কত দেবে ঠিক কর।

.....

ফণি চক্কোত্তি বললেন –এক সিকি করে দিও আর কি!

নালু বললে– 'বড্ড বেশি হয়েছে কর্তা। মরে যাবো। বিশজন ব্রাহ্মণকে বিশ সিকি দিতি হলি'..."[৮] ।

যশোর অঞ্চলের ভাষায় এই কথোপকথন এখানে নিয়ে এসেছে আঞ্চলিকতার পরশ। অবশ্য আঞ্চলিকতার এই প্রভাব সামাজিক জীবনধারার উপরেও দেখা যায়। এখানকার স্থানীয় লোকদের জীবনযাত্রা প্রণালীতে প্রভাবিত হয় বিলাতি সাহেবেরাও। যেসব সাহেব নীল চাষ করতে বাংলাদেশের গ্রামে এসে অনেকদিন ধরে বসবাস করেছে, তাদের জীবনযাত্রায় পড়েছে এই অঞ্চলের গভীর ছাপ। বিভূতিভূষণ খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন একথা –

> "সাহেবেরা ছোট-হাজারী খেলে বড় অদ্ভুত ধরনের। এক এক কাঁসি পান্তাভাত এক ডজন লেবুর রস মেখে। রাতের টেবিলের ঠান্ডা হ্যাম। একটা করে আস্ত শসা জন পিছু। চার-পাঁচটা করে খয়রা মাছ সরষের তেলে ভাজা। বহুদিন বাংলাদেশের গ্রামে থাকবার ফলে ওদের সকলেরই আহার বিহার এদেশের গ্রাম্য লোকের মত হয়ে গিয়েছে। ওরা আম কাঁঠালের রস দিয়ে ভাত খায়। অনেকে হুঁকোয় তামাক খায়। নিম্নশ্রেণির মেয়েদের সঙ্গে মেশে, অনেককে ঘরেও রাখে।"[৯]

তবে বিদেশি সাহেবেরা সম্পূর্ণভাবে রূপান্তরিত হয়ে যায় নি। যখন বিদেশ থেকে অতিথি আসে বা আসে কোনো স্বজাতীয় উচ্চপদস্থ অফিসার, তখন ভেড়ার মাংস, মাছ, আম কিংবা ঘি সংগ্রহ করা হয়। শুধু তাই নয়, মদের আসরেরও আয়োজন হয়। ভেড়ার মাংসের সঙ্গে বাচ্চা শুয়োরের মাংস তাদের খুব পছন্দ।

'ইছামতী'তে বেশ কয়েকটি উৎসবের কথা আছে। উৎসবের মধ্যে কয়েকটি যেমন– অন্নপ্রাশন, জন্মদিন, তীর্থযাত্রীদের জন্য ভোজের আয়োজন, দুর্গাপূজা, 'তেরের পালুনি' প্রভৃতি।

'তেরের পালুনি' হয় ভাদ্র মাসের তের তারিখ। সমগ্র পাঁচপোতা গ্রামের স্ত্রীলোকেরা এই উৎসবে একত্র হয় ইছামতী তীরবর্তী একটি প্রাচীন জিউলি গাছ ও কদম গাছের তলায়। উৎসবে গ্রামের মেয়েরা পাড়া হিসেবে বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে নানা জায়গায় বনভোজনের আয়োজন করে। কিন্তু নিয়ম হয়েছে এখানে রান্না হবে না, খাবার জিনিস নিয়ে আসবে সবাই বাড়ি থেকে। যার যেমন সাধ্য। মেয়েরা এখানে কলার পাতা পেতে তাতে খায়। ছড়াকাটে, গান গায়, উলু দেয়–

> "এই বনভোজনের একটি চিরাচরিত প্রথা এই, তুমি সম্পন্ন গৃহস্থ ঘরের বৌ, তুমি ভালো জিনিস এনেচ খাবার জন্যে– যারা দারিদ্র্যের জন্য তেমন কিছু আনতে পারেনি, তাদের তুমি ভাগ করে দেবে নিজের আনা ভালো খাবার। এ কেউ বলে দেয় না, কেউ বাধ্যও করে না -এ একটি অলিখিত গ্রাম্য প্রথা বরাবর চলে আসচে এবং সবাই মেনেও এসেচে।"[১০]

এই যে আদান- প্রদানের সামাজিক পরম্পরা, এতে ধনী-দরিদ্রের সামাজিক ব্যবধান বেশ কিছুটা হ্রাস পায়। যেমন, ধনী নালু পালের স্ত্রী তুলসী খাবার ভাগ করে নেয় দরিদ্র যতীনের স্ত্রী ও বোনের সঙ্গে। ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণদের মধ্যের সামাজিক ব্যবধানটাও অনেক শিথিল হয় এখানে। তিলু- বিলু খাবার ভাগ করে খায় গ্রামের সব থেকে দরিদ্র স্ত্রী নীলমণি সমাদ্দারের পুত্রবধূর সঙ্গে।

'তেরের পালুনি'তে যে খাদ্যবস্তুর সাক্ষাৎ পাই আমরা, তা কিন্তু একেবারেই পল্লীবাংলার নিজস্ব খাদ্য তালিকা। চিড়ে, মুড়কি, বাতাসা, কলা, চিনির মঠ, চালভাজা, দইয়ের ঘোল। লোকখাদ্যের এই উৎসবের শেষ দিকে থাকে ছড়া গানের সমাহার। পঞ্চাশোর্ধ বিধুদিদি শোনান ছড়া ও নিধুবাবুর গান। শ্যামাসংগীত গান করে গ্রামের বধু নিস্তারিণী। সবমিলিয়ে গ্রামের নারী সমাজের একটি জীবন্ত সামাজিক দৃশ্য এর মাধ্যমে প্রত্যক্ষ হয়ে ফোটে।

অন্যান্য উৎসবের মধ্যে দুর্গাপূজার কথা উপন্যাসে রয়েছে দুই জায়গায়। একটি শিপটন সাহেবের করা নীলকুঠির দুর্গাপুজা এবং অন্যটি নালু পালের করা দুর্গাপূজা। পূজা উপলক্ষে গ্রামে বেশ হৈচৈ লক্ষ করা যায়। শিপটনের পূজায় নীলকুঠিতে বিশাল দুর্গা মূর্তি তৈরি হলো, মনসাপোতা গ্রামের বিশ্বম্ভর ঢুলি এসে টানা তিন দিন ঢোল বাজাল। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হলো যাত্রাগান। গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা শুনতে আশেপাশের সতেরটি গ্রামের লোক জড়ো হয়েছিল।[১১]

তবে এই পুজোর যাত্রা দেখতে মেয়েদের যেতে দেয়নি ব্রাহ্মণ সমাজপতিরা। অবশ্য তিলু -বিলু বা নালু পালের স্ত্রী তুলসী গিয়েছিল যাত্রা দেখতে।

নালু পালের দুর্গাপূজায় গ্রামীণ দলাদলির এক জীবন্ত চিত্র দেখি। নালু গ্রামের প্রধান প্রধান লোকের কথা অমান্য করে দুর্গাপূজার ব্যবস্থা করল। গ্রামের সমাজপতিরা স্বাজাত্যাভিমানের অহংকারে এই পূজা বয়কট করল, একমাত্র ভবানী বাবু ছাড়া। ভবানীর পরামর্শে নালু পাশের গ্রামের ব্রাহ্মণদের সঙ্গে যোগাযোগ করল। এই প্রসঙ্গে আমরা ব্রাহ্মণ ভোজনের দালালের দেখা পাই। একজন রামহরি চক্রবর্তী অন্যজন সাতকড়ি ঘোষাল। এই দালালরা নালু পালের সঙ্গে নিজেরা ৫ টাকা করে চুক্তি করে ব্রাহ্মণ জোগাড়ের দায়িত্ব নেয় ।

> "নালু পালের দিকে ফিরে রামহরি ডান হাতের আঙুলগুলো সব ফাঁক করে তুলে দেখিয়ে বললেন-পাঁচ টাকা করে লাগবে আমাদের দুজনের।
>
> -দোব।

- ব্রাহ্মণ ভোজন-দক্ষিণে দিতি হবে এক টাকা ।
-ওইটে কমিয়ে আট আনা করতি হবে ।
-আরেক মালসা ছাঁদা দিতি হবে– লুচি, চিনি, নারকেল নাড়ু। খাওয়ার আগে ।
-তাও দেবো, কিন্তু দক্ষিণেটা আট আনা করুন।
- আমাদের পাঁচ টাকা করে দিতে হবে খাওয়ার আগে কিন্তু। এর কম হবে না।"[১২]

কালীপূজার আগের দিন চৌদ্দ শাক তোলার নিয়ম। গ্রামের ছেলে-মেয়েরা ইছামতীর তীরে এসেছে শাক তুলতে। খোকা অর্থাৎ টুলুও এসেছে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। কিন্তু সে চৌদ্দ শাক চেনেনা। তাদের কথার মাধ্যমে লেখক ধরিয়ে দেন চৌদ্দটি শাকের নাম–" এই দ্যাখ কত শাক, গাঁদামণি, বউ টুনটুনি, গাদানটে, গোয়ালনটে, ক্ষুদে ননী, শান্তি শাক, মটরের শাক, কাঁচড়াদাম, কলমী, পুনর্নবা- এখন তুলব রাঙা আলুর শাক, ছোলার শাক আর পালং শাক– এই চৌদ্দ।"[১৩]

এখানে কয়েকটি মাত্রচিত্রের উল্লেখ করা গেল, কিন্তু এর মাধ্যমেই আমরা বুঝে নিতে পারি যে এই উপন্যাসে এমন সামাজিক চিত্রের অজস্র ছড়াছড়ি। গয়ামেম, প্রসন্ন চক্রবর্তী, রামকানাই কবিরাজ, নীলমণি সমাদ্দার ও তার সংসার চালানোর জন্য কলাকৌশল, নীলকুঠির সঙ্গে সাধারণ লোকের লড়াই, নদীর ঘাটে গ্রামের লোকের স্নানের ছবি– আরো অনেক সামাজিক চিত্র খুব নিপুণ হস্তে, অত্যন্ত যত্নে এঁকেছেন বিভূতিভূষণ। সম্ভবত তাই বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ গল্পের ভূমিকায় প্রমথ বিশী বলেছেন যে, বিভূতিবাবুর ছোটগল্প ও উপন্যাসের অবলম্বন হয়েছে সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবন। 'ইছামতী' উপন্যাসে এই কথা খুব বেশি করে চোখে পড়ে।

সৈয়দ আব্দুল মালিক -এর 'সূরুযমুখীর স্বপ্ন' (১৯৬০) উপন্যাসের পটভূমি ধনশিরি নদীর তীরবর্তী ডালিম গ্রাম। এই উপন্যাসে যে জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার রূপাঙ্কন করেছেন ঔপন্যাসিক, সেটি হলো মুসলমান জনগোষ্ঠী। ধনশিরি নদীর কূলে এই স্থিত ডালিম গ্রামের একটি আপাত দরিদ্র, কিন্তু কঠোর শ্রমে ভাগ্য পরিবর্তন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এক যুবক গুলচ এর জীবন সংগ্রামের কাহিনী নির্মাণ করেছে এই উপন্যাসের আখ্যান।

তবে ডালিম গ্রামের জনবিন্যাসের বেশির ভাগ মুসলমান হলেও সেখানে হিন্দু, নেপালি, মিকির প্রভৃতিও আছে। তারা গরু, মহিষ পালন করে, ধান-সর্ষে-লাউ-মরিচ চাষ করে। দুধ বিক্রি করে। ঈশ্বর এবং আল্লাহ সেখানে পাশাপাশি থাকেন। পুজো পায় পাথর কিংবা গাছও।–

> "পূবে ধনশিরি পছিমে ডালিম। ধনশিরির পছিম পারে ডালিম গাঁও। তিনি কুড়ি দহ মানুহর সর"- পুরণি গাঁওখন। হিন্দু-মুসলমান নেপালী-মিকিরর মিহলি গাঁও। নৈর একেবারে পারত ওঠর ঘর নেপালী, সিঁহতর মহ-গরুর খুঁটি, গরু থকা গোহালি আর মানুহ থকা ঘর। সরিষহ পারে, গোমধান বোয়ে, গাখীর বেচে, জলকীয়া-জাতিলাওর খেতি করে।

সিঁহতর গাতে লগা ছয়ত্রিশ ঘর মুসলমান। দুটা চুবুরিত দুভাগ– ন-ডালিম, পুরণি ডালিম– পিছে ডালিম গাঁও একেখনেই।

ধানখেতি করে, সরিষহ মাটিমাহ, মরাপাট করে, নৈর পূবফালে সিটো পারত পাম খেতি করে, বিয়া পাতে, বরভোজ করে, দন-কাজিয়া করে। মনে মনে থাকে।

তার সিপারে সরহখিনি হিন্দুর পরিয়াল– কছারী আর সূতকুলীয়া মানুহ, এঘর বামুনো আছে। আঠ ঘর মিকির।

ঈশ্বর, আল্লা, শিল আর গছ– দুটা মসজিদ, এটা নামঘর।

ধনশিরিত বান আহিলে বনরীয়া হাতি ওলালে, কারোবার ঘরত জুই লাগিলে, হাইজা-বসন্ত আহিলে, আল্লা-ঈশ্বর একেলগে গাঁওলৈ আহে। তুলসী তলত চাকি জ্বলে, মসজিদত মম জ্বলে, বরগছর তলত সেন্দুরর শিতান লৈ বনরীয়া ফুল টোপনি যায়। অন্য সময়ত আল্লা ঈশ্বর সকলোরে ছুটি।"[১৪]

অর্থনৈতিক দিক থেকে গ্রামের অধিকাংশ মানুষের অবস্থা খুব সচ্ছল না হলেও প্রত্যেকেই স্বনির্ভর। বেশিরভাগ লোকই কৃষির ওপর নির্ভরশীল এবং নিজের বা অন্যের জমিতে চাষ আবাদের কাজ করে। গ্রামের মানুষ কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহে বিশ্বাসী। উপন্যাসের নায়ক গুলচ, নায়িকা তারা কিংবা কপাহী সকলকেই দেখা যায় এরকম কঠোর পরিশ্রমের জীবনযাপনে অভ্যস্ত। এমনকি আপাত সুখী ও আর্থিক নিরাপত্তার জীবনও এরা হেলায় ত্যাগ করে আসে এবং কঠিন পরিশ্রমের জীবন গ্রহণ করতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়না আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্য। গুলচের মায়ের চরিত্র ব্যাখ্যায় দেখি ডালিম গ্রামের মেয়েদের স্বরূপ– "মাক ডালিম গাঁওরে ছোয়ালী। বহি খাব নাজখনে। পাঁচ বছরিয়ার পরা ভুঁই কঠিয়া করি, খরি ফালি, ঢেকী খুন্দি খাইছে। কাম করিবলৈ ভয় নকরে। গাটো ভালে থাকে মানে মাগি নেখাঁও। খাটি খাম।"[১৫]

অর্থনৈতিক দিক থেকে আরেকটি বিষয় বিশেষ করে চোখে পড়ে। তবে আর্থিক দিকের সঙ্গে সঙ্গে এখানে সামাজিক একটা ব্যাপারও থাকে। ধনশিরি নদী দিয়ে মাঝে মাঝে বড় বড় সওদাগরের নৌকা আসে এই গ্রামে। এই সওদাগরের কাছ থেকে ডালিমবাসীরা নেয় আলু, সর্ষে ও অন্যান্য শস্যের বীজ। কয়েকমাস পরে তারা আবার আসে তাদের পাওনা নিতে। এই সব সওদাগরের ধনের অভাব নেই। এরা কখনও ডালিম গ্রামের মেয়ে-বউ-এর দিকেও হাত বাড়ায়। এতে ডালিমের সমাজ খানিকটা অস্থির হয়ে ওঠে। কপাহীর জীবনেও একজন এরকম ব্যবসায়ী এসেছিল। ফলস্বরূপ তার ও নাহরের দাম্পত্য জীবন শেষ হয়ে যায়। অবশ্য এসব ব্যাপারে প্রথম দিকে গ্রামের সমাজের খুব একটা মাথাব্যথা ছিল না। পরে অবশ্য সবাই মিলে কপাহীকে একঘরে করে দেয়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'সূরুযমুখীর স্বপ্ন' উপন্যাসে যে সমাজের কথা আমরা পাই, তা মূলত ইসলাম ধর্মাবলম্বী সমাজ। প্রত্যেক জনসমাজের মতো এই অঞ্চলের মানুষেরও কিছু বিশ্বাস আছে, সংস্কার আছে যা ধর্মীয় ভাবনার সঙ্গে সংযুক্ত। এই ধর্মমতে সব লোকেরই জীবনে অন্তত একবার বিবাহ করা কর্তব্য।[১৬]

চফি বুড়োর এক ছেলে, প্রায় প্রতিবন্ধী বফির বিয়ের ভাবনায় ঔপন্যাসিক সুকৌশলে এই দিকটির ওপর আলোকপাত করেছেন– "গাঁওত খোরা, কণা, লেঙেরা কোনোয়ে বিয়া নকরোয়াকৈ নেথাকে। বিয়া করোয়াটো চুন্নত, অবশ্য পালনীয় ধর্ম। বিয়ার পরিণাম যেই কি নহওক। বিয়া নকরোয়াটো ডাঙর গুণাহর কথা, পাপর কথা।"[১৭]

ডালিম গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে বেশিরভাগই যেহেতু কৃষিজীবী, তাই পুরুষেরা দাড়ি কাটানোর সময় পায় খুব কম। আশ্বিন,কার্তিক, মাঘ- ফাল্গুন-চৈত্র, এই ক মাস সেখানে দাড়ি কাটা হয়। খেতি চলাকালীন অবস্থায় সেখানে দুমাস দাড়ি না কাটা কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। তাছাড়া আরেকটি কথা, ডালিমে কোন নাপিত নেই। পাঁচজন দর্জি আছে। কাঁচি আছে তাদের কাছেই। তাদের থেকেই চুরি টুরি করে দু-একজন চুল কাটে, কারণ তারা কাপড় কাটে যে কাঁচি দিয়ে, তা দিয়ে চুল কাটতে দেয় না। তবে গ্রামের প্রায় প্রত্যেক যুবক চুল কাটতে জানে। এক ঘর থেকে কেঁচি, এক ঘর থেকে চিরুনি, এক ঘর থেকে খুর, আর কোন একজনের ঘরের উঠোনে বসে চুল কাটা হয়। যারা ভালো করে চুল কাটতে পারে তাদের বেশ খাতির।

উপন্যাসে হিন্দু মুসলমান সমাজের পারস্পরিক সহাবস্থান খুব গুরুত্ব সহকারে দেখানো হয়েছে। সাধারণত ইসলাম ধর্মীয় লোক ধর্ম ব্যাপারে খুবই নিয়মনিষ্ঠ ও ধর্মভীরু। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপাসনা সাধারণত তারা করে না। কিন্তু অসমিয়া মুসলমানদের ধন ভাবনা সম্পর্কে বেশ কয়েক জায়গায়, উপন্যাসে, হিন্দু দেবী লক্ষ্মীর প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছ। যেমন 'সঁচ নিদিবা, সঁচ গল মানে লখিমী গল' (পৃঃ,৩৮), 'কপাহী আর তারার লগে লগে গুলচর ঘরলৈ লখিমী আহিল।' (পৃঃ, ১১০) ইত্যাদি। অসমিয়া সংস্কৃতি ও লোকবিশ্বাস এই অঞ্চলের লোকেদের ভেতর সমানভাবে বহমান। তামোল-পাণ বা জলকুঁয়রী প্রসঙ্গের উল্লেখে এর প্রমাণ মেলে। গুলচের ধর্ম ইসলাম হলেও ধর্মীয় রীতি-নীতি সম্পর্কে সে প্রায় উদাসীন।

> "তার আগরটো শুকুরবারে বহুত ভাবিচিন্তি আর রাতিপুয়ার পরা সাজিকাচি গুলচ জুমা নামাজ পঢ়িবলৈ পিরীয়া গাঁওর মসজিদলৈ গ'ল। নামাজর সকলোবোর নীতি নিয়ম সি নেজানে। তথাপি কেতিয়াবা ইদে বকরিদে সি মসজিদলৈ গৈ জামাতর লগত উঠাবহা করে। অবশ্যে আজি তিনি বছর সি ইদর নামাজর বাহিরে অন্য নামাজ পঢ়া নাই। তার মনতেই নপরে।"[১৮]

গুলচের জীবনে ধর্মের চেয়ে কর্মের গুরুত্বই বেশি মনে হয়। এবং এই কর্মে তার ফ্রেন্ড ফিলোসফার ও গাইড চন্দ্র। চন্দ্র এবং ভীম হিন্দু হয়েও গুলচের উপকার করেছে। ফলে এখান থেকে গ্রামীণ জীবনে হিন্দু-মুসলমান পারস্পরিক সহাবস্থানের সজীব চিত্র লাভ করা যায়।

কৃষিক্ষেত্রে হরিণ, পাখি বা হাতির উৎপাত অসমের গ্রাম সমাজের নিয়মিত ঘটনা। এদের অত্যাচারে পরিপূর্ণ ধানক্ষেত নিমিষে ধ্বংস হয়ে যায়। সেইজন্য গ্রামের লোকেরা এই পশুপাখিদের ভীষণ ভয় করে। সবচেয়ে বেশি ভয় করে হাতিকে। কারণ হাতি শুধু ধান খায় না, পা দিয়ে মাড়িয়ে নষ্ট করে

দেয়। উপন্যাসে নায়ক গুলচেরও দেখি এরকম ভয়। তার সাধের কৃষি হাতি যদি এক দিক থেকে মাড়িয়ে নষ্ট করে দেয়, তাহলে তার অনেক ক্ষতি হবে, এমন ভাবনায় সে ভাবিত। (পৃঃ,৫৪)

অসমিয়া গ্রাম্য পোশাক-পরিচ্ছদ বা বস্ত্র সম্পর্কে বেশ কিছু কথা উপন্যাসে উল্লিখিত হয়েছে। অসমিয়া জনজীবনে পাট, তাঁত, মুগা, এড়ি প্রভৃতির তৈরি কাপড় প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত। গ্রামাঞ্চলে প্রায় প্রত্যেক বাড়িতে তাঁতের প্রচলন দেখা যায়। ঘরের তাঁতশালে লোকেরা নিজের পরিধেয় বস্ত্র বোনা ছাড়াও কিছু বিক্রয়যোগ্য কাপড় তৈরি করে। অসমের নারীরা নিজের বোনা এইসব কাপড়ে সুন্দর নকশা এঁকে থাকেন– "খেতির পরা উঠি দুয়োজনীয়ে তাঁত লগালে, কপাহীয়ে লগাইছে বর কাপোর, তরাই লগাইছে রিহা। তরাই বছা চরাইখনীয়া ফুল অন্য শিপিনীর ঈর্ষার বস্তু। ....তাইর কাম বর মিহি। ক'তো আঁর নাই, খুঁত নাই।"[১৯]

অসমের বস্ত্র প্রসঙ্গে আলোচনায় গামছা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। গামছা ছাড়া অসমের যেকোন বস্ত্রালোচনা অসম্পূর্ণ। আলোচ্য উপন্যাসে আমরা অনেকবার গামছা প্রসঙ্গ পাই। তারার গা ঢাকা ওড়না রূপে গামছা ব্যবহৃত হয়েছে। (পৃঃ, ৫৬)। গুলচের সঙ্গেও সর্বদা গামছা থাকে। তার নতুন পোশাকের অভাব থাকলেও চিন্তা নেই। কেননা গ্রামে বেড়াতে গেলে ভালো পোশাক দরকার নেই, গামছাই যথেষ্ট।

সামাজিক রীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান বিবাহ। বিভিন্ন সমাজে অনুষ্ঠিত হওয়া বিয়ের বিভিন্ন রীতি নীতি থেকে সেই সমাজ সম্পর্কে একটা ধারণা লাভ করা সম্ভব। সমাজজীবন নির্ভর উপন্যাসেও বিবাহ একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে। আলোচ্য উপন্যাসে বেশ কয়েকবার ডালিম গ্রামের সামাজিক বিয়ের রীতি আলোচিত হয়েছে। এই গ্রামে ছেলে মেয়ের পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করাকে অনৈতিক ধরা হয় না। বিশেষত ছেলে এবং মেয়ে যদি রাজি থাকে তবে কেউ বিশেষ আপত্তি করে না। কিন্তু গুলচ ও চেনিমাই এর বিয়ে হলো না পালিয়ে গিয়েও। আপত্তি করল দুই পক্ষের অভিভাবক। আর যেহেতু তখনও মৌলবী এসে নিকাহ পড়েনি, তাই এই বিয়ে হতে পারল না। ফলে দেখি পরবর্তীতে বিয়ে প্রসঙ্গে যখন চন্দ্রের পরামর্শ চেয়েছে, তখন চন্দ্র তাকে প্রথম থেকেই আটঘাট বেঁধে চলতে পরামর্শ দেয়। চন্দ্রের এই পরামর্শ গুলচ অক্ষরে অক্ষরে পালন করল কপাহীর সঙ্গে তার বিয়ের (নিকাহ) সময়। মৌলবী সময় মতো এলো। যদিও পালিয়ে বিয়ে তবু চন্দ্রের মতে এটা বিয়েই। তাই সমাজের সমর্থন থাকলে এই বিয়েতে কেউ বাধা দিতে পারবে না । পাত্রী আসার সঙ্গে সঙ্গেই মৌলবী নিকাহ পড়িয়ে দেবে। পাত্রীকে সহায় করবে চেনিমাই। চন্দ্র মৌলবীকে বুঝিয়ে রাখল পাত্রী এলেই অনুষ্ঠান সেরে ফেলতে। সেইমতো মৌলবী নিজের কাজ করলে, "কপাহী গৈ বহার লগে লগে মৌলবী আহিল। তিখর আরো গারোয়ানটো নিকাহর সাক্ষী থাকিল। মৌলবীয়েই উকিলো হ'ল –খুৎবাও পড়িলে। দরার নাম কি, ছোয়ালির নাম কি, সেই বিষয়ে কারো বিশেষ মনোযোগ দিবলগিয়া নাছিল, মোহরানাও মৌলবীয়েই ঠিক করি ললে-পঞ্চাশ টকা।"[২০]

ডালিমের সমাজের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হল গ্রামের আয়োজিত ভোজ। বছরে গ্রামে দুটি বড় ভোজ হয়। একটি বৈশাখের মাঝামাঝি বা জ্যৈষ্ঠের শুরুতে খেতির আয়োজনের সময়। আরেকটি মাঘ মাসে ধান কাটার পর। দুটি ভোজকেই ডালিমের অধিবাসীরা বড় পবিত্র বলে মনে করে। অনেকে রোগ থেকে আরোগ্য হতে বা অন্য কোনো মনস্কামনা পূরণ হবার আশায় এই ভোজে বিভিন্ন জিনিস দিয়ে থাকে।

ভোজের দিন কারো অন্য কোন কাজ থাকেনা। সবাই ঘরদোর লেপে কাপড় কেচে স্নান করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়। ঘরে ঘরে পিঠাপুলি তৈরির জন্য চালের গুঁড়ো হয় এবং পিঠে বানানো হয়। মসজিদে সার্বজনীনভাবে এক জায়গায় মাংসের তরকারি রান্না করা হয়। বিকেলে ছেলে মেয়ে (নাবালিকা মেয়ে) নিয়ে গ্রামের লোকেরা মসজিদে যায় । মসজিদের বারান্দায় সারি পেতে বসে, হিসাব করে নিজের সঙ্গে যারা এসেছে তাদের জন্য একটা দুটো পিঠা রেখে বাকি পিঠা সাধারণের জন্য রাখা টুকরিতে জমা করে। একজন লোক এসে প্রত্যেকের পাতে কাতারে মাংস দিয়ে যায়। আসলে ভোজের সার্বজনীন জিনিস এই মাংসের তরকারিটুকুই। সাধারণ লোক শুধু একটু খেয়ে পিঠা অনুসারে নিজের নিজের ভাগটুকু নিয়ে ঘরে যায়। এই ভাগের অংশও মেলে সামাজিক পদমর্যাদা অনুসারে। মোল্লা, গাওঁবুঢ়া বা সরদারের ভাগ বেশি। এই মসজিদের জন্য যাকে তাকে দিয়ে পিঠে পুলি তৈরি করা চলে না। কারণে এ কাজ পুণ্যের। তারার ভাবনায় এই ধরনের কথা জানা যায়। (পৃঃ, ৮৪)

যে অঞ্চলের কথা এই উপন্যাসে বলা হয়েছে সেখানে গ্রাম্য ওঝার দেখাও পাওয়া যায়। এটি সম্ভবত সমগ্র ভারতবর্ষের গ্রাম জীবনেরই বৈশিষ্ট্য যে, গ্রামীণ গুণিন, বৈদ্য, ওঝা, আচার্য বা গণক ঠাকুরের এখানে ছড়াছড়ি। তারা রোগের চিকিৎসা থেকে শুরু করে ভাগ্য পরীক্ষা করে, এমনকি ভূতও তাড়ায়। এই উপন্যাসেও এরকম লোক দেখা যায়। এখানে ওঝার নাম বাহাদুর। সে রোগের চিকিৎসা করে, ভূত তাড়ায়, লোকের মঙ্গলামঙ্গল দেখে দেয়, হারিয়ে যাওয়া বস্তুর সন্ধান দেয় এবং হস্তরেখা দেখে ভাগ্যের কথা বলে। (পৃঃ, ৭০)

শিক্ষার পরশ প্রায় না পাওয়া একটি গ্রামে লোকে কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস আঁকড়ে পড়ে থাকবে, এতে আশ্চর্য কি! কিন্তু এমন সমাজেই পরিবর্তনের কথা শোনা যায় চন্দ্রের মুখে। সে নদীবাঁধের কথা বলে, স্ত্রী শিক্ষার কথা বলে, স্কুল-কলেজ-হাসপাতাল-থানার কথা বলে আর গ্রামের লোক হা করে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। গ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থ ঘর, দরিদ্রদের কুটির প্রভৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র রয়েছে এই উপন্যাসে। মোটামুটি বলা যায় যে, সৈয়দ আব্দুল মালিক তাঁর এই উপন্যাসে অসমের গ্রামীণ জীবনের বেশ কিছু দিককে যথার্থরূপে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন।

একথা অনস্বীকার্য যে, গ্রাম, নদী, ও প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে বাংলা ও অসমিয়া সাহিত্যে আলোচ্য দুটি উপন্যাস রচিত হয়েছে। উপন্যাসগুলো যদি পাশাপাশি রেখে অধ্যয়ন করা যায়, তবে সেগুলোতে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হওয়ার পাশাপাশি খানিকটা তুলনার পরিসরের জায়গাও তৈরি হয়। দুটি

পৃথক আঞ্চলিক অবস্থানের পটভূমিকায় রচিত সাহিত্যকৃতির মধ্যে কিছু মিল ও কিছু পার্থক্য থাকাটা একান্তই স্বাভাবিক। বাংলা এবং অসমিয়া গ্রামভিত্তিক জনজীবনে প্রকৃতির গুরুত্ব অপরিসীম। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের মানুষদের জীবন ধারণের পদ্ধতি, সমসাময়িক অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং কালচেতনা– এগুলো এগিয়ে চলে প্রকৃতির সঙ্গে যা আমরা দুটি উপন্যাসেই দেখি।

বিভূতিভূষণ প্রকৃতির মধ্যে মানুষের মনকে দেখেছেন। মানুষের জীবনযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তিনি প্রকৃতির কোলে আশ্রয় নিয়েছেন। সমালোচক 'ইছামতী'তে ভবানীর দাম্পত্য প্রেমের মাধুর্যের রহস্য এই প্রকৃতিতে মজে থাকাতেই রয়েছে বলে উপলব্ধি করেছেন।[২১]

অন্যদিকে, মালিক- এর প্রকৃতি চেতনা নিঃসন্দেহে তার মর্তপ্রীতির প্রকাশ। তার চরিত্র সহজ সরল জীবনে প্রকৃতির আশ্রয় খুঁজে বেড়ায়। বিভূতিভূষণের উপন্যাসে প্রকৃতির শান্ত সমাহিত রূপের বর্ণনা আছে কিন্তু মালিকের উপন্যাসে প্রকৃতির সৌন্দর্যের সঙ্গে ধ্বংসকারী রূপ প্রকাশ পেয়েছে যা আমরা বন্যার প্রলয়ঙ্করী রূপের মধ্যদিয়ে দেখতে পাই।

তুলনার আলোকে দুটি উপন্যাসকে বিচার করলে আমরা নির্দিষ্ট কিছু সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যেমন,

১. ইছামতী উপন্যাসে যে গ্রামীণ সমাজের কথা বলা হয়েছে, তা বিশেষ কোন গোষ্ঠীর সমাজ নয় এই গ্রামে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, নানা জাত এবং নানা ধর্মের লোক দেখা যায়। এমনকি ইংরেজ সাহেবের কথাও এখানে রয়েছে। এই ধরনের অঞ্চলভিত্তিক উপন্যাসগুলোতে সাধারণত একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর কথা বলা হয়ে থাকে। প্রথম থেকেই বিভূতিভূষণ সে প্রয়াস করেননি। এখানে যেমন কুলীন ব্রাহ্মণ রাজারাম কিংবা ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায় রয়েছেন, তেমনি ভয়ঙ্কর ডাকাত হলা পেকেও রয়েছে। ব্যবসায়ী লালমোহন পাল যেমন আছে, তেমনি নিঃস্ব রামকানাই কবিরাজের সন্ধানও আমরা পাই। তিলুর মতো স্বামী সোহাগিনী স্ত্রী যেমন আছে, তেমনি নিস্তারিণীর মতো অবৈধ প্রেমে নিমজ্জিত সাহসী নারীও দেখা যায়। সমালোচক রুশতি সেন যার সম্পর্কে বলেছেন, "নিস্তারিণীর উপমা মেলেনা সতীত্বের নির্দিষ্ট ছকে শ্বশুর শাশুড়ির প্রতি ষষ্ঠ আনুগত্যে।"[২২]

অতএব আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে বিশেষ কোনো জনগোষ্ঠীর কথা বলা এখানে লেখকের উদ্দেশ্য নয় বরং তার উদ্দেশ্য হয়েছে চিরাচরিত প্রবহমান মানবজীবনের স্বরূপকে প্রকাশ করা।

অন্যদিকে মালিকের উপন্যাসে মুখ্য জনগোষ্ঠী হিসেবে ইসলাম ধর্মীয় লোকসমাজের কথা আলোচিত হলেও ডালিম গ্রামে অমুসলমানদের সংখ্যাও প্রায় সমান। এই সমস্ত সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে পারস্পরিক সদ্ভাব এখানকার বৈশিষ্ট্য। চন্দ্র হিন্দু হলেও কপাহী বা গুলচের সঙ্গে তার সম্পর্ক বাহ্যিক নয়, আন্তরিক। গুলচের বিবাহের উদ্যোগে তার এই আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

গ্রামের বেশিরভাগ লোকই কৃষিজীবী। জমির অভাব নেই, কেননা নদীর কৃপায় প্রত্যেকটি পতিত

জমিই উর্বর। অতএব উদ্যোগী হলেই সেই মাটিতে কৃষি কাজ করা যেতে পারে। গ্রামের পাশেই জঙ্গল থাকার জন্য এখানকার লোকেদের কখনো বাঁশ কাঠ প্রভৃতির জন্য পরনির্ভরশীল থাকতে হয় না।

ইছামতীর তীরের সমাজে আমরা যেমন এক ধরনের স্থবিরতা, শান্ত, নিশ্চল, কর্মবিমুখ সমাজ প্রবাহ দেখতে পাই, তার বিপরীতে তেমনি ধনশিরি নদীর তীরবর্তী গ্রামে আমরা কর্মপটু, তৎপর, উদ্যোগী, কঠোর পরিশ্রমে বিশ্বাসী সমাজের সঙ্গে পরিচিত হই। দুই সমাজের এই আভ্যন্তরীণ বৈপরীত্য খুব মন দিয়ে দেখলে নজর এড়িয়ে যায় না।

২. ইছামতী উপন্যাসের দ্বিতীয় যে জিনিসটি সহজেই পাঠককে আকর্ষণ করে তা হলো ঔপন্যাসিকের প্রকৃতি প্রেম। বাংলার গ্রাম প্রকৃতি তার সমস্ত রূপ-লাবণ্য নিয়ে যেন এই উপন্যাসে উপস্থিত। ইছামতির তীরে পাঁচপোতা গ্রামে বাওড়ের ধারে গ্রান্ট সাহেবের ভ্রমণের দৃশ্য, অথবা নদীর জলে নিস্তারিণীর স্নান করার দৃশ্যের যে বর্ণনা লেখক দিয়েছেন, সেখানে আমরা গ্রাম বাংলার চিরন্তন রূপকেই পাই। নানা রকম গাছ যেমন বাঁশ, নিম, সোঁদাল, বৈঁচি প্রভৃতি; পাখি যেমন শালিক, দোয়েল, ছাতারে, বউ কথা কও প্রভৃতি; ফুল যেমন ধুন্দুলের ফুল, রাধা লতার ফুল, কেয়া, বিল্বপুষ্প, আমের বোল, নাটা-কাটার ফুল ইত্যাদি। এমন অজস্র গাছ, ফুল, পাখি প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন বিভূতিভূষণ, যেগুলি একান্তভাবেই গ্রাম বাংলার নিজস্ব পরিচিতি।

সমালোচক নগেন শইকীয়া যদিও বলেছেন যে 'সূরুযমুখীর স্বপ্ন' উপন্যাসের মূলসুর 'মানবীয় প্রেম'[২৩] তবু এখানে ঔপন্যাসিকের প্রকৃতি প্রেম এই উপন্যাসে একটা স্বতন্ত্র মাত্রা যোগ করেছে। নায়ক এর মধ্যদিয়ে প্রকাশ পাওয়া এই প্রকৃতি প্রীতি আসলে লেখকেরই প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসার নামান্তর মাত্র। পরিষ্কার নদীর প্রায় নীল জলে যখন বৃষ্টি ঝরে পড়ে, তখন নদীর একটি অপরূপ রূপ গুলচের চোখে ধরা পড়েছে। গুলচ অনুভব করে যে, একটা চমৎকার মিষ্টি শব্দ জন্ম নিচ্ছে যে শব্দের সঙ্গে গাছে পড়া বৃষ্টির জলের শব্দের কোনো মিল নেই। কিংবা যখন ঝোপের মধ্যে বুনোফুলের সুগন্ধ গুলচের নাকে এসে লাগে তখন তার স্মৃতিতে ভেসে ওঠে তার অতীতের দিনগুলি। সেই গন্ধ তাকে নস্টালজিক করে তোলে।

সন্দেহ নেই প্রকৃতির বর্ণনায় বিভূতিভূষণ মালিকের তুলনায় অধিকতর সাবলীল। বাংলার তুচ্ছাতিতুচ্ছ নদী, মাঠ, ফুল, পাখি, গাছপালা সমস্ত কিছুকে বিভূতিভূষণ মমতার সঙ্গে নিজের সাহিত্যে জায়গা দিয়েছেন। তাকে জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে পরিবেশন করেছেন। পক্ষান্তরে মালিকের রচনায় আমরা এমনটা দেখি না। তার প্রকৃতি প্রীতিও অনেকটা মানবিক বাস্তববোধের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয় ।

৩. বাংলার চিরাচরিত ব্রত-পার্বণ, পূজা, ধর্মচর্চা প্রভৃতির বিস্তারিত বিবরণ 'ইছামতী' উপন্যাসে রয়েছে। দুর্গাপূজা, তীর্থযাত্রা, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি উপলক্ষে ব্রাহ্মণ ভোজনের প্রসঙ্গ যেমন দেখা যায়,

তেমনি মেয়েদের একান্তই নিজস্ব উৎসব 'তেরের পালুনি' ব্রতের কথা এখানে আমরা দেখি। বঙ্গদেশের গ্রামীণ সমাজের চিরাচরিত বিভেদ, দলাদলি, জাতপাত প্রভৃতিও এই উপন্যাসে সজীব। প্রসঙ্গত নালু পালের দেওয়া ব্রাহ্মণ ভোজনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে।

অন্যদিকে মুখ্যত ইসলাম ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর কথাই 'সূরুযমুখীর স্বপ্নে' বলা হয়েছে। কিন্তু ইসলাম ধর্মীয় লোকের কথা বলা হলেও গ্রামে অন্যান্য ধর্মের লোকজন বর্তমান এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহাবস্থান ও প্রীতির বন্ধন অত্যন্ত মজবুত। 'ইছামতী' উপন্যাসে বর্ণিত সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে ভেদাভেদের পাশাপাশি এখানে এই পারস্পরিক মেলবন্ধন উল্লেখযোগ্যভাবে নজরে পড়ে। গুলচের বিয়ের জন্য চন্দ্রের যে উদ্যোগ ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, তা আমাদের এই পারস্পরিক মেলবন্ধনের দিকটি নির্দেশ করে। এই উপন্যাসেও সামাজিক ভোজের কথা আছে এবং এই প্রসঙ্গে 'ইছামতী' উপন্যাসের ভেদাভেদের চিত্রের বিপরীতে এখানে বরং একটা সামুহিক সর্বসাধারণের যোগদানের চিত্র নজরে পড়ে ।

৪. অর্থনৈতিক দিক থেকে বলতে গেলে বলা যায় যে, দুটো উপন্যাসেই মূলত কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির কথা বলা হয়েছে। 'ইছামতী' উপন্যাসে যে সময়ের কথা বলা হয়েছে সেটা ঔপনিবেশিক যুগ। ফলে অর্থনৈতিক ক্ষমতা মূলত ইংরেজদের হাতে। ওই সময় বাংলার গ্রাম অঞ্চলের প্রায় পঙ্গু হয়ে যাওয়া কৃষি ব্যবস্থা, উদ্যোগহীন বেকার গ্রামীণ সমাজের চিত্র বিভূতিভূষণ বিশ্বস্ততার সঙ্গে অঙ্কন করেছেন। ইংরেজ আমলের মাঝামাঝি সময়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, যেমন রেলগাড়ি প্রবর্তন, প্রভৃতির কথাও এই উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। বিভূতিভূষণ কিছু কিছু জায়গায় জমিদারি প্রথার উল্লেখ করেছেন। জমিদারি প্রথায় জমিদারের শোষণ এবং অত্যাচারের মর্মস্পর্শী চিত্র আছে। বিস্তারিতভাবে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোকপাত তেমনভাবে না থাকলেও আমরা বুঝতে পারি যে আসলে বাংলার গ্রামসমাজ তখন কৃষির উপরই নির্ভরশীল ছিল। তবে কঠোর পরিশ্রমী যুবক যে নিজস্ব উদ্যোগে নিজের অর্থনৈতিক অবস্থা ব্যবসার মাধ্যমে পরিবর্তন করতে পারে, নালু পালের গল্পে সে কথা প্রমাণ হয়।

'সূরুযমুখীর স্বপ্ন' উপন্যাসেও যে অর্থনীতির চিত্র আমরা পাই তা মূলত কৃষিনির্ভর। পাশাপাশি গো-পালন, তাঁত বোনা প্রভৃতি কিছু বৃত্তির পরিচয় এখানে পাওয়া যায়। তবে মূলত ধান চাষ, পাট চাষ, বুনো জমি চাষের উপযোগী করে চাষ করা প্রভৃতি প্রসঙ্গে কৃষি অর্থনীতির প্রাধান্য স্পষ্ট হয়ে যায়। এখানে এক কর্মযোগী বেকার যুবক গুলচ বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বুনো জমিকে চাষের উপযোগী করে চাষ করে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে। এই উপন্যাসে বন্যার ফলে সৃষ্টি হওয়া জমিতে পলি পড়ে চাষের উপযোগী হওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিছু কিছু ব্যবসায়ীর কথা রয়েছে তারাও কিন্তু কৃষির বীজের ব্যবসা করে। ফলে কৃষিভিত্তিক ব্যবসার চিত্রও এই উপন্যাসে দেখানো হয়েছে।

৫. 'ইছামতী' উপন্যাসের ভাষা ব্যবহারে এর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যশোর অঞ্চলের উপভাষার সার্থক প্রয়োগে এখানকার চরিত্রগুলি হয়ে উঠেছে অত্যন্ত জীবন্ত। এছাড়া ইংরেজদের চরিত্রে ইংরেজি

মিশ্রিত ভাঙা বাংলা উচ্চারণ বাস্তবোচিত হয়েছে। যেমন :

ক) ইংরেজ এর উক্তি : "কটো জমি এ বছর ভাগ দিয়াছ, আমাকে কাল ডেখাতে হইবে। ইম্প্রেশন রেজিস্টার তৈরি করিয়াছ?"

খ) "তিনকড়ি বিদায় নেবার উদ্যোগ করতেই রাজারাম বললেন ব্রাহ্মণ বাড়ি এসেচ, পেরসাদ না পেয়ে যাবে, না যেতি আছে? পয়সা হয়েছে বলে কি ধরাকে সরা দেখচো নাকি?"

'সূরুযমুখীর স্বপ্নে'র মধ্যেও আমরা অসমিয়া লোকভাষার বহুল প্রয়োগ লক্ষ করি। উপন্যাসটি যদিও বর্ণনাত্মক ভাবে লেখা, তাও মাঝেমাঝেই স্থানীয় ভাষার প্রয়োগ করেছেন লেখক। যেমন-

"রাতি গ'ল রাতিপুয়া ঘুরাই আনিলু। লরা, ফুকুয়া নাই নহয়।" (পৃঃ, ৬০)

তাছাড়া মুসলমান জনসমাজের ব্যবহৃত কথ্যভাষাও এখানে উল্লেখিত হয়েছে বিশেষত ইসলাম ধর্মীয় কিছু শব্দের বারবারই দেখা পাওয়া যায় যেমন– ছায়াব, মসজিদ, জুম্মা, নামাজ, চিন্নী, কারবালা ইত্যাদি।

৬. বিভূতিভূষণ ও মালিকের উপন্যাসের চরিত্র চিত্রণের তুলনামূলক বিচারে একথা প্রতীয়মান হয় যে, এই দুজন ঔপন্যাসিকের উপন্যাসের চরিত্র সামাজিক বাস্তব পটভূমিতে গড়ে ওঠা সংবেদনশীল মানুষ। বিভূতিভূষণ সামাজিক আবেষ্টনী এবং পরিবর্তনের প্রক্রিয়া মানুষের স্বাভাবিক জীবনের প্রতিকূল বলে মনে করতেন। তাই এই স্বাভাবিক দিকটিকে চিত্রিত করতে তিনি তাঁর পরিচিত প্রকৃতির পটভূমিতে সহজ-সরল গ্রাম্য জীবনকে নির্বাচিত করেছেন। তাঁর ভবানীর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য সুদূরের প্রতি আকাঙ্ক্ষা। সে বন্ধন-ভীরু পথিক, সকল প্রকার বন্ধনের প্রতি তার এক ভীতি।

অন্যদিকে মালিকের উপন্যাসের পটভূমি গ্রাম্যজীবন যদিও, তাঁর চরিত্রগুলো প্রকৃতির চেয়ে সমাজের সঙ্গে অধিকতর জড়িত। সমাজ জীবনের সঙ্গে ব্যক্তি জীবনের সংঘাতের ফলে উদ্ভব হওয়া সমস্যা-সংকট, দুঃখের অনুভূতি তাঁর চরিত্রগুলোতে প্রায়ই দেখা যায়। মালিকের গুলচ সংসার বিরাগী নয়, সংসারের বন্ধন সে উপভোগ করে।

বিভূতিভূষণের নারী চরিত্রের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তাদের স্নিগ্ধ মাতৃত্ব। স্নেহপরায়ণতাই বিভূতিভূষণের নারীচরিত্রসমূহের মূল উপাদান। সরল, মমতাময়ী, সংসারী, দ্বন্দ্বহীনা এবং একনিষ্ঠা বাংলাদেশের কন্যা বিভূতিভূষণের উপন্যাসের নায়িকা। কিন্তু সৈয়দ আব্দুল মালিক এর উপন্যাসে বিচিত্র নারী চরিত্রই আত্মপ্রকাশ করেছে। ঐশ্বর্যময়ী, প্রতিহিংসাপরায়ণা, প্রবঞ্চিতা, ছলনাময়ী, প্রেমিকা এমনকি বিপথগামী নারীর জীবনের চিত্রও তাঁর উপন্যাসে অঙ্কিত হয়েছে। এছাড়াও মায়ের চরিত্রও মালিকের উপন্যাসে কখনো দায়িত্বহীন এবং কখনো সম্পর্কে অবৈধ। মালিকের নারীচরিত্রে মনের সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে দেহের সমস্যাও দেখা যায়, যা বিভূতিভূষণের উপন্যাসে অনুপস্থিত।

বিভূতিভূষণ সবকিছুকেই অন্তর্দৃষ্টি মিশিয়ে দেখেন তাই তিনি বাস্তবের মধ্যে অন্তর্নিহিত সত্যটি অনুসন্ধান করতে চেয়েছেন। তবে একথা বলতে দ্বিধা নেই যে চরিত্র চিত্রণের দিক থেকে মালিকের চরিত্র অধিকতর বাস্তবের পটভূমিতে নির্মিত।

উপসংহার

মানবজীবনের শাশ্বত দিকগুলোর কথা যদি স্মরণ করা যায়, তবে সহজেই বলা সম্ভব যে, দুটো অঞ্চলের পটভূমিতে লেখা দুই জাতীয় উপন্যাসের মধ্যে ভিন্নতা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু এই ভিন্নতাই শেষ কথা নয়। অঞ্চলভেদে মানুষের মনুষ্যত্ববোধ, আর্থসামাজিক অবস্থান, সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনা এই সমস্ত মানবিক বৃত্তি, দুর্বলের প্রতি সবলের শোষণ, সামাজিক বৈষম্য, পুরুষ নারীর ভেদাভেদ এ সমস্তই চিরন্তন সত্য এবং এগুলোই সাহিত্যের সামগ্রী। আলোচ্য উপন্যাসগুলো এই দিক থেকে আলোচনা করলে আমরা এমন কিছু আবিষ্কার করি যা দেশ কাল ভেদে মানবতার সামগ্রী। পৃথিবীর সমস্ত জনগোষ্ঠী যে আসলে এক মানবতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে, এ কথা যেন তারই ইঙ্গিতবাহী। আর এখানেই তুলনামূলক আলোচনার সার্থকতা। বিভূতিভূষণ ও মালিকের উপন্যাসের আলোচনার প্রান্তে এসে একথা বলা চলে যে দুটো উপন্যাসই মানবজীবনের চিরন্তন সত্য প্রকাশ করেছে এবং এখানেই তাঁরা সার্থক হিসেবে স্বীকৃতি লাভের অধিকারী ।

তথ্যসূত্র

১. *স্মৃতির রেখা*, *বিভূতিভূষণ রচনাবলী* প্রথম খণ্ড, পঞ্চম পুনর্মুদ্রণ, বৈশাখ ১৩৯৪, মিত্র ও ঘোষ কলকাতা, পৃষ্ঠা ৪১৯

২. *উৎকর্ণ*, *বিভূতিভূষণ রচনাবলী* চতুর্থ খণ্ড, ৫ম পুনর্মুদ্রণ, আষাঢ় ১৩৯৮, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৪৪৯

৩. *হে অরণ্য কথা কও*, *বিভূতিভূষণ রচনাবলী* সপ্তম খণ্ড, চতুর্থ পুনর্মুদ্রণ আষাঢ় ১৩৯৩, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা পৃষ্ঠা ৪৭৫

৪. মহীতোষ বিশ্বাস, *বাংলা উপন্যাস : প্রসঙ্গ আঞ্চলিকতা*, প্রথম সংস্করণ ১৪০৯, জয় দুর্গা লাইব্রেরি, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১১৪

৫. *ইছামতী*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১১৫

৬. তদেব, পৃষ্ঠা ৬৬

৭. তদেব, পৃষ্ঠা ১১৮

৮. তদেব, পৃষ্ঠা ৭২-৭৩

৯. তদেব, পৃষ্ঠা ১১২

১০. তদেব, পৃষ্ঠা ১০৩

১১. তদেব, পৃষ্ঠা ১৪৫

১২. তদেব, পৃষ্ঠা ২০৬

১৩. তদেব, পৃষ্ঠা ১৪১

১৪. *সূরুযমুখীর স্বপ্ন*, পৃষ্ঠা ২-৩

১৫. তদেব, পৃষ্ঠা ১১
১৬. স্বামীম নাসরিন, *সূরুযমুখীর স্বপ্ন বিচার*, পৃষ্ঠা ৮২
১৭. *সূরুযমুখীর স্বপ্ন*, পৃষ্ঠা ৩৫
১৮. তদেব, পৃষ্ঠা ১৬১-১৬২
১৯. তদেব, পৃষ্ঠা ১১০
২০. তদেব, পৃষ্ঠা ৯২
২১. ইন্দ্রানী ঘোষাল, *বাংলা নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস*, পৃষ্ঠা ৭৭
২২. রুশতি সেন, *বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : দ্বন্দ্বের বিন্যাস*, পৃষ্ঠা ১১৪
২৩. নগেন ঠাকুর, (সম্পা:) *এশ বছরর অসমীয়া উপন্যাসর গতি প্রকৃতি, এশ বছরর অসমীয়া উপন্যাস*, পৃষ্ঠা ১৫

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *ইছামতী*, ষষ্ঠ পুনর্মুদ্রণ, ১৪০২, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা
২. *উৎকর্ণ*, বিভূতিভূষণ রচনাবলী চতুর্থ খণ্ড, ৫ম পুনর্মুদ্রণ, আষাঢ় ১৩৯৮, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা
৩. নগেন ঠাকুর, (সম্পা:) *এশ বছরর অসমীয়া উপন্যাস*, ১ম সং, নভেম্বর ২০০২, জ্যোতি প্রকাশন, গুয়াহাটি
৪. মহীতোষ বিশ্বাস, *বাংলা উপন্যাস : প্রসঙ্গ আঞ্চলিকতা*, প্রথম সংস্করণ ১৪০৯, জয়দুর্গা লাইব্রেরি, কলকাতা
৫. ইন্দ্রানী ঘোষাল, *বাংলা নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস*, প্রথম প্রকাশ ২০০৪ গ্রন্থন প্রকাশনী, কলকাতা
৬. রুশতি সেন, *বিভূতিভূষণ : দ্বন্দ্বের বিন্যাস*, আগস্ট ১৯৯৮, প্যাপিরাস, কলকাতা
৭. *হে অরণ্য কথা কও*, বিভূতিভূষণ রচনাবলী সপ্তম খণ্ড, চতুর্থ পুনর্মুদ্রণ আষাঢ় ১৩৯৩, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা
৮. স্বামীম নাসরিন, *সূরুযমুখীর স্বপ্ন বিচার*, প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ২০০৭, সূরুযমুখী প্রকাশন, যোরহাট
৯. সৈয়দ আব্দুল মালিক, *সুরুযমুখীর স্বপ্ন*, নতুন সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ১৯৯৫, গুয়াহাটি
১০. *স্মৃতির রেখা*, বিভূতিভূষণ রচনাবলী প্রথম খণ্ড, পঞ্চম পুনর্মুদ্রণ, বৈশাখ ১৩৯৪, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা

BL College Journal

ISSN 2664-228X
Volume -1, Issue-2, 2019
pp. 80-97

মুক্তিযুদ্ধে শরণার্থী : কেস স্টাডি মাগুরখালী ও হাসনাবাদ

দিব্যদ্যুতি সরকার, পিএইচডি

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলাদেশ এন্ড লিবারেশন ওয়ার স্টাডিজ, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী, বাংলাদেশ

পোস্ট-ডক্টরাল ফেলো, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

ই-মেইল : dibyadyuti.sarkar@gmail.com

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন সৃষ্ট শরণার্থী সমস্যা বহুমুখী মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল। এই বিপর্যয়ের প্রকৃতি ও প্রবণতা অনুধাবনের জন্য বাংলাদেশ ও ভারতের দুইটি এলাকায় কেস স্টাডি করা হয়েছে। এর একটি হলো খুলনা জেলার মাগুরখালী ইউনিয়ন এবং অন্যটি পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগণার হাসনাবাদ রেল স্টেশন সংলগ্ন বস্তি। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে মাগুরখালী ইউনিয়নের নব্বই শতাংশের বেশি অধিবাসী শরণার্থী হয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। মূলত প্রাণ রক্ষার জন্য তারা দেশান্তরী হলেও অনেকেই সেখানে প্রাণ হারায়। মাত্র সাত-আট মাসের শরণার্থী জীবনে এই এলাকার চার শতাংশের বেশি অধিবাসী মারা যায়।

বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী পশ্চিমবঙ্গের হাসনাবাদ রেলস্টেশন সংলগ্ন জনবসতিহীন একটি প্রান্তর ১৯৭১ সালের মে মাস নাগাদ শরণার্থীতে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। বাংলাদেশ থেকে আসা মানুষ আশ্রয় নেওয়ায় এলাকাটির নাম হয় 'জয় বাংলা বস্তি'। ডিসেম্বরে বাংলাদেশ মুক্ত হলে এই শরণার্থীরা স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে এসেছিল। কিন্তু এই ফিরে আসা শরণার্থীদের অনেকে নিরাপত্তার অভাব ও চরম দারিদ্র্যের কারণে ভারতে পুনঃশরণার্থী হয়।

মাগুরখালীর শরণার্থীরা জীবন বাঁচানোর জন্য দেশত্যাগ করলেও শেষ পর্যন্ত বিপুল জীবনহানীর মধ্য দিয়ে তাদের শরণার্থী জীবন শেষ হয়। অন্যদিকে জয় বাংলা বস্তি সাক্ষী হয়ে থাকে পুনঃশরণার্থী অনুপ্রবেশের। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের এ এক মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতা, যার অভিঘাত অসংখ্য সাধারণ মানুষ আজও বয়ে বেড়াচ্ছে। মাগুরখালী ও হাসনাবাদের এই দুটি কেসস্টাডি থেকে এই অভিঘাতের প্রকৃতি ও পরিমাণ অনুধাবন করা যায়।

ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে সৃষ্ট মানবিক বিপর্যয়ের অন্যতম অনুষঙ্গ হলো শরণার্থী। ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগজনিত শরণার্থী বিনিময়ের মতো পরিস্থিতিতেও যে সকল মানুষ দেশত্যাগ করে ভারতে যায়নি, ১৯৭১ সালে তারা জীবন রক্ষার জন্য ভারতে পাড়ি জমায়। খুলনা অঞ্চলে এই দেশত্যাগের প্রধান কারণ ছিল পাকিস্তানি সেনা, রাজাকার, শান্তি কমিটি, জামায়াতে ইসলামী এবং মুসলিম লীগের কর্মীদের অত্যাচার। এছাড়া অনেক এলাকার স্থানীয় দুর্বৃত্তরা মুক্তিযুদ্ধজনিত অরাজকতার সুযোগ নিয়ে পার্শ্ববর্তী হিন্দু এলাকায় নির্যাতন ও লুঠপাটে অংশ নেয়। বহু বছরের পরিচিত প্রতিবেশীর এহেন আকস্মিক পরিবর্তনে হিন্দুরা স্বভাবতই নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়েছিল।[১] রাষ্ট্র এবং সমাজ কোথাও নিরাপত্তা না পেয়ে তারা শরণার্থী হিসেবে ভারতে আশ্রয় নেয়। শরণার্থীদের জীবনে যে বিরাট মানবিক বিপর্যয় ঘটে যায়, তা অনুধাবনের জন্য এই প্রবন্ধে মাগুরখালী ও হাসনাবাদ স্থান দুটিকে কেস স্টাডির আওতায় আনা হয়েছে।

সূচক শব্দ

মুক্তিযুদ্ধ, শরণার্থী, গণহত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধ, মানবিক বিপর্যয়

শরণার্থী কী

১৯৫১ সালে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশন (UNHCR) শরণার্থীর সংজ্ঞার্থ প্রদান করে। এই সংজ্ঞার্থ অনুসারে শরণার্থী হলো :

> ধর্ম, বর্ণ, জাতীয়তা কিংবা কোনো বিশেষ সামাজিক শ্রেণি বা রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে নির্যাতিত হওয়ার ভয়ে নিজের চিরাচরিত আবাসভূমি থেকে অন্যত্র বসবাসকারী ব্যক্তি, যিনি নিজ দেশের নিরাপত্তা পরিস্থিতিতে আস্থাশীল নন এবং এতৎসংক্রান্ত ভীতির কারণে স্বদেশে ফিরে যেতে অনিচ্ছুক বা অক্ষম।[২]

ইন্টারন্যাশনাল কমিটি ফর ইউরোপিয়ান মাইগ্রেশান (ICEM) শরণার্থীর সংজ্ঞার্থে যুদ্ধ এবং দুর্যোগের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করেছে। আইসিইএম-এর সংজ্ঞার্থ অনুসারে, যিনি যুদ্ধ কিংবা দুর্যোগের শিকার হয়ে এবং জীবননাশের ভয়াবহ হুমকির মুখে দেশ ত্যাগ করেছেন, তিনি শরণার্থী।[৩]

১৯৯৭ সালের নভেম্বর মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত শরণার্থী বিষয়ক আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত দক্ষিণ-এশীয় আঞ্চলিক কর্মশালায় শরণার্থী প্রত্যয়টির একটি সংজ্ঞার্থ নির্ধারণ করা হয়। সেখানে শরণার্থী বলতে বোঝানো হয় :

> ক. নিজ দেশের বাইরে অবস্থানকারী কোনো ব্যক্তি, যিনি তার নৃতাত্ত্বিক বা জাতিগোষ্ঠীগত পরিচয়, ধর্ম, লিঙ্গ, জাতীয়তা কিংবা বিশেষ সামাজিক গোষ্ঠীর সদস্য হওয়ার কারণে অথবা তার নিজস্ব রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে নির্যাতিত হওয়ার আতঙ্কে সত্যিই সন্ত্রস্ত। একই কারণে তিনি তার নিজস্ব আবাসভূমির নিরাপত্তা পরিস্থিতিতে আস্থাশীল নন এবং সেখানে ফিরে যেতে অনিচ্ছুক অথবা অক্ষম।

> খ. যিনি তার নিজ দেশের সর্বত্র অথবা কোনো অংশে সংঘটিত জনশৃঙ্খলা মারাত্মকভাবে বিনষ্টকারী বহিরাক্রমণ, দখল বা বৈদেশিক আধিপত্য অথবা মানবাধিকারের চরম লংঘনের কারণে তার চিরাচরিত আবাসভূমি ছেড়ে অন্য স্থানে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন।[৪]

উপরি-উক্ত প্রত্যেকটি সংজ্ঞার্থ থেকে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ থেকে ভারতে আশ্রয় নেওয়া বিশাল জনগোষ্ঠীকে নিশ্চিতভাবে শরণার্থী হিসেবে সনাক্ত করা সম্ভব। তবে শেষোক্ত সংজ্ঞার্থ অধিকতর স্পষ্ট এবং বাংলাদেশ থেকে ভারতে আশ্রয় নেওয়া জনগোষ্ঠীকে সুস্পষ্টভাবে শরণার্থী হিসেবে চিহ্নিত করে। বর্তমান প্রবন্ধে শরণার্থী সংক্রান্ত ধারণা প্রকাশের জন্য এই সংজ্ঞার্থটি গ্রহণ করা হয়েছে।

শরণার্থী শ্রেণিকরণ

ধর্ম সম্প্রদায়গত দিক দিয়ে শতকরা প্রায় নব্বই ভাগ শরণার্থী ছিল হিন্দু, বাকিরা মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের। ব্যতিক্রমী কিছু উদাহরণ বাদ দিলে জাতিগত দিক দিয়ে এরা সকলেই ছিল বাঙালি। ভারতে আত্মীয়-স্বজন থাকায় কিছু বিহারিও এ সময়ে ভারতে পালিয়ে গিয়েছিল। যদিও অধিকাংশ বিহারি পাকিস্তান বাহিনীর সমর্থক হিসেবে কাজ করায় তাদের আনুকূল্য পেয়েছিল এবং এই কারণে তাদের ভারতে চলে যাওয়ার প্রবণতা ছিল কম। নিচের সারণিতে শরণার্থীদের ধর্মীয় পরিচয় সম্পর্কিত পরিসংখ্যান দেখানো হলো:

সারণি ১

শরণার্থীদের ধর্মীয় পরিচয় (১৬ আগস্ট ১৯৭১ পর্যন্ত)

শরণার্থীদের ধর্মীয় পরিচয়	সংখ্যা	শতকরা হার
হিন্দু	৬৯.৭১ লক্ষ	৯২.২৬%
মুসলমান	৫.৪১ লক্ষ	৭.১৬%
অন্যান্য	০.৪৪ লক্ষ	০.৫৮%
মোট	৭৫.৫৬ লক্ষ	১০০%

উৎস : *Bangladesh Documnets,* vol. 1, (New Delhi: Ministry of External Affairs, India, 1972), p. 446.

১৬ই আগস্ট ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত পাওয়া এই পরিসংখ্যানে মোট শরণার্থী দেখানো হয়েছে ৭৫.৫৬ লক্ষ জন। ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ভারতে সর্বমোট শরণার্থী প্রবেশ করেছিল ৯৮,৯৯,৩০৫ জন।[৫] সারণি ১-এ প্রাপ্ত হিন্দু ও মুসলমানের অনুপাত থেকে বোঝা যায় যে, শরণার্থীদের নব্বই শতাংশের বেশি ছিল হিন্দু। ১৬ই আগস্ট পর্যন্ত পাওয়া শরণার্থীদের এই অনুপাত ডিসেম্বর পর্যন্ত অটুট ছিল ধরে নিলে হিন্দু শরণার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৯১,৩৩,০৯৯ জন, মুসলমান শরণার্থীর সংখ্যা ৭,০৮,৭৯০ জন এবং হিন্দু ব্যতীত অন্যান্য অমুসলিমদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৭,৪১৬ জন।

১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে কোনো আদমশুমারি না হওয়ায় এ সময়কার হিন্দু জনসংখ্যার কোনো

পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। তবে ১৯৬১ ও ১৯৭৪ সালের আদমশুমারিতে তাদের যে সংখ্যা পাওয়া যায়, তা থেকে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন ধর্মের অধিবাসীদের সংখ্যা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। ১৯৬১ সালের জনগণনায় পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ৯৩,৮০,০০০ জন এবং মুসলমান ৪,০৮,৯০,০০০ জন। ১৯৭৪ সালে হিন্দু ও মুসলমানের এই সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে ৯৬,৭৩,০০০ ও ৬,১০,৩৯,০০০ জন।[৬] অর্থাৎ ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত তেরো বছরে হিন্দু জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল ৩.১০ শতাংশ। তেরো বছরের এই বৃদ্ধির হারকে ভিত্তি ধরলে ১৯৬১ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এই বৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ২.৩৮ শতাংশ। সেক্ষেত্রে ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের মোট হিন্দুদের সংখ্যা হয় ৯৬,০৩,০০০ জন। এর মধ্যে ৯১,৩৩,০৯৯ জন শরণার্থী হয়েছিল ধরলে হিন্দু শরণার্থীর শতকরা হার মোট হিন্দু জনগোষ্ঠীর ৯৫.১১ শতাংশ। একই পদ্ধতি অনুসরণ করে হিসাব করলে ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানদের সংখ্যা হয় ৫,৬৩,৮৭,০০০ জন (১৯৭৪ সাল পর্যন্ত ১৩ বছরে বৃদ্ধির হার ৪৯.৩ শতাংশ; এই পরিসংখানকে ভিত্তি ধরলে দশ বছরে মোট বৃদ্ধি হয় ৩৭.৯ শতাংশ)। এর মধ্যে ৭,০৮,৭৯০ জন শরণার্থী হয়েছিল ধরলে মুসলিম শরণার্থী হয় মোট মুসলমান জনগোষ্ঠীর ১.২৬ শতাংশ।

ধর্মীয় এই পরিচয় ছাড়া পেশাগতভাবে বিন্যস্ত করলে শরণার্থীদের মধ্যে কিছু বিশেষ প্রবণতা চোখে পড়ে। শরণার্থীদের ৮৫ শতাংশ (প্রায় ৯,৫০,০০০ পরিবার) ছিল কৃষক এবং ভূমিহীন কৃষিশ্রমিক। স্বভাবতই এরা ছিল গ্রামের অধিবাসী। অবশিষ্ট ১৫ শতাংশ ছিল শিল্প শ্রমিক, ছোট ব্যবসায়ী, কারিগর ও শহরের বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষ।[৭] এই পনেরো শতাংশ পেশাজীবীদের অন্তত ৪-৫ শতাংশ গ্রামের অধিবাসী হয়ে থাকবে। ফলে গ্রাম থেকে যাওয়া ৮৫ শতাংশ কৃষিজীবী শরণার্থীর সাথে ৪-৫ শতাংশ অন্য পেশার শরণার্থী যোগ করলে এর পরিমাণ দাঁড়ায় মোট শরণার্থীর প্রায় ৯০ শতাংশ। তৎকালীন গ্রামীণ বাংলাদেশে রাজনীতির সাথে জড়িত থাকা মানুষের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম। বিশেষত গ্রামের অধিকাংশ কৃষিজীবী মানুষের রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষ কোনো যোগ ছিল না। ফলে শরণার্থীদের অধিকাংশই ছিল অরাজনৈতিক মানুষ।

মাগুরখালী ইউনিয়নের শরণার্থীদের সম্প্রদায়গত শ্রেণিকরণ সমগ্র বাংলাদেশের শরণার্থী শ্রেণিকরণের সাথে প্রায় অভিন্ন। মাঠ সমীক্ষার উপাত্ত থেকে জানা যায়, ইউনিয়নের প্রায় ৯৫ শতাংশ মানুষ এ সময়ে শরণার্থী হয়েছিল। পেশাগত দিক দিয়ে এই ইউনিয়নের ৯০ শতাংশের বেশি মানুষ ছিল কৃষক ও কৃষি শ্রমিক। সমগ্র ইউনিয়নে হাতে গোনা কয়েকজন ব্যক্তি ব্যতীত অধিবাসীদের সকলেই ছিল অরাজনৈতিক ব্যক্তি।[৮]

মাগুরখালী ও হাসনাবাদ

খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার একটি ইউনিয়ন মাগুরখালী। ২৩.৯৫ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এই ইউনিয়নে ৩০টি গ্রাম রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে এটি পার্শ্ববর্তী শরাফপুর ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মাগুরখালী ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্বশীল মোট ১০টি গ্রাম কেস স্টাডির আওতায় আনা হয়েছে।

গ্রামগুলো হলো : কাঞ্চন নগর, কাঠালিয়া, গজালিয়া, ঘুরুনিয়া, চণ্ডীপুর, চিত্রামারী, ঝরঝরিয়া, পশ্চিম পাতিবুনিয়া, পূর্ব পাতিবুনিয়া ও মাগুরখালী। আদমশুমারি না হওয়ায় ১৯৭১ সালে ঐ গ্রামগুলোর জনসংখ্যা সম্পর্কে জানা যায় না। ১৯৬১ সালের আদমশুমারি অনুয়ায়ী ঐ ১০ টি গ্রামের মোট জনসংখ্যা ছিল ৩০৮৮ জন।[৯] ইতঃপূর্বে 'শরণার্থী শ্রেণিকরণ' শীর্ষক অনুচ্ছেদে দেখা গেছে, ১৯৬১ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু জনসংখ্যার মোট বৃদ্ধি হয় ২.৩৮ শতাংশ। সমীক্ষাভুক্ত ১০ টি গ্রামের প্রায় ৯৭ শতাংশ অধিবাসী ছিল হিন্দু। ফলে হিন্দু জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এই গ্রামগুলোর ক্ষেত্রে প্রজোয্য হিসেবে গ্রহণ করা যায়। সেক্ষেত্রে ১৯৭১ সালে ঐ ১০টি গ্রামের মোট জনসংখ্যা হয় ৩১৬১।

মাগুরখালী ইউনিয়নের অধিবাসীরা দেশ ত্যাগ করেছিল মূলত বাদুড়গাছি গণহত্যার (১৮ মে ১৯৭১) পর। ঐ দিন ইউনিয়নের পার্শ্ববর্তী বাদুড়গাছি গ্রামের প্রভাবশালী সরদার বাড়ির পাঁচজন গণহত্যার শিকার হন। এই সরদাররা ছিলেন পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষের কাছে অনেকটা অভিভাবকের মতো। বিশেষত মুক্তিযুদ্ধের শুরুর দিকে ডুমুরিয়া থানার অন্যান্য স্থানে যে লুণ্ঠন ও অত্যাচার শুরু হয়েছিল, এই সরদারদের প্রভাবের কারণে বাদুড়গাছি ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় তা হয়নি। এদের নিহত হবার পরদিন থেকেই কাছাকাছি তিন-চারটি ইউনিয়নে ব্যাপক নির্যাতন ও লুণ্ঠন শুরু হয়ে যায়। ফলে এলাকার অধিবাসীরা দেশ ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়।[১০]

হাসনাবাদ হলো ভারতের পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার বশিরহাট মহকুমার একটি থানা সদর। ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসের মধ্যে মাগুরখালী এলাকাটি প্রায় জনশূন্য প্রান্তরে পরিণত হয়েছিল। অন্যদিকে হাসনাবাদ রেল স্টেশনের পার্শ্ববর্তী স্থান প্রায় জনশূন্য প্রান্তর থেকে রাতারাতি শরণার্থীতে পূর্ণ হয়ে যায়। শরণার্থী অধ্যুষিত স্থানটি পরিচিত হয়ে ওঠে মুক্তিযুদ্ধের স্লোগান 'জয় বাংলা' অনুসরণে 'জয় বাংলা বস্তি' নামে।

চিত্র ১ : ১৯৭১ সালে হাসনাবাদ রেল স্টেশনে বাংলাদেশি শরণার্থী। এটি তখন জয় বাংলা বস্তি নামে পরিচিত হয়েছিল।

কেস স্টাডি ১ : মাগুরখালী ইউনিয়ন

প্রধানত গণহত্যা ও শরণার্থী জীবনের দুর্দশার জন্য মাগুরখালী ইউনিয়নের অদিবাসীরা মানবিক বিপর্যয়ের শিকার হয়েছিল। একাত্তরের এপ্রিল-মে মাস থেকে স্থানীয় দুর্বৃত্তদের অত্যাচারে এই বিপর্যয়ের সূচনা হয়। এর ফলে ইউনিয়নের অধিবাসীরা দেশত্যাগ করে ভারতে চলে যেতে থাকে। মাগুরখালী ইউনিয়নের ঘুরুনিয়া গ্রামের শিবপদ মণ্ডল একাত্তরে তাঁর দেশত্যাগের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা থেকে তখনকার বিপর্যয়কর পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা করা যায়। স্থানীয় দুর্বৃত্তদের কার্যকলাপ সম্পর্কে তিনি বলেন :

> "যাদের চিনতাম তারা এমনভাবে কথাবার্তা বলল, যেন তাদের কাছে আমরা অপরিচিত। অথচ একসঙ্গে তারা বাবা কাকাদের সাথে ঘুরে বেড়িয়েছে। চাষের জমি আবাদ করেছে। কোন সমস্যা হলে একসঙ্গে মিটিং করেছে। কিন্তু তাদের উগ্র চেহারা দেখে মনে হবে আমরা তাদের চিরশত্রু ছিলাম। হায়রে আফসার চাচা! বুড়ো মানুষ লাঠি ভর দিয়ে এসেছে। আমার ঠাকুরদাকে দেখে কত সম্মান করত। আর আজ সকালে লাঠি উঁচু করে ঠাকুরদার সঙ্গে তর্ক করতে লাগল। আফসার চাচা ঠাকুরদাকে বলে দিল, "কাকা, বাড়িটা আমরা রাজনীতির স্বার্থে দখল করে নেব।"[১১]

এরপর শিবপদ মণ্ডলের পরিবার দেশত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেয়। বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার সেই মূহূর্ত সম্পর্কে শিবপদ মণ্ডল বলেন,

> "বাড়ির চারিদিকে অসংখ্য লোক দেখে ভেবেছিলাম, আমাদের মেরে ফেলবে। এদের কেউ বাড়ির গরু–ছাগল দখলে নিচ্ছে, কেউ হাড়ি পাতিল নিয়ে যাচ্ছে। কয়েকজন অস্ত্র হাতে মুখ বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কয়েকজন অনেকগুলো বস্তা আমাদের বারান্দায় এনে রাখলো। বুঝলাম, আমাদের ধানের গোলা লুঠ হবে। একজন হঠাৎ চিৎকার করে বললো, 'এই শালার মালাওনের দল, এহনও বাড়ি ছাড়িসনি, জ্যান্ত কবর দেব সব!' তখনই সবাই বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সকালের রান্না করা ভাত হাড়িতেই রয়ে যায়। তক্ষুণি সবাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে।"[১২]

কিন্তু দেশত্যাগ করার সময়ে এই ইউনিয়নের অনেকে পথে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গুলিতে প্রাণ হারায়। বিশেষত চুকনগর গণহত্যায় মাগুরখালী ইউনিয়নের অন্তত ৪১ জন প্রাণ হারায়। এই গণহত্যার শিকার হয়ে কিছু অধিবাসী দেশত্যাগের সিদ্ধান্ত বাদ দিয়ে আবার গ্রামে ফিরে এসেছিল।[১৩] গ্রামে থেকে যাওয়া এই নগণ্য সংখ্যক মানুষ সাধারণত প্রাণ বাঁচানোর জন্য লুকিয়ে থাকতো। তারপরও রাজাকার ও স্থানীয় দুর্বৃত্তদের হাতে তাদের কয়েকজন খুন হয়। নিচের সারণি থেকে এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানা যাবে।

সারণি ২

মাগুরখালীর শহিদদের তালিকা

সংখ্যা	নাম	পিতা	বয়স	গ্রাম	মৃত্যুর স্থান	হত্যাকারী
১.	রাজকৃষ্ণ সরকার	স্বরূপ সরকার	৪৫	শিবনগর	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
২.	মঙ্গল সরকার	রাজকৃষ্ণ সরকার	২০	শিবনগর	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
৩.	মন্মথ রায়	ভরত রায়	৫৪	শিবনগর	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
৪.	প্রমিলা রায়	মন্মথ রায়	১২	শিবনগর	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
৫.	অশ্বিনী রায়	ফকির রায়	৫০	শিবনগর	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
৬.	নারায়ণ রায়	রামচরণ রায়	২০	শিবনগর	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
৭.	কালীপদ সানা	স্বরূপ সানা	৫৫	শিবনগর	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
৮.	গোবিন্দ সানা	কুশিলাল সানা	২৮	শিবনগর	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
৯.	বনমালী সানা	কুশিলাল সানা	২৫	শিবনগর	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
১০.	কুশিলাল সানা	পাঁচু সানা	৫৭	শিবনগর	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
১১.	হরেন্দ্রনাথ সানা	বিহারী সানা	৪০	শিবনগর	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
১২.	সুবোধ সানা	হরষিত সানা	৪২	শিবনগর	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
১৩.	সুশীল সানা	বাগান সানা	১৯	শিবনগর	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
১৪.	অনিল মণ্ডল	পঞ্চরাম মণ্ডল	২১	শিবনগর	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
১৫.	পাচিদাসী রায়	অতুল রায়	৩৮	শিবনগর	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
১৬.	অতুল মণ্ডল	দেবনাথ মণ্ডল	৫৫	শিবনগর	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
১৭.	কালীপদ ঘোষ	নকুল ঘোষ	২৮	শিবনগর	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
১৮.	জিতেন মণ্ডল	চুনিলাল মণ্ডল	৫৮	শিবনগর	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
১৯.	পঞ্চানন মণ্ডল	শুকচাঁদ মণ্ডল	৩৬	শিবনগর	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
২০.	চুনিলাল মণ্ডল	নাম জানা যায়নি	---	শিবনগর	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
২১.	দেবেন রায়	কেশব রায়	২৬	আলাদীপুর	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
২২.	কেশব রায়	কালীচরণ রায়	৫০	আলাদীপুর	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
২৩.	প্রফুল রায়	কালীচরণ রায়	৪৮	আলাদীপুর	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
২৪.	কার্তিক রায়	কালীচরণ রায়	৪৫	আলাদীপুর	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
২৫.	শিবপদ রায়	প্রিয়নাথ রায়	৪২	আলাদীপুর	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
২৬.	নির্মল মণ্ডল	অভিরাম মণ্ডল	৩৬	আলাদীপুর	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
২৭.	অভিরাম মণ্ডল	নাম জানা যায়নি	৫৭	আলাদীপুর	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
২৮.	নিশিকান্ত বালা	চণ্ডীচরণ বালা	৫৫	পূর্ব পাতিবুনিয়া	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
২৯.	ঠাকুরদাস বালা	বিজয় বালা	৫০	পূর্ব পাতিবুনিয়া	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
৩০.	কালীপদ বালা	সতীশ বালা	৪২	পূর্ব পাতিবুনিয়া	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
৩১.	প্রফুল মণ্ডল	যজ্ঞেশ্বর মণ্ডল	৪০	পূর্ব পাতিবুনিয়া	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
৩২.	সাধু মণ্ডল	অরবিন্দ মণ্ডল	০৫	পূর্ব পাতিবুনিয়া	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা

৩৩.	গৌরপদ মণ্ডল	---	---	পূর্ব পাতিবুনিয়া	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
৩৪.	বিষ্ণুপদ মণ্ডল	সুরেন মণ্ডল	২০	পশ্চিম পাতিবুনিয়া	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
৩৫.	বিনোদ সরকার	রাজমোহন সরকার	৬৫	কাঠালিয়া	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
৩৬.	নিমাই সরকার	গোবর্দ্ধন সরকার	৪০	কাঠালিয়া	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
৩৭.	রাজমোহন সরদার	শীতল সরদার	৮০	কাঠালিয়া	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
৩৮.	হরিপদ সানা	শিবরাম সানা	৭০	কাঠালিয়া	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
৩৯.	বিরেন মণ্ডল	কান্তরাম মণ্ডল	৫৬	কাঠালিয়া	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
৪০.	অনিল মণ্ডল	স্বরূপ মণ্ডল	২৮	কাঠালিয়া	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
৪১.	জগবন্ধু গোলদার	মধুসূদন গোলদার	৫৫	মাগুরখালী	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
৪২.	চৈতন্য মলিক	নেপাল মলিক	৫৫	মাগুরখালী	কপিলমুনি	রাজাকার/স্থানীয় দুর্বৃত্ত
৪৩.	বিনোদ বিহারী মোহন্ত	রাজেন্দ্রনাথ মোহন্ত	৫৫	কাঞ্চন নগর	বদরতলা	রাজাকার/স্থানীয় দুর্বৃত্ত
৪৪.	অনিল রায়	নিমাইচাঁদ রায়	৩০	কাঞ্চন নগর	সুন্দরমহল	রাজাকার/স্থানীয় দুর্বৃত্ত
৪৫.	ভগবান রায়	গগন রায়	৫৮	আমুড়বুনিয়া	বারুইকাঠি	রাজাকার/স্থানীয় দুর্বৃত্ত
৪৬.	মহেন্দ্রনাথ মুণি (মুক্তিযোদ্ধা)	যদুবর মুণি	৪৫	নাথেরকুড়	ঘোষনগর	রাজাকার/স্থানীয় দুর্বৃত্ত

উৎস : ২০১১ সালে গবেষকের করা মাঠ সমীক্ষা।

সারণি ২ থেকে দেখা যায়, মাগুরখালী ইউনিয়নের অন্তত নয়টি গ্রামের অধিবাসীরা তখন গণহত্যার শিকার হয়। এছাড়া নির্যাতন ও লুণ্ঠনের শিকার হয় প্রতিটি গ্রাম। দেশত্যাগ করার পরে এখানকার অধিবাসীরা গণহত্যা ও নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পায়। কিন্ত তাতে তাদের প্রাণ রক্ষার নিশ্চয়তা তৈরি হয় না। ভারতের শরণার্থী শিবিরের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া, অপুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবার অপ্রতুলতার কারণে বহু মানুষ সেখানে মৃত্যুবরণ করে। বস্তুত, গণহত্যার কারণে মাগুরখালী ইউনিয়নের যতো মানুষ খুন হয়েছিল, শরণার্থী জীবনে তারও বেশি মানুষ মৃত্যুবরণ করে। মাঠ সমীক্ষা থেকে এই ইউনিয়নের ১০টি গ্রামের অধিবাসীদের শরণার্থী শিবিরে মৃত্যুর হার জানা যায়। নিচের সারণিতে সমীক্ষায় প্রাপ্ত উপাত্ত উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৩

শরণার্থী শিবিরে মৃত্যুবরণকারী মাগুরখালী ইউনিয়নের শরণার্থী

সংখ্যা	নাম ও বয়স	পিতার নাম	গ্রাম	শরণার্থী শিবির	মৃত্যুর কারণ
১.	আরতি মণ্ডল (০৭)	গৌর মণ্ডল	পূর্ব পাতিবুনিয়া	মানা	কলেরা
২.	রমেশ মণ্ডল (১০)	গৌর মণ্ডল	ঐ	বারাশাত	কলেরা
৩.	অভয়চরণ বালা (৫৩)	নবীন চন্দ্র বালা	ঐ	গয়া	কলেরা
৪.	ভজন বালা (৬৬)	নবীন চন্দ্র বালা	ঐ	গয়া	কলেরা
৫.	রঞ্জিতা বালা (০৫)	অভয়চরণ বালা	ঐ	গয়া	কলেরা
৬.	কার্তিক বালা (০৬)	জগন্নাথ বালা	ঐ	গয়া	কলেরা
৭.	পঞ্চানন বালা (০৮)	বিনোদ বালা	ঐ	গামারবুনিয়া	কলেরা

৮.	মঞ্জুলিকা বালা (০৫)	বিলাস বালা	ঐ	গামারবুনিয়া	কলেরা
৯.	পাঁচু মণ্ডল (০৬)	রাধাকান্ত মণ্ডল	ঐ	পঞ্চাননপুর	কলেরা
১০.	বনিতা বিশ্বাস (০৬)	হরিপদ বিশ্বাস	ঐ	ব্যাকি	কলেরা
১১.	সুফলা বালা (০৫)	শুকলাল বালা	ঐ	জগন্নাথপুর	কলেরা
১২.	মুক্তরাম মণ্ডল (৭৭)	সীতেরাম মণ্ডল	পশ্চিম পাতিবুনিয়া	মানাভাটা	কলেরা
১৩.	কামিনীদাসী মণ্ডল (৭০)	গোবিন্দ মণ্ডল	ঐ	বারাশত	কলেরা
১৪.	মহাদেব মণ্ডল (০৫)	ফণিন্দ্রনাথ মণ্ডল	ঐ	মানাভাটা	কলেরা
১৫.	মঞ্জু রায় (০৫)	নিতাই রায়	ঐ	মেদিনীপুর	কলেরা
১৬.	মালতি সরদার (০৫)	প্রফুল সরদার	ঐ	সল্টলেক	কলেরা
১৭.	আহ্লাদি সরদার (৭০)	বাঁশিরাম মণ্ডল	ঐ	সল্টলেক	কলেরা
১৮.	হাজরাপদ রায় (০৫)	জ্যোতিষ রায়	ঐ	নীলগঞ্জ	কলেরা
১৯.	রানী সানা (০৫)	মনোরঞ্জন সানা	ঐ	গোবিন্দপুর	কলেরা
২০.	নিবারন মণ্ডল (৮০)	প্রহ্লাদ মণ্ডল	কাঠালিয়া	গামারবুনিয়া	কলেরা
২১.	গোলাপী মণ্ডল (৭০)	শ্যামাচরণ	ঐ	মানাভাটা	কলেরা
২২.	পাঁচীদাসী সরকার (৭৮)	যুধিষ্ঠির বৈদ্য	ঐ	মানাভাটা	কলেরা
২৩.	সুনীল মণ্ডল (২০)	বিপিন মণ্ডল	ঐ	মানাভাটা	কলেরা
২৪.	নিখিল সরকার (০৬)	অভিমন্যু সরকার	ঐ	মানাভাটা	কলেরা
২৫.	সত্যবতী মণ্ডল (৭০)	উত্তম গোলদার	ঐ	নওগা	কলেরা
২৬.	নীলু মণ্ডল (১০)	ননীগোপাল মণ্ডল	ঐ	নওগা	কলেরা
২৭.	সুভাষ মণ্ডল (০৭)	ননীগোপাল মণ্ডল	ঐ	নওগা	কলেরা
২৮.	সুমতি মণ্ডল (০৫)	হরিদাস মণ্ডল	ঐ	কুরুথ	কলেরা
২৯.	পঞ্চানন রায় (৫৭)	রাজেন্দ্র রায়	ঐ	স্বরূপনগর	কলেরা
৩০.	পাচিদাসী রায় (৪৩)	ফুলচাঁদ মণ্ডল	ঐ	স্বরূপনগর	কলেরা
৩১.	ঊষা রায় (০৮)	পঞ্চানন রায়	ঐ	স্বরূপনগর	কলেরা
৩২.	সুকুমার রায় (০৬)	পঞ্চানন রায়	ঐ	স্বরূপনগর	কলেরা
৩৩.	ব্রজলাল সানা (৬৬)	শিবরাম সানা	ঐ	নওগা	কলেরা
৩৪.	নির্মলা সানা (৪৭)	রাজেন্দ্র সানা	ঐ	নওগা	কলেরা
৩৫.	ব্যালতা সানা (৭৬)	ত্রৈলোক্য সানা	ঐ	নওগা	কলেরা
৩৬.	তুলসী মলিক (০৫)	রামপদ মলিক	ঐ	সল্টলেক	কলেরা
৩৭.	নমিতা সানা (৭০)	দ্বারিক সরদার	ঐ	সল্টলেক	কলেরা
৩৮.	বিধান সানা (১০)	দুলাল সানা	ঐ	সল্টলেক	কলেরা
৩৯.	মায়া রানি সরকার (০৬)	যোগেন্দ্র সরকার	মাগুরখালী	নওগা	জ্বর
৪০.	ইছামতি মণ্ডল (৬৫)	ভজহরি মণ্ডল	ঐ	নওগা	অপুষ্টি
৪১.	সুভদ্রা মণ্ডল (৪৫)	ভূপেন মণ্ডল	ঐ	নওগা	গ্যাস্ট্রিক
৪২.	সরো রানী মণ্ডল (৫৫)	ফকির মণ্ডল	ঐ	নওগা	বাতজ্বর
৪৩.	প্রলয় বাইন (০৪)	হাজরা বাইন	ঐ	বশিরহাট	পেটব্যথা

৪৪.	কাঞ্চন সরকার (৬৭)	হরেন্দ্র সরকার	ঐ	বশিরহাট	হাম
৪৫.	টুপলি সরকার (৬২)	প্রহ্লাদ সরকার	ঐ	নওগা	বসন্ত
৪৬.	পঁচা সরকার (০৬)	চণ্ডীচরণ সরকার	ঐ	নওগা	আমাশয়
৪৭.	পুটু সরকার (০৪)	চণ্ডীচরণ সরকার	ঐ	নওগা	আমাশয়
৪৮.	গান্ধারী মণ্ডল (৬৫)	পঞ্চরাম মণ্ডল	ঐ	নওগা	টি.বি.
৪৯.	ভগবান মণ্ডল (৩৩)	সনাতন মণ্ডল	ঐ	নওগা	ট্রমা
৫০.	রাজেন্দ্র মণ্ডল (৫০)	বসন্ত মণ্ডল	ঐ	পাঁচপোতা	ট্রমা
৫১.	সরস্বতী মণ্ডল (৪২)	সন্তোষ মণ্ডল	ঐ	পাঁচপোতা	টি.বি.
৫২.	বাবুরাম মণ্ডল (৬৩)	গৌর মণ্ডল	ঐ	কুরুথ	অপুষ্টি
৫৩.	তারা রানি মণ্ডল (৪৫)	জ্যোতিষ মণ্ডল	ঐ	পাঁচপোতা	টি.বি.
৫৪.	কামিনী মোহন্ত (৪৫)	মতিলাল মোহন্ত	কাঞ্চন নগর	সল্টলেক	আমাশয়
৫৫.	নির্মল মোহন্ত (২৫)	রামলাল মোহন্ত	ঐ	সল্টলেক	আঘাত
৫৬.	সরস্বতী মোহন্ত (৭০)	রাজেন্দ্র মোহন্ত	ঐ	সল্টলেক	আমাশয়
৫৭.	রঙ্গদাসী মণ্ডল (৫৮)	রাজকুমার মণ্ডল	ঐ	সল্টলেক	ট্রমা
৫৮.	সুনীল মণ্ডল (০৮)	কালীপদ মণ্ডল	ঐ	সল্টলেক	আমাশয়
৫৯.	রঞ্জিতা সরকার (০৩)	গুরুচরণ সরকার	ঐ	বারাশাত	জ্বর
৬০.	লক্ষ্মী রানি সরদার (৭০)	পাঁচু সরদার	ঐ	সল্টলেক	জ্বর
৬১.	অনাদী মণ্ডল (০৬)	নগেন মণ্ডল	চণ্ডীপুর	সল্টলেক	জ্বর
৬২.	মাধব মণ্ডল (৫৩)	উমেশ মণ্ডল	ঐ	রানাঘাট	আঘাত
৬৩.	বাঁশিরাম মণ্ডল (৫০)	দ্বারিক মণ্ডল	ঐ	দমদম	ট্রমা
৬৪.	সুশান্ত মণ্ডল (০৩)	নির্মলকান্তি মণ্ডল	ঐ	গোপালপুর	আমাশয়
৬৫.	স্বরূপ মল্লিক (৭৪)	চন্দ্রকান্ত মল্লিক	ঐ	সল্টলেক	ট্রমা
৬৬.	সরস্বতী মণ্ডল (৪৫)	অশ্বিনী মণ্ডল	ঐ	সল্টলেক	বসন্ত
৬৭.	হিমাংশু বাছাড় (০৩)	মনোহর বাছাড়	ঐ	সাহারা	আমাশয়
৬৮.	ঠাণ্ডা মণ্ডল (৫০)	সারদা মণ্ডল	ঐ	সল্টলেক	আমাশয়
৬৯.	ময়না মণ্ডল (০৯)	সখিচরণ মণ্ডল	ঐ	সল্টলেক	আমাশয়
৭০.	পঞ্চানন বালা (৬২)	পাঁচুরাম বালা	ঐ	সল্টলেক	আমাশয়
৭১.	সরস্বতী বালা (৪২)	পঞ্চানন বালা	ঐ	সল্টলেক	আমাশয়
৭২.	পারবল বালা (৪৫)	নিমাই বালা	ঐ	সল্টলেক	আমাশয়
৭৩.	খাইরবল বালা (০৮)	পঞ্চানন বালা	ঐ	সল্টলেক	আমাশয়
৭৪.	রঞ্জিতা মণ্ডল (০২)	নগেন মণ্ডল	ঐ	সল্টলেক	জ্বর
৭৫.	কাঞ্চন মণ্ডল (৫৮)	অভিলাষ মণ্ডল	ঐ	রানাঘাট	বসন্ত
৭৬.	হাজারীলাল বাইন (৬৫)	কনেক বাইন	ঝরঝরিয়া	বারাশাত	আমাশয়
৭৭.	রবহিদাস বাইন (০৭)	হাজারীলাল বাইন	ঐ	বারাশাত	আমাশয়
৭৮.	হাজারী সানা (৭২)	ফটিক সানা	ঐ	বর্ধমান	আমাশয়
৭৯.	সতীশ সানা (১.৫)	ধীরেন সানা	ঐ	মেদিনীপুর	আমাশয়

৮০.	মণীন্দ্র বাইন (০৪)	নাম জানা যায়নি	ঐ	বারাশাত	আমাশয়
৮১.	সরলা সরকার (৪৫)	নিরাপদ সরকার	ঐ	স্বরূপনগর	গা ফুলো
৮২.	অমর সরকার (০.৫)	নিরাপদ সরকার	ঐ	হার্দুয়া	আমাশয়
৮৩.	লক্ষ্মী রায় (২০)	রসময় রায়	ঘুরবনিয়া	মানা	কলেরা
৮৪.	প্রশান্ত মণ্ডল (০৩)	গোলক মণ্ডল	ঐ	সল্টলেক	অপুষ্টি
৮৫.	রাজকুমার রায় (৬৫)	চন্দ্রকান্ত রায়	ঐ	নওগা	আমাশয়
৮৬.	সুভাষ মণ্ডল (০৭)	কৃষ্ণপদ মণ্ডল	ঐ	নওগা	কলেরা
৮৭.	যমুনা মণ্ডল (০৫)	কৃষ্ণপদ মণ্ডল	ঐ	নওগা	অপুষ্টি
৮৮.	প্রভাত মণ্ডল (০৩)	কৃষ্ণপদ মণ্ডল	ঐ	নওগা	অপুষ্টি
৮৯.	বাসন্তী মণ্ডল (০১)	কৃষ্ণপদ মণ্ডল	ঐ	নওগা	আমাশয়
৯০.	খুকুমণি বৈরাগী (০৩)	অজিত বৈরাগী	চিত্রামারী	মেদিনীপুর	কলেরা
৯১.	সাজু রায় (০৫)	প্রফুল্ল রায়	ঐ	আমপাড়া	কলেরা
৯২.	রেবা মণ্ডল (০২)	অখিল মণ্ডল	ঐ	কেওসা	কলেরা
৯৩.	দিলীপ মণ্ডল (০৪)	নিখিল মণ্ডল	ঐ	কেওসা	কলেরা
৯৪.	সুনিতা মণ্ডল (০২)	নিখিল মণ্ডল	ঐ	কেওসা	কলেরা
৯৫.	পাঁচু মণ্ডল (০৩)	অনিল মণ্ডল	ঐ	সরুলিয়া	আঘাত
৯৬.	রবীন মণ্ডল (০৫)	কালীপদ মণ্ডল	ঐ	ধর্মতলা	কলেরা
৯৭.	ভাদ্দরী সরকার (৫৫)	মহাদেব সরকার	ঐ	গোবিন্দপুর	কলেরা
৯৮.	রাজেন্দ্র বৈরাগী (৭৫)	পারশ বৈরাগী	গজালিয়া	অশোকনগর	কলেরা
৯৯.	খুকু রানি বৈরাগী	মণীন্দ্র বৈরাগী	ঐ	বৃন্দাবন	কলেরা
১০০.	কালীচরণ সানা (৮১)	বিদুর সানা	ঐ	অশোকনগর	কলেরা
১০১.	পারবল সানা (৩৮)	শম্ভুনাথ রায়	ঐ	মানা	কলেরা
১০২.	স্বপন সানা (১২)	অতুল কৃষ্ণ সানা	ঐ	মানা	কলেরা
১০৩.	বিপাশা সানা (০১)	অতুল কৃষ্ণ সানা	ঐ	মানা	কলেরা
১০৪.	আরতি বৈরাগী (১২)	কালীপদ বৈরাগী	ঐ	কেওসা	কলেরা
১০৫.	সুধন্য বৈরাগী (৬০)	শিশুবর বৈরাগী	ঐ	অশোকনগর	কলেরা
১০৬.	খোকন বৈরাগী (০৬)	সুধন্য বৈরাগী	ঐ	অশোকনগর	কলেরা
১০৭.	পাচি বৈরাগী (৭২)	নাম জানা যায়নি	ঐ	অশোকনগর	কলেরা
১০৮.	পচি বৈরাগী (৪০)	হরিশ বৈরাগী	ঐ	অশোকনগর	কলেরা

উৎস : ২০১১ সালে গবেষকের করা মাঠ সমীক্ষা।

সারণি ৩ থেকে দেখা যায়, ইউনিয়নের ১০টি গ্রামের শরণার্থীদের মধ্যে ১০৮ জন মৃত্যুবরণ করে। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ঐ দশটি গ্রামের লোকসংখ্যা ছিল ৩১৬১ জন। এর মধ্যে শুধু শরণার্থী শিবিরে মারা যায় ১০৮ জন। অর্থাৎ গড়ে ছয় মাস (জুন থেকে নভেম্বর) সময়ে শরণার্থী শিবিরে ঐ গ্রামগুলোর ৩.৪২% মানুষ মারা যায়।

১৯৬১ সালে মাগুরখালী ইউনিয়নের জনসংখ্যা ছিল ৬৩০০ জন।[১৪] ১৯৭১ সালে ইউনিয়নের মোট জনসংখ্যার কোনো পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। এই সময়ে ইউনিয়নের মোট অনুমিত জনসংখ্যা ৭০০০ ধরলে এবং সমীক্ষায় প্রাপ্ত ১০টি গ্রামের শরণার্থী মৃত্যুর হার অনুসরণ করলে সমগ্র ইউনিয়নে মোট মৃত্যুবরণকারী শরণার্থী হয় ২৩৯ জন। সারণি ২ থেকে দেখা গেছে যে, গণহত্যায় এই ইউনিয়নের অন্তত ৪৬ জন প্রাণ হারিয়েছিল। অর্থাৎ গণহত্যা এবং শরণার্থী শিবির মিলিয়ে এই ইউনিয়নে অন্তত ২৮৫ জন মানুষ নিহত হয়েছিল, শতকরা হিসেবে যা মোট অধিবাসীর ৪.০৭%। গণহত্যা ও শরণার্থী শিবিরে মৃত্যুবরণকারীদের সংখ্যা একত্র করলে চিত্রটি হয় নিম্নরূপ :

সারণি ৪

মুক্তিযুদ্ধে নিহত মাগুরখালী ইউনিয়নের অধিবাসী

নিহতের কারণ	সংখ্যা	শতকরা হার
গণহত্যা	৪৬	০.৬৫%
শরণার্থী শিবিরের দুর্দশা	২৩৯	৩.৪২%
মোট নিহত	২৮৫	৪.০৭%

সারণি ৪ থেকে নিহতের যে সংখ্যা পাওয়া যায়, মুক্তিযুদ্ধকালীন মানবিক বিপর্যয়ের তা এক আংশিক রূপ মাত্র। ইউনিয়নের প্রায় ৯৫ শতাংশ পরিবারের যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি এ সময়ে লুণ্ঠিত হয়।[১৫] বেশ কিছু নারী নির্যাতনের ঘটনাও ঘটে। ঘুরুনিয়া ও পশ্চিম পাতিবুনিয়া গ্রামের দুজন নারীকে পার্শ্ববর্তী এলাকার দুর্বৃত্তরা অপহরণ করে প্রায় দশদিন আটকে রেখেছিল।[১৬] যে অল্প কয়েকজন মানুষ বিচ্ছিন্নভাবে গ্রামে পালিয়ে অবস্থান করছিল, তাদের কয়েকজনের জোরপূর্বক ধর্মান্তরও করা হয়। ইউনিয়নের লাঙলমোড়া গ্রামের একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যায়। শান্তিরাম সাধু নামক ঐ গ্রামের একজন অধিবাসী ভারতে না গিয়ে দেশে থেকে গিয়েছিলেন। ঐ এলাকায় তার বেশকিছু জমিজমাও ছিল। এই খবর রাজাকাররা জানতে পারে এবং তার জমি দখল করার পায়তারা করতে থাকে। একপর্যায়ে রাজাকাররা তাকে হুমকি দেয়, 'পাকিস্তানে থাকতে গেলে মুসলমান হয়েই থাকতে হবে, নইলে পরিণতি হলো মৃত্যু'। প্রাণভয়ে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং নিয়মিত নামাজ পড়তে থাকেন।[১৭]

শরণার্থী শিবিরে মানবিক বিপর্যয় ছাড়াও সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও নেমে এসেছিল বহুমুখী বিপর্যয়। এই বিপর্যয়ের একটি নমুনা হিসেবে ইউনিয়নের শিবনগর গ্রামের জিতেন্দ্রনাথ সানার পরিবারটির শরণার্থী জীবন আলোচনা করা হলো।

জিতেন্দ্রনাথ সানার পরিবার (শিবনগর, মাগুরখালী, ডুমুরিয়া, খুলনা, বাংলাদেশ)

শিবনগর গ্রামের জিতেন্দ্রনাথ সানা ও গুরুদাসী সানা দম্পতির পরিবার ১৯৭১ সালের মে মাসে ভারতে চলে যায়। এই দম্পতির সাথে ছিল তাঁদের দুইটি সন্তান কালী রানি সানা এবং প্রশান্ত সানা। শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় গ্রহণের কিছুদিন পরে কালী রানির সাথে পার্শ্ববর্তী আরেকটি শিবিরের

শরণার্থী কৃষ্ণপদ রায়ের বিবাহ হয়। দেশে থাকতেই সম্বন্ধ ঠিক করা ছিল। এই সময়ে ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গ থেকে অন্য প্রদেশে শরণার্থী সরিয়ে নিচ্ছিল। কৃষ্ণপদ রায়ের পারিবারের উত্তর প্রদেশে চলে যাওয়ার নির্দেশ আসে। ফলে বিয়ের ঠিক পরদিন কৃষ্ণপদ রায়ের সাথে কালী উত্তর প্রদেশে চলে যায়। জিতেন্দ্রনাথের পরিবার শুধু জানতো, তাঁদের মেয়ে-জামাই উত্তর প্রদেশের শরণার্থী ক্যাম্পে যাচ্ছে। কিন্তু ক্যাম্পের কোনো ঠিকানা তাদের জানা ছিল না। কিছুদিন পরে জিতেন্দ্রনাথ দম্পতি মধ্য প্রদেশের একটি শরণার্থী ক্যাম্পে প্রতিস্থাপিত হন। এরপর কন্যা কালীর সাথে তাদের বিচ্ছেদ চিরস্থায়ী রূপ নেয়। ভারত সরকার শরণার্থীদের জন্য বিনামূল্যে জমি দিচ্ছে, লোকমুখে এমন একটি খবর শুনে জিতেন্দ্রনাথ মধ্য প্রদেশ থেকে চলে যান অন্ধপ্রদেশের আদিলাবাদ জেলায়। সেখানে তিনি কাগজনগর এলাকার একটি শরণার্থী কলোনিতে বসবাস করতে থাকেন।[১৮] দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে জিতেন্দ্রনাথের পরিবার আর দেশে ফিরে আসেননি। বর্তমানে তাঁর সেই শরণার্থী শিশুপুত্র প্রশান্ত সানা সেখানেই সপরিবারে বসবাস করছেন।[১৯]

অন্যদিকে কালী রানিও দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে আর দেশে ফিরে আসেননি। স্বামী কৃষ্ণপদর সাথে পরিবার নিয়ে স্থায়ী হয় উত্তর প্রদেশের পিলিবিড জেলায়। সেখানে বর্তমানে (২০১৪) চরম দারিদ্র্যের মধ্যে তার পরিবার জীবন অতিবাহিত করছে। এই দুই পরিবারের সাথে কখনও আর কোনো যোগাযোগ হয়নি। কালী রানির পিতা-মাতা তাঁদের জীবদ্দশাতে হারিয়ে যাওয়া এই মেয়ের কোনো খোঁজ পাননি।[২০] মুক্তিযুদ্ধের নয়টি মাস এমন অনেক চির বিচ্ছেদের জন্ম দিয়েছে? সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এ এক বিস্ময়কর বিপর্যয় বৈকি!

কেস স্টাডি ২ : হাসনাবাদ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ভারতের যেসব এলাকা সর্বপ্রথম শরণার্থীতে পূর্ণ হয়ে যায়, হাসনাবাদ তার অন্যতম। তৎকালীন চব্বিশ পরগণা জেলার শরণার্থী ক্যাম্পগুলোর তালিকায় এই ক্যাম্পটির নাম রয়েছে প্রথমে।[২১] সাতক্ষীরা সীমান্তের পশ্চিমে মাত্র এক কিলোমিটারের মধ্যে হাসনাবাদের অবস্থান হওয়ায় এপ্রিল মাস থেকেই এখানে শরণার্থী অনুপ্রবেশ শুরু হয়ে যায়। মে মাসের শেষার্ধে হাসনাবাদ রেল স্টেশন সংলগ্ন ফাঁকা জায়গা শরণার্থীদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়। রেল স্টেশন সংলগ্ন জয় বাংলা বস্তিতে সেসময় আনুমানিক ৩০০০ শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছিল বলে জানা যায়।[২২] রেল স্টেশন থাকায় স্থানটি সে সময়ে শরণার্থী ট্রানজিট রুটে পরিণত হয়েছিল। ফলে সব সময়ই এখানে ভিড় ও জনদুর্ভোগ লেগে থাকতো। শরণার্থীরা এখানে খড়, বাঁশ, গাছের ডালপালা ব্যবহার করে যে অস্থায়ী আবাস নির্মাণ করেছিল (চিত্র ১ দ্রষ্টব্য), সেই ঘরগুলোই পরবর্তী কালে জয় বাংলা বস্তিতে রূপান্তরিত হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরবর্তী দুই-তিন বছর এখানে অন্তত বিশটি শরণার্থী পরিবার থেকে গিয়েছিল বলে জানা যায়। এরা সকলেই ছিল তৎকালীন বৃহত্তর খুলনা জেলার বাসিন্দা।[২৩]

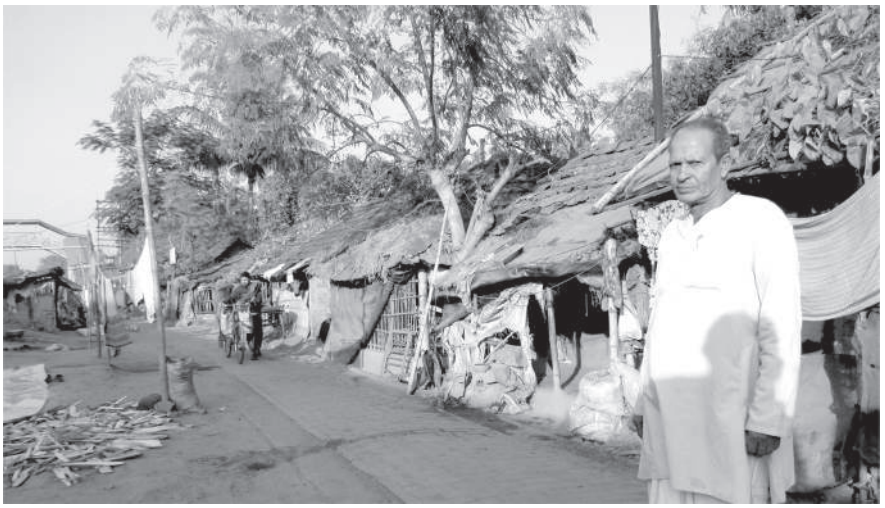

চিত্র ২ : ২০১৪ সালে জয় বাংলা বস্তি/কলোনি। কলোনির সভাপতি কার্তিক ব্যানার্জীর সাথে বস্তির চিত্র (২০১৪ খ্রি.)

২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে মাঠ সমীক্ষার সময়ে এই বস্তিতে অন্তত চারটি পরিবারের সন্ধান পাওয়া যায়, যারা ছিল ১৯৭১ সালের শরণার্থী। কয়েকটি শরণার্থী পরিবার ঐ বস্তি ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেছে বলেও জানা যায়। সমীর সরকার ও রতন মাঝি নামক দুইজন শরণার্থীর পরিবার তখনও (২০১৪ খ্রি.) বস্তিতে বাস করছিল। এর মধ্যে সমীর সরকার মৃত্যুবরণ করায় তার সাক্ষাৎকার গ্রহণ সম্ভব ছিল না। নিম্নে রতন মাঝির জীবনের মানবিক বিপর্যয়ের ঘটনা বর্ণনা করা হলো।

রতন মাঝির পরিবার (হাসনাবাদ, জয়বাংলা বস্তি, উত্তর চব্বিশ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত)

রতন মাঝির জন্ম হয়েছিল খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার বাগালী ইউনিয়নের বামিয়া নামক গ্রামে। জন্মসূত্রে তিনি ছিলেন কৃষিজীবী পরিবারের সন্তান। কৃষিকাজ, মাছধরা, মাদুর বোনা ও শ্রম বিক্রি করা ছিল এই পরিবারটির পেশা। রাজনীতির সাথে রতন মাঝির পরিবারের কোনো সংশ্রব ছিল না। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে স্থানীয় দুর্বৃত্তদের লুঠপাট আর সন্ত্রাসের কারণে তিনি দেশত্যাগ করে কিছুদিন হাসনাবাদ রেল স্টেশনে আশ্রয় নেন। এরপর সেখান থেকে চলে যান কলকাতার সন্নিকটে সল্টলেক শরণার্থী শিবিরে। সল্টলেকে তিনি ডিসেম্বর পর্যন্ত অবস্থান করেন। ডিসেম্বরে দেশ মুক্ত হলে তিনি ও তার পরিবার কয়রায় গ্রামের বাড়িতে ফিরে আসেন। কিন্তু গ্রামে ফিরে দেখেন, বাড়িঘর কিছুই আর অবশিষ্ট নেই, রাজাকাররা তার বাড়িঘর সব লুঠ করে নিয়ে গেছে। এলাকায় তখন চরম খাদ্যাভাব, শ্রম বিক্রি করার মতো কোনো জায়গা নেই। অন্যদিকে লুণ্ঠিত মালামালের মালিক হয়ে রাজাকাররা তখন স্বাচ্ছন্দ্যে প্রভাব-প্রতিপত্তি নিয়ে এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। রতন

মাঝিকে রাজাকাররা মাঝে মাঝে বলতো, "চলে গিয়েছিলে, আবার ফিরে আসলে কিসের আশায়? এখনও সময় আছে, চলে যাও।"

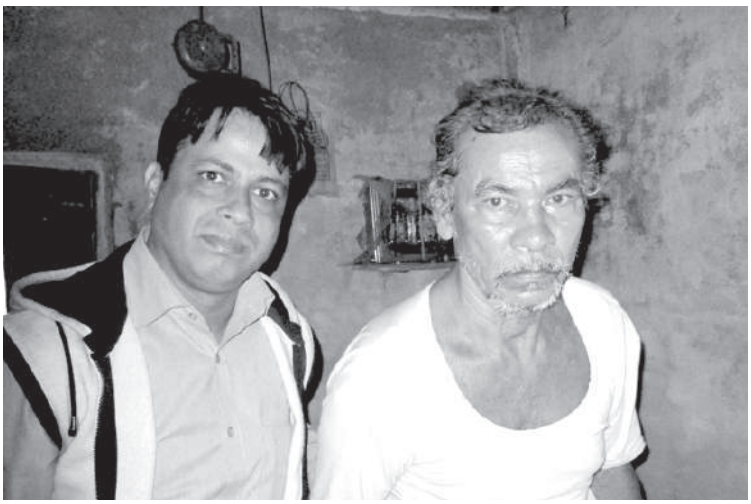

চিত্র ৩ : জয় বাংলা বস্তিতে রতন মাঝির সাথে গবেষক (২০১৪ খ্রি.)

এভাবে নিরাপত্তাহীনতার মুখোমুখি হয়ে তিনি দুই-মাস নিজ গ্রামে থেকে আবার ভারতে চলে যান। ততদিনে ভারতে শরণার্থীদের জন্য ত্রাণ কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে।[২৪] ফলে তাদের জন্য ভারতের পক্ষ থেকে তখন কোনো সাহায্য বা সহানুভূতি ছিল না। অনন্যোপায় হয়ে তিনি আশ্রয় নেন হাসনাবাদ রেল স্টেশনের জয় বাংলা বস্তিতে। প্রথমে সেখানে রাস্তার পাশে একটি কুঁড়ে বেঁধে পরিবার নিয়ে বসবাস করতে থাকেন। সেই সময় থেকে নিরক্ষর ও শ্রমজীবী এই মানুষটি তার পরিবার নিয়ে ঐ বস্তিতে বাস করছেন (২০১৪ খ্রি.)।[২৫]

হাসনাবাদের কিছু ঘটনা থেকে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধ সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া যায়।[২৬] বিশেষত পাকিস্তানের অভ্যন্তরে নারীদের উপরে যে পাশবিক নির্যাতন হচ্ছে, তার কিছু প্রমাণ হাসনাবাদে মেলে। শরণার্থী শিবিরে সেবামূলক কাজে ব্যাপৃত ফাদার হ্যাস্টিংস নামক এক যাজকের বর্ণনায় এ সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়। হাসনাবাদে দায়িত্ব পালন করার সময়কার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে তিনি বলেন, "যেসব মহিলা ধর্ষণের [পাকিস্তানি সেনা অথবা তাদের সহযোগীদের দ্বারা] ফলে গর্ভবতী হয়েছিল তাদের মধ্যে অনেকে হাসনাবাদে গাছের ডালে দড়ি বেঁধে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। অন্যরা গর্ভপাত ঘটায়। আর যারা গর্ভপাত ঘটাতে ব্যর্থ হয় তারাও আত্মহত্যা করে।"[২৭]

উপসংহার

মুক্তিযুদ্ধের সময়ে এবং এর অব্যবহিত আগে ও পরে যে বহুমুখী ধারার মানবিক বিপর্যয় সংঘটিত হয়েছিল, উপরের আলোচনা তার একটি প্রক্ষেপণ মাত্র। এই আলোচনা থেকে মুক্তিযুদ্ধের বিপুল মানবিক অভিঘাত সম্পর্কে কিছু ধারণা পাওয়া যায়। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে দেশের অভ্যন্তরে গণহত্যা ও অন্যান্য মানবতাবিরোধী অপরাধে যেমন বহু মানুষকে প্রাণ দিতে হয়, দেশত্যাগ করে ভারতে যাওয়ার পরে সেখানকার বিপর্যয়কর পরিবেশেও অসংখ্য মানুষকে প্রাণ দিতে হয়। সন্দেহ নেই, বিপুল এই মানবিক বিপর্যয় ও প্রাণের মূল্যে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। রাজনীতি থেকে দূরে অবস্থান করা মানুষের এই আত্মদান স্বভাবতই পরিবার ও সমাজে এক মর্মন্তুদ অভিঘাত সৃষ্টি করেছিল। স্বাধীনতার চার যুগ পরেও অসংখ্য সাধারণ মানুষ সে অভিঘাতের ফল বয়ে বেড়াচ্ছেন।

অন্তটীকা

১. মাগুরখালী ও পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নে মাঠ সমীক্ষা থেকে এই তথ্য জানা গেছে। এছাড়া দেখুন শিবপদ মন্ডল, অন্তঃক্ষরণ (ঢাকা : চন্দ্রছাপ প্রকাশনী, ২০১৪), পৃঃ. ১২।

২. ভাবানুবাদ লেখকের। মূল ইংরেজি : "Owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group, or political opinion, is outside the country of his nationality and unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country, or who, not having nationality and being outside of the country of his former habitual residence, is unable or owing to such fear, is unwilling to return to it. "www.unhcr.org.au/basicdef.shtml, accessed on 6 August 2009.

৩. *Encyclopedia of Britanica* (1981), s.v. "Refugee."

৪. অনুবাদ লেখকের। মূল টেক্সট : "A Refugee is : a. Any person who is outside his or her country is unable or unwilling to return to, and is unable or unwilling to avail himself or herself of the protection of that country because of well founded fear of persecution on account of race, religion, sex, nationality, ethnic identity, membership of a particular social group or political opinion, or, b. Any person who owing to external aggression, occupation, foreign domination, serious violation of human rights or other events seriously disrupts public order in either part or whole of his or her country of origin, is compelled to leave his or her place of habitual residence in order to seek refugee in another place outside his or her country." কর্মশালায় গৃহীত এই সংজ্ঞাটির জন্য দ্রষ্টব্য, Udbastu, Issue 3, December 1997 (Dhaka: 1997), pp. 2-3.

৫. হাসান হাফিজুর রহমান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, ৮ম খণ্ড (ঢাকা : তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮৪), পৃঃ. ৬৯০।

৬. এছাড়া ১৯৬১ সালে বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ অন্যান্য সম্প্রদায়ের অধিবাসী ছিল ৫,৭০,০০০ জন; ১৯৭৪ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৭,৬৬,০০০ জনে।

৭. Kalyan Chaudhuri, *Genocide in Bangladesh* (Kolkata, Orient Longman, 1972), p. 77.

৮. ২০১১ সালে মাগুরখালী ইউনিয়নে প্রাবন্ধিকের করা একটি মাঠ সমীক্ষায় শরণার্থীদের এই হার জানা যায়।

৯. ১৯৬১ সালের আদমশুমারি রিপোর্টের জেলা সিরিজ (খুলনা)।

১০. এই গণহত্যায় পুলিন সরদার, দয়াল সরদার, অনন্ত সরদার, বিষ্ণুপদ সরদার ও পদ্মরানি সরদার নিহত হন। সাক্ষাৎকার, রণজিৎ সরদার (ভাইস চেয়ারম্যান, ডুমুরিয়া উপজেলা, খুলনা), ৮ ডিসেম্বর ২০১০।

১১. শিবপদ মণ্ডল, *প্রাগুক্ত*।

১২. সাক্ষাৎকার, শিবপদ মণ্ডল (ঘুরুনিয়া, ডুমুরিয়া), ২৯ মার্চ ২০১৫।

১৩. পার মাগুরখালী গ্রামের হরিপদ মণ্ডল চুকনগর গণহত্যা থেকে বেঁচে গিয়ে আবার গ্রামে ফিরে এসেছিলেন। সাক্ষাৎকার, হরিপদ মণ্ডল (পার মাগুরখালী, ডুমুরিয়া, খুলনা), ৪ আগস্ট ২০১৫।

১৪. ১৯৬১ সালের আদমশুমারি রিপোর্টের জেলা সিরিজ (খুলনা)।

১৫. এসব পরিবারের যাবতীয় গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি, পুকুরের মাছ, গোলার ধান, হাড়ি কড়াই-সহ যাবতীয় তৈজসপত্র, গৃহস্থালীর আসবাব, নিত্য ব্যবহার্য পারিবারিক দ্রব্যাদি, নৌকা, গাছের ফল, কৃষি যন্ত্রপাতি এমনকি ঘরের দরজা-জানালা প্রভৃতি এ সময়ে লুঠ হয়ে যায়। পাশাপাশি কিছু স্থাবর সম্পত্তিও বেদখল হয়ে যায়।

১৬. এই দুই নারী বার্ধক্যজনিত কারণে প্রয়াত হয়েছেন। তাঁদের নাম পরিচয় গোপন রাখা হলো।

১৭. সাক্ষাৎকার, বদরু মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান (তালা, সাতক্ষীরা), ১১ ডিসেম্বর ২০১৫। হীরামোহন সরকার (মাগুরখালী, ডুমুরিয়া), ২১ মে ২০১৪।

১৮. ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর ভারত সরকার পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের জন্য এই কলোনি তৈরি করে।

১৯. ২০০৫ সালে প্রশান্ত সানা তার মাতা গুরুদাসী সানার সাথে জন্মভূমি শিবনগর গ্রামে বেড়াতে আসলে গবেষক তার সাক্ষাৎকার নেন। সাক্ষাৎকার, প্রশান্ত সানা (আদিলাবাদ, কাগজনগর অন্ধ্রপ্রদেশ, ভারত), ২২ নভেম্বর ২০০৫।

২০. সাক্ষাৎকার, গুরুদাসী সানা (আদিলাবাদ, কাগজনগর অন্ধ্রপ্রদেশ, ভারত), ২২ নভেম্বর ২০০৫।

২১. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিলপত্র*, ৮ম খণ্ড (ঢাকা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮৪), পৃঃ ৬৯১।

২২. সাক্ষাৎকার, কার্তিক ব্যানার্জী (সভাপতি, জয় বাংলা কলোনি, হাসনাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত)। ২৪ ডিসেম্বর ২০১৪। রেল স্টেশন সংলগ্ন জয় বাংলা বস্তিতে আশ্রয় নেয়া শরণার্থীদের কোনো সরকারি পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি।

২৩. সাক্ষাৎকার, রতন মাঝি (জয় বাংলা কলোনি, হাসনাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত)। ২৪ ডিসেম্বর ২০১৪।

২৪. ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের শরণার্থী প্রত্যার্পণ সম্পন্ন হয়। ফলে ত্রাণ কার্যক্রমও বন্ধ হয়ে যায়।

দেখুন, K. C. Saha, "The genocide of 1971 and the refugee influx in the east", in Ranabir Samaddar (ed.), Rufugees and the State: Practice of Asylum and Care in India, 1947-2000 (New Delhi : Sage Publications India Pvt Ltd, 2003), p. 224.

২৫. সাক্ষাৎকার, রতন মাঝি ও কার্তিক ব্যানার্জী (জয় বাংলা কলোনি, হাসনাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত)। ২৪ ডিসেম্বর ২০১৪।

২৬. ১৯৯৮ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত রোম সংবিধির ৭ নম্বর আর্টিকেলে প্রদত্ত মানবতাবিরোধী অপরাধের (Crime Against Humanity) সংজ্ঞাটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। এই সংজ্ঞা অনুসারে বেসামরিক মানুষের উপর পরিকল্পিত/সচেতন আক্রমণ, হত্যা, উচ্ছেদ, দাসত্ব, জাতিবিদ্বেষ, বন্দীত্ব, নির্যাতন, নারী নির্যাতন প্রভৃতি মানবতাবিরোধী অপরাধ। জাতিসংঘের জেনোসাইড প্রিভেনশান অ্যান্ড দ্য রেসপনসিবিলিটি টু প্রটেক্ট-এর ওয়েবসাইটের এই লিংকে বিস্তারিত সংজ্ঞাটি রয়েছে। লিংক (১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে প্রাপ্ত): http://www.un.org/en/genocideprevention/crimes-against-humanity.html. মানবতাবিরোধী অপরাধ সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, Human Rights Watch, Genocide, War Crimes and Crimes Against Humanity (New York: Human Rights Watch, 2006), pp. 192-233.

২৭. বনগাঁ এলাকায় এই ধরনের চারশত অন্তঃসত্ত্বা মহিলা ছিল বলেও হ্যাস্টিংস-এর বর্ণনা থেকে জানা যায়। দেখুন, মাসুদুল হক, বাঙালি হত্যা ও পাকিস্তানে ভাঙন (ঢাকা: সুচয়নী প্রকাশনী, ১৯৯৭), পঃ ৩১৫।

BL College Journal

ISSN 2664-228X
Volume -1, Issue-2, 2019
pp. 98-106

গালির সমাজতত্ত্ব : শ্রেণি, পেশা ও জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিত

ড. খ. ম. রেজাউল করিম
সহযোগী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, সরকারি মাইকেল মধুসূদন কলেজ, যশোর, বাংলাদেশ
ই-মেইল : rezakarim.km@gmail.com

মহসিন মিঞা
সহকারী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, সরকারি জয়বাংলা কলেজ, খুলনা, বাংলাদেশ
ই-মেইল : m.mia2705@gmail.com

সারসংক্ষেপ

সমাজবিজ্ঞানীদের ভাষায় সামাজিক প্রক্রিয়া মানবজীবনের জন্য অপরিহার্য। এ প্রক্রিয়ার অন্যতম বিষয় হলো দ্বন্দ্ব। আর দ্বন্দ্বের মূল উপাদান গালাগাল। এটি মূলত ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক উত্তেজনার বহিঃপ্রকাশ। অর্থাৎ উত্তেজিত অবস্থায় একজন ব্যক্তি এমন সব শব্দ ব্যবহার করে যা সে স্বাভাবিক অবস্থায় করে না, তা গালি হিসেবে চিহ্নিত। অন্যান্য সমাজের মতো বাঙালি সমাজে নানা ক্ষেত্রে গালাগালের প্রচলন লক্ষ করা যায়। সাধারণত ব্যক্তি অভ্যাসবশত, রাগান্বিত হয়ে, হাসি-ঠাট্টাচ্ছলে কিংবা আবেগের মুহূর্তে অন্যকে গালাগাল করে থাকেন। গালাগাল স্থান-কাল-পাত্রভেদে পরিবর্তিত হয়। সামাজিকভাবে গালাগালকে বিচ্যুতির পর্যায়ে মনে করা হয়। মূলত বাঙালি সমাজে গালাগালের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তবে গালাগাল নিয়ে সামাজিক বিজ্ঞানীদের মধ্যে লেখালেখি ও গবেষণা তেমন একটা চোখে পড়ে না। সঙ্গত কারণেই বর্তমান প্রবন্ধের বিষয় হিসেবে সামাজিক দৃষ্টিতে গালাগালকে নির্বাচন করা হয়েছে।

১. অবতরণিকা

সাধারণভাবে বলা যায় যে, সমাজবিজ্ঞান হলো সামাজিক সম্পর্কের বিজ্ঞান। এ প্রসঙ্গে সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার বলেন, 'সমাজবিজ্ঞানই একমাত্র বিজ্ঞান যা সমাজ ও সামাজিক সম্পর্ক সম্বন্ধে পাঠ করে'।[১] আমরা যে সব সামাজিক সম্পর্কের মাধ্যমে জীবনযাপন করি, তাদের সংগঠিত রূপই সমাজ। সমাজে বসবাস করার মাধ্যমে মানুষ সমাজের অন্যান্য সদস্যদের সাথে বিভিন্ন প্রকার সম্পর্ক স্থাপন করে, যা তাকে সামাজিক জীবের স্বীকৃতি এনে দেয়। আর সামাজিক জীব হিসেবে মানুষকে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে চলতে হয়। এই পথ পরিক্রমায় সামাজিক সম্পর্ক ও বোঝাপড়া সব সময় এক রকম হয় না। এ সম্পর্ক ইতিবাচক হওয়ার পাশাপাশি নেতিবাচকও হতে পারে। যখন কোনো ব্যক্তি অন্যজনের আচরণে ক্ষুব্ধ বা বিরক্ত হয়, তখন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার

জন্য কিছু শব্দ উচ্চারণ করে, যা অন্যের কাছে অশ্রাব্য, অশালীন, অগ্রহণযোগ্য বা মানহানিকর বলে প্রতীয়মান হয়। এ ধরনের অপ্রত্যাশিত শব্দাবলিই সামাজিক বিবেচনায় গালাগাল হিসেবে স্বীকৃত, যা প্রতিপক্ষের ওপর প্রতিশোধ নেয়া বা ক্ষোভ মেটানোর সবচেয়ে সহজ পন্থা হিসেবে বিবেচিত। বাঙালি জীবনের সাথেও ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে গালাগাল, যা গবেষক, সাহিত্যিক ও সামাজিকবিজ্ঞানীদের কাছে আগ্রহের বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। বর্তমান প্রবন্ধে বাঙালি জীবনে ব্যবহৃত গালির শ্রেণি-পেশা ও জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিত তুলে ধরার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে।

২. সমস্যার বিবৃতি

বাঙালি জীবনে গালাগালের গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষিত-মূর্খ, ধনী-দরিদ্র, যুবক বা বৃদ্ধ এমন কাউকে পাওয়া যাবে না যিনি জীবনে গালি দেননি। এমনকি বাংলা ভাষায় গালাগাল নিয়ে যত গান, কবিতা, গল্প আছে, গলাগলি নিয়ে তার অর্ধেকও নেই। বাঙালির জীবনে গালি, মরণে গালি, মরণোত্তর গালি, জগৎ সংসারে যেন গালিরই খেলা।[২] বলা হয় সমাজস্থ যে কোনো বিষয়ের সামাজিক উপযোগিতা না থাকলে তা সমাজে টিকে থাকে না। যেহেতু বহুকাল ধরেই বাঙালি সমাজে গালাগাল টিকে আছে, সেহেতু এর কিছু সামাজিক উপযোগিতা রয়েছে। যখন কেউ অন্যকে গালাগাল দেয় তখন তার রাগ বা ক্ষোভ তাৎক্ষণিকভাবে কিছুটা প্রশমিত হয় বলেই ঘটনা পরবর্তী ধাপে পৌঁছায় না। আর গালাগালে রাগ বা ক্ষোভ না মিটলে তা পরবর্তী ধাপে অর্থাৎ হাতাহাতি বা মারামারি পর্যায়ে গড়ায়। তবে শুধু যে বিরোধপূর্ণ পরিস্থিতিতেই গালাগালের ব্যবহার হয় তাও নয়। অনেক সময় বন্ধুত্বপূর্ণ ও আবেগঘন পরিস্থিতিতেও অনেকে গালাগালের যথেচ্ছ ব্যবহার করে থাকেন। আবার অনেকের পেশাগত সাফল্যে গালাগাল নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করে থাকে।

গালাগাল এক ধরনের মানসিক প্রশান্তি বয়ে আনে। যেমন- আপনি কাউকে অপছন্দ করেন, কাউকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু সামাজিক প্রতিবন্ধকতার কারণে পারছেন না। ঠিক এমন সময় তার নামে কিছু গালি উৎসর্গ করুন। দেখবেন কেমন যেন সুখানুভূতিতে মন ভরে উঠছে। সাধারণত বিরক্তি, ক্ষোভ, ক্রোধ, ধিক্কার, অসন্তোষ বা রাগ প্রকাশের ক্ষেত্রে গালাগাল ব্যবহৃত হয়। পাশাপাশি ভালোবাসা ও আবেগ প্রকাশের ক্ষেত্রেও গালাগালের জুড়ি নেই। এক গবেষণায় দেখা গেছে, বেশির ভাগ পুরুষই তার স্ত্রী বা প্রিয়তমার সাথে যৌনমিলনের চরম মুহূর্তে একে অপরের উদ্দেশ্যে অশালীন শব্দ বা গালাগাল ছুড়ে দেয়। এতে তাদের মানসিক ও শারীরিক উত্তেজনা অনেকগুণ বেড়ে যায় বলে ধারণা করা হয়। উদাহরণ হিসেবে জেমস জয়েস ও তাঁর স্ত্রীর মধ্যকার পত্রগুলো পড়লে বোঝা যায় যে তাঁদের ভালোবাসা প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম ছিল গালাগাল। আবার বাঙালি সমাজে এক ধরনের আত্মীয় বা জ্ঞাতি লক্ষ করা যায়, যাদেরকে বলা হয় কৌতুক সম্পর্কীয় জ্ঞাতি। এটি এমন সম্পর্ক যেখানে একজন প্রথা অনুসারে এমনকি কখনো বাধ্য হয়ে অপরের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, যার জন্য অপর ব্যক্তি কোনো রাগ প্রদর্শন করতে পারে না বা অপরাধ হিসেবে গ্রহণ করে না।[৩] যেমন- নানা-নাতি, দাদা-নাতি, শালা-ভগ্নিপতি, দেবর-ভাবী

ইত্যাদি। অনেক সময় নানা কিংবা দাদা বা নানা সম্পর্কের মুরুব্বিরা নাতি-নাতনি সম্পর্কের ছেলে-মেয়েদের গালাগাল দিয়ে মজা পান। আবার ছোট বাচ্চাদের আদর করে ডাকা হয়-বান্দর, হনুমান, পাজি, শয়তান, বিচ্ছু, বুদ্ধু, বোকা ইত্যাদি। অনেকে স্রেফ মজা করার জন্য সচেতনভাবেই পরিবারে বা বন্ধুমহলে গালাগাল প্রয়োগ করে থাকেন। তাই বলা হয় 'humors are nothing but slang'। সুতরাং দেখা যায়, গালি ভাষার নতুন এক উপযোগ সৃষ্টি সাপেক্ষে মানুষের জীবনে রসের সঞ্চার করেছে, যা মানবজীবনের জন্য অনেকটাই অপরিহার্য।

৩. গালাগাল কী

গালাগাল শব্দটির প্রতিশব্দ হলো গালিগালাজ, গালমন্দ, ভৎর্সনা, তিরস্কার, গালিপাড়া, গালিবর্ষণ, গালি, বদকথা, কটুকথা, অপকথা, বকাঝকা, কুকথা, অশ্লীল শব্দ, অশিষ্ট শব্দ, কটুকাটব্য প্রয়োগ ইত্যাদি। গালি শব্দটির পারস্পরিক অর্থবাচকতা আছে। অর্থাৎ একজন ব্যক্তি যদি অন্যজনকে গালি দেয় এবং অপরজন যদি তার প্রতিত্তরে গালি দেয় তখন তা পরিণত হয় গালাগালিতে। খানিকটা হাতাহাতি, লাঠালাঠি ও চুলাচুলির মতো বিষয়। আর যখন গালাগাল একপাক্ষিক হয় তখন তাকে গালি বলা হয়। যেমন-শিশুরা অনেক সময় বাবা-মার কাছে অভিযোগ করে যে, 'অমুক আমাকে গালি দিয়েছে।' The Historical Dictionary of American-তে গালির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হচ্ছে, 'Slang is lexical innovation within a particular cultural context.'[৪] আবার গলাগলি ও গালাগাল শব্দ দুটির মধ্যে ধ্বনিগত কিছু মিল থাকলেও অর্থ একবারেই বিপরীত। গলাগলি দ্বারা দুইজন ব্যক্তির গলায় গলায় ভাব বা মধুর সম্পর্ককে বোঝানো হয়। কিন্তু গালাগাল সেই ভাবের ঠিক বিপরীত অবস্থা। বরং ভাবের পরিবর্তে যখন অসদ্ভাব তৈরি হয় তখনই একজন অন্যজনকে গালি দেয়। গালি মূলত ক্ষোভ বা রাগ প্রকাশের প্রাথমিক অস্ত্র। যখন মানুষ নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না তখনই গালি দিয়ে থাকে। তাই বলা হয় গালাগালের পরবর্তী ধাপ হলো হাতাহাতি/মারামারি।[৫]

৪. প্রবন্ধের উদ্দেশ্য

বর্তমান প্রবন্ধের সাধারণ উদ্দেশ্য হল গালাগালের পরিপ্রেক্ষিত ও বাঙালি সমাজে এর প্রভাব বিশ্লেষণ করা। এই উদ্দেশ্যকে কতকগুলো সুনির্দিষ্ট ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হল-

ক) দেশে প্রচলিত গালাগাল অনুসন্ধান করা;
খ) গালাগালের শ্রেণি-পেশা ও জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিত তুলে ধরা;
গ) সমাজে গালাগালের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব নির্ণয় করা;

৫. পদ্ধতি

বর্তমান প্রবন্ধটি মূলত উদঘাটনমূলক (exploratory)। এ প্রবন্ধ বিষয়ক তথ্যের জন্য মুখ্য ও গৌণ উভয় প্রকারের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। মুখ্য তথ্য সংগ্রহের জন্য সমাজের নানা পেশা-শ্রেণির

(শিক্ষক, ছাত্র, বাস-ট্রাক শ্রমিক, রিকশা-ভ্যানওয়ালা, কুলি, কাঠমিস্ত্রী ইত্যাদি) মানুষের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। আর গৌণ তথ্যাদি বিভিন্ন গ্রন্থ, জার্নাল, ম্যাগাজিন, স্থানীয় ও জাতীয় দৈনিক পত্র-পত্রিকা, বিভিন্ন ওয়েবসাইট ইত্যাদি থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণা সংশ্লিষ্ট সংগৃহীত তথ্যাবলি যাচাই-বাছাই ও বিশ্লেষণের পর তা বর্ণনামূলকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

৬. বিষয়বস্তুর মূল আলোচনা

মানুষকে তার বৈচিত্র্যময় অনুভূতির প্রকাশ ঘটাতে বিভিন্ন ধরনের রূপকের আশ্রয় নিতে হয়। তাই গালি হচ্ছে ভাষার মেটাফরিক উপস্থাপন। যেমন-সে আস্ত একটা গাধা, লোকটি কুত্তার মতো ঘেউ ঘেউ করছে। পেট হাগস-এর মতে, Slang is non-standard language that usually represents vocabulary related to popular culture।[৬] কে. জি. চেস্টারসন বলেছেন, all slang is metaphor and all metaphor is poetry'।[৭] গালি মানব মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তবে ক্ষেত্রবিশেষ এর প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না। জানা যায়, মানুষ যেদিন থেকে ভাষা আয়ত্ত করতে শিখেছে সেদিন থেকেই গালির ব্যবহার শুরু হয়েছে। রাগ, ক্ষোভ, দ্বেষ, হিংসা কিংবা অপরাধের শাস্তি হিসেবে অপরাধীকে তিরস্কার করতে গালির ব্যবহার হয়ে আসছে সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই। গালির কার্যকারণ যা-ই থাকুক না কেন, সেই আদিম সমাজ থেকে বর্তমান উত্তরাধুনিক সমাজ পর্যন্ত এর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তাই লক্ষ করা যায় ধর্ম, বর্ণ, পেশা, বৃত্তি, কৌম, সমাজ, পৃথিবীর সব ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে গালাগালের ব্যবহার ও চর্চা রয়েছে। এই গালাগালের ধরন আবার সমাজ ও সংস্কৃতিভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। সমাজের এক স্থানের বুলি অন্যস্থানে গালি হিসেবে বিবেচিত হয়। যেমন, যুক্তরাজ্যে fag মানে সিগারেট, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে fag বলতে হোমোসেক্সুয়াল পুরুষকে বোঝায়। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে 'খাসি' শব্দটা ইতিবাচক হিসেবে ব্যবহার করা হলেও মেহেরপুর জেলায় এটি গালি হিসাবে বিবেচিত। আবার বন্ধুদের আড্ডায় শালা, খানকির ছেলে, গাধা, কুত্তা, শুয়োর এ জাতীয় শব্দ গালি মনে না হলেও বড়দের মাঝে আনুষ্ঠানিক কোনো বৈঠকে তা গালি হিসাবে গণ্য করা হয়। আবার জেন্ডার ভেদেও গালির ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। যেমন, দেশে নিম্নশ্রেণির মানুষেরা মাগি, ভাতার, নাঙ, মিনসে শব্দগুলো স্বাভাবিকভাবে ব্যবহার করে কিন্তু এই শব্দগুলো শিক্ষিত সমাজে গালি হিসাবে বিবেচিত। পুরুষদের আড্ডায় অনেক শব্দ ব্যবহার করা হয়, যা নারীমহলে গালি হিসেবে চিহ্নিত। যেমন, হুদায়, চোদনা, বাড়া, বকচোদ, ভোদাই ইত্যাদি।

গালি হিসেবে যে শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়, তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তার বেশির ভাগই এসেছে প্রাণি বা নিম্নশ্রেণির জীব থেকে, যেমন- কুত্তা, গাধা, পাঠা, শুয়োর, ছুঁচো, পেঁচা, গরু, ছাগল, মহিষ, বান্দর, হনুমান ইত্যাদি; কিছু এসেছে নেতিবাচক শব্দ থেকে, যেমন- ফালতু, রোগা, মূর্খ, বোকা, হাঁদা, মরণ, পচা, চাষা, কলু, জোলা ইত্যাদি; কিছু এসেছে রোগের নাম এবং শারীরিক

ক্রটি থেকে, যেমন- পাগল, বসন্ত, মৃগী, জিনে ধরা, কানা, ন্যাড়া, কালা ইত্যাদি; কিছু এসেছে নিম্নশ্রেণির পেশা থেকে, যেমন- চোর, ডাকাত, কুলি, চামার, মুটে, মুচি, নাপিত, মেথর ইত্যাদি; কিছু এসেছে সম্পর্ক থেকে, যেমন- শালা, শালী, সতীন, মর্দা ইত্যাদি; কিছু এসেছে মানুষের যৌনাঙ্গ থেকে, যেমন- বাল, বাড়া, ভোদা, ভোদার বাল, ধোন, ধোনের বাল, হোল, হোলের বাল, চ্যাটের বাল ইত্যাদি; অনেক সময় বিদেশি শব্দ থেকেও গালি আসে, যেমন- হারামি, মাদার-ফাকার, হেল, বাস্টার্ড, ফ্রড, বিটার, শয়তান, কামিনে, ফাজিল, জালিম, কাফের; কিছু গালি এসেছে ইতিহাস এবং পুরাণের পাতা থেকে, যেমন- নমরুদ, ফেরাউন, হিটলার, মীরজাফর, রাজাকার, আলবদর ইত্যাদি। এছাড়া অনেক শব্দ উৎপত্তিগত অর্থে অশালীন না হলেও প্রয়োগের কারণে তা গালি হিসাবে গণ্য করা হয় যেমন, মাগী। শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে তিরিশোর্ধ মহিলা। তবে প্রায়োগিক অর্থে খারাপ স্বভাবের নারী বা পতিতার সমার্থক হিসেবে মনে করা হয়।

গালি বলতে যে সবসময় অশালীন শব্দকে বোঝানো হয় বিষয়টি ঠিক তা নয়। এটা নির্ভর করে শব্দটাকে কিভাবে, কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে তার ওপর। যেমন অশালীন শব্দ প্রয়োগের কারণে গালি হিসেবে গণ্য নাও হতে পারে, তেমনি শ্লীল শব্দ ব্যবহারের মারপ্যাচে গালাগাল হিসেবে গণ্য হতে পারে। যেমন, যখন বলা হয়, বেশ্যালয় গমনে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। তখন বেশ্যা শব্দটি গালি হিসাবে ব্যবহার করা হয় না। কিন্তু যখন বলা হয়, তুই একটা বেশ্যার জাত, তখন বেশ্যা শব্দটা গালি হিসাবে বিবেচিত হয়। শিক্ষিত মানুষের কথার মারপ্যাচে গালি দেওয়ার প্রবণতা অধিক লক্ষ করা যায়। যেমন, ক্রিকেট মাঠে রড মার্শ একবার ইয়ান বোথামকে বলেছিলেন, 'হায় ইয়ান, তোমার বউ আর আমার বাচ্চারা কেমন আছে?' জবাবে বোথাম বলেছিলেন, 'বউ ভালোই আছে কিন্তু বাচ্চারা সব বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মেছে দেখছি।'[৮]

৭. গালাগালের জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিত

পুরুষ শাসিত সমাজে নারীকে যে দৃষ্টিতে দেখা হয় তার প্রতিফলনও ঘটে ভাষার মাধ্যমে। ভাষা অনেক সময় জেন্ডার এজেন্ট হিসেবেও কাজ করে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত গালাগালগুলোর দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, গালিগুলো সুস্পষ্টভাবে পুরুষত্বের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করছে। সমাজে মাগি মানুষ, ছেনাল, নটি, বেশ্যা, বেশ্যা মাগী, নটি মাগী, অসতী, শালী, অবলা, অপয়া, চুন্নি, খানকি, পাগলী, ছলনাময়ী, সর্বনাশী, পাড়াবেড়ানি, চুতমারানি, বারানি, চাকরানী, ফকিন্নি, বেজাত ইত্যাদি। কথায় কথায় বলতে শোনা যায়, তোর জন্মের ঠিক নেই, বেশ্যার ছাওয়াল এ গালিগুলো সামগ্রিকভাবে নারী জাতিকে সামাজিকভাবে হেয় করে।

গালাগালের শব্দমালা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বেশিরভাগ শব্দই নারীকেন্দ্রিক বা নারীর সংবেদনশীল অঙ্গকে ফোকাস করে। এতে বোঝা যায় নারীর মর্যাদায় আঘাত করলেই কেবল ক্ষোভ প্রশমন বা প্রতিশোধ নেয়ার কৌশল অবলম্বন করা হয়। যুদ্ধের সময় যেমন শত্রুপক্ষ নারী ধর্ষণকে অন্যতম প্রধান অস্ত্র হিসেবে মনে করে, তেমনি মৌখিক বিরোধে প্রতিপক্ষ গালিতে যে শব্দ সমষ্টি

ব্যবহার করে তার অনেকটাই নারী বিষয়ক। যেমন খানকির ছেলে/মেয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ঐ ব্যক্তির মাকে বা মায়ের চরিত্র নিয়ে অপমানসূচক শব্দ উচ্চারিত হয়, যা ব্যক্তির মনে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে। ফলে সে মানসিকভাবেই খানিকটা দুর্বল হয়ে পড়ে। এভাবে অন্যকে দুর্বল করার মাধ্যমে নিজের ক্ষোভ প্রশমন করা হয়। আসলে গালাগালের ক্ষেত্রে পুরুষতান্ত্রিকতা রয়েছে। যাদের মুখ দিয়ে গালি বের হয় তাদের বেশিরভাগই পুরুষ তারা হয়ত সচেতনভাবেই নারীদের জন্য গালি তৈরি করে নিজেকে অপমানের সুযোগ দিতে চায় না।

৮. শ্রেণিগত গালাগাল

সমাজে অর্থনৈতিক অবস্থার তারতম্যের কারণে গালির পার্থক্য ঘটে থাকে। অবশ্যই অর্থনীতি অন্য সবকিছু নির্ধারণের পাশাপাশি মানুষের ভাষাও নির্ধারণ করে থাকে। সমাজের নিম্নমধ্যবিত্ত বা শ্রমিক শ্রেণিকে তুচ্ছার্থে নানাবিধ গালি ব্যবহার করা হয়। সাধারণত শ্রমিক শ্রেণির সাথে মালিক শ্রেণিরা খুব অকথ্য ভাষায় কথা বলে। এমনকি চাকর, রিকশাচালক, মুটে, কুলি-মজুর সবাই এই ভাষা বৈষম্যের শিকার হয়।

৯. পেশাগত গালাগাল

গভীরভাবে খেয়াল করলে গালির একটা পেশাগত প্রেক্ষাপটও পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন পেশাজীবীদের অবলীলায় গালি ব্যবহার করতে দেখা যায়। তবে সকল পেশার মানুষদের মুখে গালির ব্যবহার একই হারে হয় না, বরং পেশাভেদে কম বেশি হতে দেখা যায়। যেমন-মসজিদের ইমাম বা মন্দিরের পুরোহিতের মুখ দিয়ে গালি বের হওয়া নেহাত দুর্ঘটনা। আবার বাসের চালক, হেলপার, সুপারভাইজার, ঘাটের কুলিদের মুখে গালি না থাকাটাই অস্বাভাবিক। দেশে পুলিশতো গালিকে পেশাগত অস্ত্রে পরিণত করেন বলেই অনেকের ধারণা। আবার গালির শব্দভাণ্ডারে পেশাগত বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। প্রত্যেক পেশায় স্বতন্ত্র গালি আছে যা শুধু নিজেদের পরিমণ্ডলেই ব্যবহার হয়ে থাকে। অনেক পেশায় কঠিন কায়িক শ্রম দিতে হয়। সেখানে শ্রমিকরা কোন ক্ষোভ নয় বরং সর্বশক্তিতে জেগে ওঠা বা শক্তি বৃদ্ধির জন্য গালির ব্যবহার করে থাকে। যেমন– করাত মিলে গাছের গুড়ি ওঠানোর সময়, গভীর নলকূপ স্থাপনের সময়, বৈদ্যুতিক খুঁটি পোতার সময়, রাস্তা নির্মাণে কর্মরত শ্রমিকেরা ছন্দে ছন্দে গালি ব্যবহার করে, যা সভ্য সমাজে অশ্রাব্য। অথচ এর মাধ্যমে তাদের কর্মস্পৃহা অনেকগুণ বেড়ে যায় বলেই তাদের ধারণা।

১০. রাজনৈতিক গালাগাল

ইতিহাস, সাহিত্য কিংবা মিথের অনেক নেতিবাচক বা খলচরিত্রের নাম গালি হিসেবে ব্যবহৃত হয়; যেমন- হিটলার, ইয়াহিয়া খান, মীরজাফর ইত্যাদি। শুধু অমার্জিত ও উসকানিমূলক নয়, অশ্লীল ভাষাও অনেক নেতা-নেত্রী প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে ব্যবহার করেন। যা অনেকটা গালাগালের মাত্রা পায়। যেমন- রাজাকার, জঙ্গি, রাষ্ট্রদ্রোহী, রাষ্ট্রবিরোধী, স্বাধীনতা বিরোধী, আলবদর, আলশামস্ ইত্যাদি।

তবে এসব শব্দের প্রকৃত অর্থ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অনেক গভীর।

১১. সাহিত্যে গালাগাল

সাহিত্যে গালির ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কারো কারো সাহিত্যকর্ম অত্যধিক গালি ব্যবহারের কারণে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সাহিত্যিকদের হাত ধরে আমদানি হয়েছে হরেক রকমের গালি। যেমন, শেক্সপিয়ারের মাধ্যমে ইংরেজি ভাষায় যুক্ত হয়েছে অনেক নতুন গালি। Disfurnish, facinerious, barbary, cock-pigion, cabilero, miching-এর মতো গালি শেক্সপিয়ার তাঁর নাটকে প্রচুর ব্যবহার করেছিলেন। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, কায়েস আহমেদ, সমরেশ বসু প্রমুখ গালিকে বাংলা সাহিত্যে অলংকার বানিয়ে ফেলেছেন। বাংলা সাহিত্যে গালিগালাজের জন্যে অভিযুক্ত হয়েছেন তসলিমা নাসরিন, হুমায়ুন আজাদসহ অনেকেই। লক্ষ করা যায়, হারামজাদার চাকুরিটা ফিরিয়ে দেব যদি পঞ্চাশ লাখ দেয়; মাদারচোতটা দেবে, বাঞ্চতটা কয়েক বছরে কয়েক কোটি জমিয়েছে...।[৯] এরকম আরো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

১২. খেলাধুলায় গালাগাল

খেলাধুলাতেও গালির ব্যবহার লক্ষণীয়। বিপক্ষ খেলোয়াড়দের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক অস্থিরতা বা মনোযোগের বিঘ্ন ঘটানোর জন্য গালি ব্যবহার হয়। জনপ্রিয় খেলা ফুটবল থেকে শুরু করে ক্রিকেটেও গালির ব্যবহার লক্ষ করার মতো। গালাগালকে খেলার ভাষায় স্লেজিং বলা হয়। যেমন, একবার এক বোলার ব্যাটসম্যানকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, 'যদি তুমি ছক্কা মারতে পারো, তাহলে তুমি যা চাও তাই পাবে।' জবাবে ঐ ব্যাটসম্যান বলেছিলেন, 'যাও তোমার বউকে বিছানায় রেডি হতে বলগে'। আর অস্ট্রেলিয়ায় ক্রিকেট খেলোয়াড় সাইমন্ডস এবং ভারতের ক্রিকেট খেলোয়ার হরভজন একে অপরকে বানর বলে গালিগালাজ করার ব্যাপারটা তো সকলেরই জানা।

১৩. চলচ্চিত্রে গালাগাল

সম্প্রতি চলচ্চিত্রে গালির ব্যবহার দেখা যায়। সিনেমা এই দিক থেকে সবার উপরে। মাদার ফাকার, ফাক, সাকার, ব্লাডি হেল, ডিক ইত্যাদি শব্দগুলো ইংরেজি সিনেমায় গালি হিসেবে হরহামেশাই ব্যবহৃত হয়। বাংলা চলচ্চিত্রে একসময় অশ্লীল শব্দের ব্যবহার চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। তবে বাংলা সিনেমায় শুধু ভিলেনদের মুখেই গালি শোনা যায়। যেমন- হারামজাদা, হারামখোর, হারামির বাচ্চা, খানকির ছেলে, শয়তান, শালা, শালার বেটা শালা, শালি, শালির বেটি শালি, মাগি, নটির মেয়ে/ছাওয়াল ইত্যাদি।

১৪. প্রাণিকেন্দ্রিক গালাগাল

গালাগালের সাথে অনেক সময় প্রাণিকুলকে টেনে আনা হয়। যেমন রাগের মাথায় কখনো প্রতিপক্ষকে শুয়োরের বাচ্চা, কুত্তার বাচ্চা বলা হয়। নির্বোধকে ছাগল বা গরু বা গাধা, ধূর্তকে শিয়াল, দুষ্টুকে বানর বলে গালি দেয়া হয়। আবার অকর্মাকে বলদ বলে গালি দেয়া হয়।

১৫. সমাজে গালাগালের প্রভাব

গালিতে ব্যবহৃত শব্দাবলি সামাজিকভাবে অকথ্য বা অশ্রাব্য হিসেবে পরিচিত। এ কারণেই অনেক সময় অভিযোগ শোনা যায় 'অমুক আমাকে অকথ্য ভাষায় গালি দিয়েছে'। অর্থাৎ এমন কথাই বলা হয়েছে যা বলা যায় না। একইভাবে 'অমুক আমাকে অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিয়েছে অর্থাৎ এমন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা শোনার অযোগ্য। এ কারণেই গালাগালের শব্দমালা বা বাক্যাবলি সহজাতভাবেই ঘৃণিত বা নিন্দনীয়। বাংলা ভাষায় গালাগালে ব্যবহৃত শব্দাবলির মধ্যে আঞ্চলিকতার ভিন্নতা রয়েছে। যেমন- পাবনা অঞ্চলে মেয়েদেরকে আদর করে মাগী নামে সম্বোধন করা হলেও খুলনাঞ্চলে মাগী শব্দটি পতিতা অর্থে ব্যবহার করা হয়। তাই পাবনার কেউ খুলনা বেড়াতে এলে আদর করতে গিয়ে গালি দেয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত হতে পারেন। অমার্জিত, অরুচিকর, অশালীন ভাষা যখন একজন সাধারণ, অশিক্ষিত, নিম্নশ্রেণির মানুষ ব্যবহার করে, তখন তা বেশি গুরুত্ব পায় না। কিন্তু শিক্ষিত, অভিজাত ও নেতৃস্থানীয়দের মুখ থেকে অশ্লীল-অমার্জিত শব্দাবলি নির্গত হলে তা সমাজের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, তার প্রভাব পড়ে সাধারণ লোকজনের মাঝে। তারা যা করেন, ভাবেন ও বলেন এবং যেভাবে চলেন, অনেকেই এসব কিছু গ্রহণযোগ্য মনে করে এগুলো অনুসরণ করে থাকে।[১০] আর যখন রাজনীতির অঙ্গনে নেতানেত্রী বা দায়িত্বশীল উর্ধ্বতন ব্যক্তিরা অমার্জিত কিংবা উত্তেজক ও উসকানিমূলক শব্দ ও ভাষা ব্যবহার করেন, তখন ক্ষতিটা হয় আরো ব্যাপক। রাজনীতির এই অপভাষা জাতীয় জীবনে হিংসা, হানাহানি, অনাস্থা, অশান্তি, বিদ্বেষ ও বিভাজন বাড়িয়ে দেয়। এতে রাজনৈতিক অঙ্গনের সমস্যা প্রকট এবং পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে ওঠে। রাগের মতো সাধারণ আবেগটি যাতে অনিয়ন্ত্রিতভাবে প্রকাশ না পায়, সে জন্য মার্কিন বিজ্ঞানী গার্লস স্পিয়েলবারগার রাগের নিয়ন্ত্রিত প্রকাশভঙ্গির কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর গবেষণায় তিনি বলেছেন, রাগকে পুরোপুরি চেপে রাখা যাবে না, একেবারে দমন করা যাবে না; কারণ অবদমিত রাগ থেকে হতে পারে নানাবিধ মানসিক ও শারীরিক সমস্যা; হতে পরে বিষণ্নতা, উচ্চরক্তচাপ, খিটখিটে মেজাজ, বিশ্বনিন্দুক চরিত্রের মালিক।[১১]

একাধিক মার্কিন গবেষণায় প্রমাণ মিলেছে মানসিক চাপ, অবসাদ, মাত্রাতিরিক্ত উত্তেজনা কমানোর ক্ষেত্রে গালিগালাজ খুবই কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এই ধারণার সঙ্গে একমত ব্রিটিশ গবেষক এবং মনোবিজ্ঞানীরাও। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের তাত্ত্বিক ও ফলিত ভাষাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. কিরিকুস অ্যান্টনিও জানান, গালিগালাজ আসলে মন থেকে রাগ, ক্ষোভ বের করে মানসিক চাপ কমানোর সহজ উপায়। অ্যান্টনিওর মতে, যেসব মানুষ উত্তেজিত হলেও গালিগালাজ দিতে পারেন না বা দেন না, তাদের মধ্যে মানসিক অবসাদ, উচ্চরক্তচাপ, নানা স্নায়ুবিক সমস্যা দেখা যায়। শুধু তাই নয়, কখনো এসব ব্যক্তিদের মধ্যে দ্বৈত ব্যক্তিত্বের (split personality) সমস্যাও দেখা যায়। তুলনায় যারা সহজে গালাগাল দিয়ে চাপমুক্ত হন তারা অনেক বেশি সুস্থ থাকেন। .

গালি নিয়ে সমাজের শিক্ষিত মহলে বেশ অসন্তোষ দেখা যায়। কেউ কেউ মনে করেন, আইন করে জনসম্মুখে গালি নিষিদ্ধ করা উচিত। অনেকের ধারণা গালি ভাষার সৌন্দর্য ও পবিত্রতা নষ্ট করে।

সুতরাং তা ভাষা থেকে ছেঁটে ফেলা উচিৎ। যদি তাদের কথা মতো গালি নিষিদ্ধ করা হয় তাহলে কি ঘটতে পারে তা ভেবে দেখা দরকার। তবেই গালির প্রয়োজনীয়তা পরিষ্কার হয়ে উঠবে। গালি কখনই ভাষার সৌন্দর্য নষ্ট করে না বরং তা আরও সুস্পষ্ট করে তোলে। ভাষাকে ক্ষেত্রবিশেষে করে তোলে প্রাণবন্ত ও সজীব। গালি না থাকলে সবচেয়ে বড় যে ক্ষতিটা হতো তা হল, মানুষে মানুষে দৈহিক হাঙ্গামা বহুগুণে বেড়ে যেত। মানুষ ভাষা বা অভিব্যক্তির মধ্যদিয়ে রাগ মেটাতে না পেরে একে অন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো। হারামখোর, শুয়োরের বাচ্চা বলে যে কাজটি অনায়াসে হয়ে যায়, সেই কাজটি হতে হাতাহাতি বা লাঠালাঠি হতে পারে। এতে করে সামাজিক অস্বস্তি, অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা বেড়ে যেত কয়েকগুণ। তবে তার অর্থ এই নয় যে গালাগালকে উৎসাহ জোগাতে হবে। ক্রোধ প্রশমনের সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক-শৈল্পিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে হবে।

১৬. উপসংহার

কোনো সমাজই সম্পূর্ণ সংঘাতমুক্ত ও শান্তিপূর্ণ নয়। বাঙালি জীবনে গালির প্রয়োজনীয়তা ও ভূমিকা বলে শেষ করা যাবে না। গালাগাল সমাজের বিশৃঙ্খলাকে অনেকখানি রোধ করে। ফলে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ অনেকখানি বহাল থাকে। গালি আমাদের সমাজের এক মারাত্মক ব্যাধি। গালিগালাজ করা কোনো সুস্থ মানসিকতার পরিচয় নয়। মুদ্রাদোষ বা অভ্যাসবশত অনেকেই কথায় কথায় গালি দেন, অনেকেই হাসি-তামাশা ও ঠাট্টাচ্ছলেও অন্যকে গালি দিয়ে বসেন, এসবের কোনোটিই ঠিক আচরণ নয়। তাই গালাগাল পরিতাজ্য হলেও তা সামাজিকভাবে সৃষ্ট যার উপযোগিতার কারণেই প্রচলন বন্ধ করা কঠিন হবে বলেই মনে হয়।

তথ্যসূত্র

১. এ. কে. নাজমুল করিম, *সমাজবিজ্ঞান সমীক্ষণ*, ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ৩৪

২. শাহেদ ইকবাল, গালির সামাাজিক ও নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, *ধ্বনি*, ৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা (গালি সংখ্যা), ফেব্রুয়ারি-২০১২, পৃষ্ঠা ১

৩. সৈয়দ আলী নকী ও মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *নৃবিজ্ঞান*, ঢাকা : ধানশীষ, জুন ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ১১৩

৪. *The Historical Dictionary of American Slang,* Vol.3, USA: Random Home, 1975

৫. স্যামুয়েল কোয়েনিগ, *সমাজবিজ্ঞান*, ঢাকা : বই বিতান, আগস্ট ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ২৫৪

৬. Logo: Literary Terms Dictionary, 1978

৭. K. G. Chesterton, *A Book of Essays,* 1931, P.314

৮. আহমেদ হেলাল, চট করে চটে যাওয়া, *দৈনিক প্রথম আলো*, ঢাকা, ৩ জানুয়ারি ২০১৮

৯. হুমায়ুন আজাদ, *পাক সার জমিন বাদ সাদ.* ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২০০৪

১০. মোজাফ্ফর হোসেন, ভাষার ব্যবহার ও গালির ম্যারপ্যাচ, *রাইজংবিডি.কম*, ঢাকা : ২০ মে ২০১৭

১১. K. G. Chesterton, *A Book of Essays*, 1931, Page 321

BL College Journal

ISSN 2664-228X
Volume -1, Issue-2, 2019
pp. 107-134

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

গৌরাঙ্গ নন্দী
সিনিয়র রিপোর্টার, কালের কণ্ঠ, খুলনা ব্যুরো, খুলনা, বাংলাদেশ
ই-মেইল : gouranga.nandy@gmail.com

সারসংক্ষেপ

দুনিয়াজুড়ে বর্তমান সময়ে ব্যাপক আলোচিত বিষয় হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের ফলে দুনিয়ার উপকূলবর্তী দেশগুলোর সাগরের তলায় ডুবে যাওয়ার শঙ্কা তৈরি হয়েছে। বলা হচ্ছে, ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বাড়ছে। এর জন্যে দায়ী মানুষের ভোগ-বিলাসের কারণে তৈরি হওয়া উপজাত কার্বন ডাই আক্সাইড গ্যাস, যার সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া হিসেবে উত্তরের বরফ গলছে, সেই বরফগলা পানিতে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে এবং তা উপকূলের দ্বীপসদৃশ দেশগুলো ডুবিয়ে দিতে আসছে। এর প্রভাব-প্রতিক্রিয়ায় বাড়ছে লবণাক্ততা এবং পাল্টে যাচ্ছে জীবন-জীবিকার ধরন। এর পাশাপাশি প্রকৃতিতে ইতোমধ্যে শুরু হওয়া আরও একটি বড় প্রতিক্রিয়া হলো, প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা ও সংখ্যা উভয়ই বৃদ্ধি পাওয়া। এতে ঘন ঘন ঝড়-জলোচ্ছ্বাসে মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে। জীবন ও সম্পদহানির পরিমাণ বাড়বে। এই দুর্যোগ হতে রেহাই পেতে প্রয়োজন কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমন কমানো। কিন্তু ধনী ও উন্নত দেশগুলো কার্বন নিঃসরণ কমাচ্ছে না। নিকট অতীতে কার্বন নিঃসরণে আমাদের অবদান ছিল না বললেই চলে; কিন্তু সম্প্রতি আমরাও কার্বন নিঃসরণ করছি। এর প্রবণতা এমনি যে, অদূর ভবিষ্যতে আমরাও অন্যতম প্রধান কার্বন নিঃসরণকারী দেশ হিসেবে আবির্ভূত হতে পারি। একটি বিষয় খুবই আশ্চর্যের যে, এমন একটি দুর্যোগ আমাদের সামনে থাকলেও সকল দেশ এ নিয়ে তেমন চিন্তিত নয়, বরং কোনো কোনো দেশ এটিকে উপেক্ষা করে থাকে। জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে প্রতি দুই বছরে দেশগুলো একটি বৈঠকে - কপ (কনফারেন্স অব পার্টি) এ মিলিত হয়। এই বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হয়, বারেবারে উচ্চারিত হয় কার্বন নিঃসরণের মাত্রা কমিয়ে নিয়ে আসার কথা। কিয়োটো প্রটোকলে এ বিষয়ে অনেক অঙ্গীকার-উদ্যোগের কথা বলা হয়েছিল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হয়নি। বালি (কপ) সম্মেলনে আশার আলো দেখা দিয়েছিল; প্যারিসে (কপ) ২০১৬ সালে একটি চুক্তিও হয়েছিল কার্বন নিঃসরণের মাত্রা দুই ডিগ্রী সেলসিয়াসের মধ্যে রাখতে হবে। কিন্তু আমেরিকা এই চুক্তি হতে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিতে চাইছে। এমনকি ট্রাম্প প্রশাসন চুক্তি হতে বেরিয়ে আসার উদ্যোগ নিয়েছে।

এই প্রবন্ধের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন বলতে আমরা কি বুঝি, এর প্রভাবে প্রাকৃতিক ও সামাজিক জীবনে কী ধরনের পরিবর্তন ঘটছে; মোটাদাগে কী আলাপ-আলোচনা চলছে, অন্যদিকে বিশ্ব নেতৃবৃন্দও বা কী বলছেন, তাই পর্যালোচনা করে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়টি কি একেবারেই কল্পকথা (মিথ), না-কি এর কোনো বাস্তবতাও আছে।

মূলশব্দ

জলবায়ু পরিবর্তন, ঝুঁকি, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, উপকূল, কার্বন নিঃসরণকারী দেশ, কপ (কনফারেন্স অব পার্টি), নির্গমন হ্রাস বা কমিয়ে আনা, ধনী দেশ, নির্গমনকারী দেশ

১. ভূমিকা

উপকূলীয় ব-দ্বীপ হিসেবে বাংলাদেশ একটি দুর্যোগ ঝুঁকিপ্রবণ দেশ। এদেশে ঝড়-বন্যা-নদীভাঙনের মতো দুর্যোগগুলো নতুন নয়, বহুদিনের পুরনো এবং ঘটনাগুলো প্রাকৃতিক। তবে বিপজ্জনক হচ্ছে, প্রাকৃতিক এই ঘটনাগুলোর সঙ্গে মানুষের অদূরদর্শী কিছু কর্মকাণ্ডের প্রতিক্রিয়ায় দুর্যোগগুলো আরও জোরালো ও তীব্র হয়ে উঠেছে। প্রাকৃতিক ঘটনার চেয়েও অপ্রাকৃত বা মানুষের কর্মকাণ্ডের প্রতিক্রিয়ায় যে ক্ষতি তা এই মানুষের সমাজেই আঘাত হানতে শুরু করেছে। এমনি একটি প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, জলবায়ু পরিবর্তন। আমরা এখন মনুষ্যসৃষ্ট প্রতিক্রিয়ার হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্যে উপায় খুঁজছি। উপকূলীয় জন-জীবন এই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব-প্রতিক্রিয়ায় বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন। দুই বছরের মধ্যে (২০০৭এর ১৫ নভেম্বর সিডর ও ২০০৯এর ২৫ মে আইলা) বাংলাদেশের উপকূলভাগে দু'টি ঘূর্ণিঝড়ের আঘাত এবং তারপর থেকে প্রতি বছরেই বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগর, আন্দামান সাগর প্রভৃতিতে একাধিক ঘূর্ণিঝড় তৈরি হওয়া উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, এমন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘনঘটা আরও বাড়বে এবং সমানতালে বেড়ে যাবে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, বৈশ্বিক উষ্ণতা বেড়ে যাওয়ায় জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে। প্রকৃতপক্ষে, বায়ুমণ্ডলে গ্রীনহাউজ গ্যাসের (কার্বন-মনো-অক্সাইড, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, ক্লোরো-ফ্লোরো-কার্বন, সালফার, মিথেন প্রভৃতি) পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় পৃথিবীর উষ্ণতা দ্রুতহারে বাড়ছে। আর উষ্ণায়নের ফলে মেরু অঞ্চলের বরফ গলছে। উপরন্তু গরমের প্রতিক্রিয়ায় সমুদ্রের পানির প্রসারণ (thermal expansion) ঘটছে। ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে। সমুদ্রের এই বর্ধিত পানিরাশি উপকূল এলাকা ছাপিয়ে নেবে। বায়ুমণ্ডলে এই উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ছাড়াও আরও কিছু পরিবর্তন ঘটছে। যেমন, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কোথাও কমে যাওয়া, কোথাও বেড়ে যাওয়া; উষ্ণ এলাকায় উষ্ণতা বেড়ে যাওয়া; আবার শীত-প্রধান এলাকায় ঠাণ্ডার প্রকোপ আরও বেড়ে যাওয়া প্রভৃতি। অবশ্য সাধারণভাবে আমরা জানি যে, ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ বছরের গড় আবহাওয়াকেই জলবায়ু বলা হয়। জলবায়ুর একটি স্বাভাবিক পরিবর্তন রয়েছে; অতি মাত্রার গ্রীনহাউজ গ্যাস এই

স্বাভাবিক পরিবর্তনকে এক অস্বাভাবিক বিপজ্জনক জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছে। সাধারণভাবে বিজ্ঞানীরা এই গোটা পরিবর্তনটিকে জলবায়ু পরিবর্তন বলছেন। ইউএনএফসিসি (ইউনাইটেড নেশনস ফ্রেমওয়ার্ক অন ক্লাইমেট চেঞ্জ) বা জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকাসহ বিশ্বের উপকূলীয় দেশগুলোর এক বিরাট অংশ তলিয়ে যাবে।

২. উদ্দেশ্য

এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য তিনটি। এগুলো নিম্নরূপ:

ক. জলবায়ু পরিবর্তন ঘটছে কি-না; ঘটে থাকলে এই পরিবর্তনের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া কী, তা দেখা;

খ. জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আমাদের দেশে সম্ভাব্য কী ধরনের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে, তা বিশ্লেষণ করে দেখা;

গ. জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিশনেতৃবৃন্দ কী ভাবছেন এবং সম্ভাব্য ঝুঁকি মোকাবেলায় কি প্রস্তুতি নেয়া প্রয়োজন এবং তা নেয়া হচ্ছে কি না তা বিশ্লেষণ করা।

৩. পদ্ধতি

এটি একটি উদঘাটনমূলক গবেষণা। বর্তমান প্রবন্ধে গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এ প্রবন্ধের তথ্য-উপাত্তের জন্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক দুটো উৎসই ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎস হিসেবে উপকূলের মানুষের সাক্ষাৎকার ও তাদের জীবনযাত্রা পর্যবেক্ষণ এবং মাধ্যমিক উৎস হিসেবে বিভিন্ন গ্রন্থ, স্বীকৃত জার্নাল, ম্যাগাজিন, দৈনিক পত্র-পত্রিকার প্রতিবেদন, গবেষণা প্রতিবেদন, সেমিনার/কনফারেন্স-এর প্রতিবেদন প্রভৃতি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৪. বিশ্লেষণ

বাংলাদেশ, দক্ষিণ এশিয়ার একটি দেশ, যা ২৬° ৩৮' উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২০° ৩৪' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮° ০১' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ থেকে ৯২° ৪১' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই দেশটির পশ্চিম, উত্তর, আর পূর্ব সীমান্তজুড়ে রয়েছে ভারত। পশ্চিমে রয়েছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য। উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও মেঘালয় রাজ্য। পূর্বে ভারতের আসাম, ত্রিপুরা ও মিজোরাম। তবে পূর্বদিকে ভারত ছাড়াও মিয়ানমারের (বার্মা) সাথে সীমান্ত রয়েছে এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। ভূতাত্ত্বিকভাবে দেশটি থেকে উত্তর দিকে রয়েছে সুউচ্চ হিমালয় পর্বতমালা, যেখান থেকে বরফগলা পানির প্রবাহে সৃষ্ট বড় বড় নদী (গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা ইত্যাদি) বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে প্রবহমান এবং নদীগুলো গিয়ে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। বর্ষাকালে নদীবাহিত পানির প্রবাহ বেড়ে গেলে নদী উপচে পানি লোকালয়ে ঢুকে যায়, এবং দেশটি এভাবে প্রায় প্রতি বছরই বন্যায় আক্রান্ত হয়।[১]

এই দেশটির প্রায় মাঝখান দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা অতিক্রম করেছে এবং এর আবহাওয়াতে নিরক্ষীয় প্রভাব লক্ষ করা যায়। বছরে বৃষ্টিপাতের মাত্রা ১৫০০-২৫০০মিলিমিটার (৬০-১০০ইঞ্চি); পূর্ব সীমান্তে এই মাত্রা ৩৭৫০ মিলিমিটার (১৫০ইঞ্চির বেশি)। স্বাভাবিক অবস্থায় গড় তাপমাত্রা ২৫° সেলসিয়াস। আবহমান কাল থেকে এদেশে ঋতুবৈচিত্র্য বর্তমান ছিল, ছয়টি ঋতুর বৈশিষ্ট্য আলাদা আলাদাভাবে এই দেশে অনুভূত হয়। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত –এই ছয় ঋতুর কারণে দেশটিকে ষড়ঋতুর দেশও বলা হয়ে থাকে। নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত হালকা শীত অনুভূত হয়। মার্চ থেকে জুন পর্যন্ত গ্রীষ্মকাল চলে। জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এদেশে মৌসুমী বায়ু সক্রিয় থাকে, তাই জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত চলে বর্ষা মৌসুম। এসময় মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, যা অনেক সময় বন্যায় রূপ নেয়। এছাড়াও মৌসুমী বায়ুপ্রবাহের পূর্বমুহূর্তে কিংবা বিদায়ের পরপরই স্থলভাগে ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো, কিংবা সাগরে নিম্নচাপ, জল-ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ সৃষ্টি হয়, যার আঘাতে বাংলাদেশ প্রায় নিয়মিতই আক্রান্ত হয়। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ প্রভাবে বাংলাদেশের এই স্বাভাবিক চিত্রটি এখন অনেকখানি বদলে গেছে। তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ, সমুদ্রস্তর সকল দিক দিয়ে সংঘটিত এসকল পরিবর্তন বাংলাদেশে, জলবায়ুগত পরিবর্তন সৃষ্টি করেছে।

জলবায়ু পরিবর্তন কী এবং কেন

বায়ুমণ্ডলে গ্রীনহাউজ গ্যাসের (কার্বন-মনো-অক্সাইড, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, ক্লোরো-ফ্লোরো-কার্বন, সালফার, মিথেন প্রভৃতি) পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় পৃথিবীর উষ্ণতা দ্রুতহারে বাড়ছে। আর উষ্ণতার ফলে মেরু অঞ্চলের বরফ গলছে। উপরন্তু গরমের প্রতিক্রিয়ায় সমুদ্রের পানির প্রসারণ (thermal expansion) ঘটছে। এর ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে। সমুদ্রের এই বর্ধিত পানিরাশি উপকূল এলাকা ছাপিয়ে নেবে।

বায়ুমণ্ডলে এই উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ছাড়াও আরও কিছু পরিবর্তন ঘটছে। যেমন, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কোথাও কমে যাওয়া, কোথাও বেড়ে যাওয়া; গরম এলাকায় গরম বেড়ে যাওয়া, আবার শীতপ্রধান এলাকায় শীতের প্রকোপ আরও বেড়ে যাওয়া প্রভৃতি। জলবায়ুর একটি স্বাভাবিক পরিবর্তন রয়েছে; অতিমাত্রার গ্রীনহাউজ গ্যাস এই স্বাভাবিক পরিবর্তনকে এক অস্বাভাবিক বিপদজ্জনক জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছে। সাধারণভাবে বিজ্ঞানীরা এই গোটা পরিবর্তনটিকে জলবায়ু পরিবর্তন বলছেন।

বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, এসিড বৃষ্টি প্রভৃতির মতো দুর্যোগের ঘনঘটা এবং ধ্বংসযজ্ঞ বেড়ে যাবে। বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে ২০০৭ এবং ২০০৯ এর দু'টি ঘূর্ণিঝড়– সিডর এবং আইলার প্রচণ্ডতা এই আশঙ্কাটিকে সত্যে পরিণত করেছে। যদিও ঘূর্ণিঝড়ের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সিডর ছিল ধ্বংসযজ্ঞ ঘটানোর দিক দিয়ে ৪ নম্বর ক্যাটাগরির (ভয়াবহতার মাত্রাকে এক থেকে পাঁচ ভাগে ভাগ করে

বিজ্ঞানীরা এই ক্যাটাগরি নির্ধারণ করেছেন) এবং আইলা ছিল মাত্র এক নম্বর ক্যাটাগরির ঘূর্ণিঝড়। আর উত্তর আমেরিকায় আঘাত করা ঘূর্ণিঝড়টিকে সর্বোচ্চ ধ্বংসযজ্ঞ ক্ষমতা সম্পন্ন অর্থাৎ পাঁচ নম্বর ক্যাটাগরির ঘূর্ণিঝড় বলা হচ্ছে।

কেন এই জলবায়ু পরিবর্তনের ঘটনা ঘটছে? এই প্রশ্নের একেবারে সাদামাটা জবাব হচ্ছে, বাতাসে কার্বনআশ্রিত বা গ্রীনহাউজ গ্যাস বেশি পরিমাণে নির্গমন হচ্ছে বলেই জলবায়ুর এই দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে (মনে রাখতে হবে, জলবায়ুর একটি স্বাভাবিক পরিবর্তন আছে; শুধুমাত্র জলবায়ু নয়, প্রকৃতির সকল বিষয়েই একটি স্বাভাবিক পরিবর্তন রয়েছে)। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কোন কোন দেশ গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমন করছে এবং কেন-ই-বা তারা এই গ্যাস নির্গমন বন্ধ করছে না। ধনী তথা শিল্পোন্নত দেশগুলোই এই অতিরিক্ত মাত্রার গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমন করছে। ধনী দেশগুলোর শিল্প-কলকারখানা এবং সেই দেশগুলোর নাগরিকদের আরাম-আয়েশের জন্যে ব্যবহৃত গাড়ি, ফ্রিজ, এয়ার-কন্ডিশনার প্রভৃতি থেকে গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গত হচ্ছে। আর ধনী দেশগুলোর এই আরাম-আয়েশের বিষে আমাদের মতো উপকূলীয় গরীব দেশগুলোর বিপন্নতা ও নানা নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ক্রমাগত বেড়ে চলেছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রকৃতিতে নানা ধরনের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে শুরু করেছে। বিশেষত প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিমাণ বাড়তে শুরু করেছে, আর এতে ক্ষয়-ক্ষতিও হচ্ছে প্রচুর। এসব দুর্যোগের মধ্যে বন্যাঝুঁকি, স্বাস্থ্যের উপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া পড়তে শুরু করেছে।

বন্যাঝুঁকি

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়ায় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশে ৪ কোটি ২০ লাখেরও বেশি মানুষ বন্যাঝুঁকিতে পড়তে পারে। আগের পূর্বাভাস হতে যা প্রায় ৯ গুণ বেশি।[২] আগের পূর্বাভাস অনুযায়ী বাংলাদেশের ৫০ লাখ মানুষের বন্যাঝুঁকিতে পড়ার আশঙ্কা ব্যক্ত করা হয়েছিল। জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সাম্প্রতিক এক গবেষণায় নতুন এই সতর্কবার্তা দেয়া হয়েছে। এই গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে একটি প্রতিবেদন ২৯ অক্টোবর যুক্তরাজ্যের প্রভাবশালী 'নেচার' সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে।

গবেষণাটি করেছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক 'ক্লাইমেট সেন্ট্রাল' নামের একটি প্রতিষ্ঠান। তারা ডিজিটাল এলিভিয়েশন মডেলিং (ডিইএম) ব্যবহার করে স্যাটেলাইটে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে এই গবেষণাটি করেছে। এখানে ধরে নেওয়া হয়েছে, যে হারে বাতাসে কার্বন নিঃসরণ হচ্ছে এবং পৃথিবীর উষ্ণতা যে হারে বাড়ছে, যদি তা একই রকম থাকে, তবে ২০৫০ সাল নাগাদ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা আগের পূর্বাভাসের তুলনায় অনেক বাড়বে; এর প্রভাবে পৃথিবীর ৩০ কোটিরও বেশি মানুষ ক্ষয়ক্ষতির শিকার হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতাজনিত কারণে বাংলাদেশসহ এশিয়ার ছয়টি দেশ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এগুলো হচ্ছে– চীন, বাংলাদেশ, ভারত, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া ও থাইল্যান্ড। বলা হচ্ছে, চীনে ক্ষতির আশঙ্কাটি সবচেয়ে বেশি- ৯ কোটি ৩০ লাখ, বাংলাদেশে ৪ কোটি ২০ লাখ, ভারতে ৩ কোটি ৬০ লাখ, ভিয়েতনামে ৩ কোটি ১০ লাখ, ইন্দোনেশিয়ায় ২ কোটি ৩০ লাখ এবং থাইল্যান্ডে ১ কোটি ২০ লাখ মানুষ ক্ষতির শিকার হতে পারে। এর আগের পূর্বাভাস মতে, চীনে ২ কোটি ৯০ লাখ, বাংলাদেশে ৫০ লাখ, ভারতে ৫০ লাখ, ভিয়েতনামে ৯০ লাখ, ইন্দোনেশিয়ায় ৫০ লাখ এবং থাইল্যান্ডে ১০ লাখ মানুষ ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হয়েছিল।

২০৫০ সাল নাগাদ বন্যা-ঝুঁকি : ক্লাইমেট সেন্ট্রাল

পানি ও জলবায়ু বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ড. আইনুন নিশাত এ বিষয়ে দৈনিক কালের কণ্ঠ পত্রিকায় দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আমরা যে ক্ষতিগ্রস্ত হবো, তাতো পুরনো কথা। ২০০৯ সাল থেকে আমরা বলছি, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে আমাদের উপকূলভাগ তলিয়ে যাবে। আক্ষরিক অর্থে আমরা তলিয়ে যাবো না; কারণ, আমাদের উপকূল জুড়ে ১৫ ফুট উচ্চতার বাঁধ আছে। কিন্তু বিপদ হচ্ছে, জলোচ্ছ্বাস। যদি জলোচ্ছ্বাস বিশ ফুট উচ্চতার হয়, তবে আমরা তা ঠেকাতে পারবো না। তবে বাংলাদেশ সরকার বিশ ফুট উচ্চতা বাঁধের পরিকল্পনা করে এগুচ্ছে। আমরা নিকট অতীতেই দেখেছি, জাপানে ত্রিশ ফুট উচ্চতার জলোচ্ছ্বাস হয়েছে। এমন জলোচ্ছ্বাস আমাদের অঞ্চলে হলে সেটি খুবই বিপজ্জনক হবে।' তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কানাডার উত্তর অঞ্চল, গ্রীনল্যান্ড, রাশিয়ার ভ্লাদিভোস্তক-এর মতো

দু'একটি অঞ্চল ছাড়া পৃথিবীর সব জায়গাতেই কম-বেশি ক্ষতি হবে। দুর্যোগের মাত্রা বাড়বে। ইতিমধ্যে আমরা সে আলামতও দেখছি। ক্যালিফোর্নিয়াতে আগুনের ঘটনা ঘটেছে এবং দুনিয়াজুড়ে বাড়ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ।

আগের পূর্বাভাসে বন্যা-ঝুঁকি প্রবণতা : ছবি : ক্লাইমেট সেন্ট্রাল

সাম্প্রতিক গবেষণা মতে, উষ্ণায়নের এই প্রক্রিয়া থামানো না গেলে ২১০০ সাল নাগাদ এই ছয়টি দেশের ২৫ কোটি মানুষ বসবাস করে যে ভূমিতে তা জোয়ারের পানির তলায় নিমজ্জিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের পাঁচ কোটি মানুষ ক্ষতির শিকার হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। এছাড়া এশিয়ার অন্য পাঁচটি দেশের মধ্যে চীনের ৮ কোটি ৭০ লাখ, ভারতে ৩ কোটি ৮০ লাখ, ভিয়েতনামে ৩ কোটি ৫০ লাখ, ইন্দোনেশিয়ায় ২ কোটি ৭০ লাখ এবং থাইল্যান্ডে ১ কোটি ৩০ লাখ মানুষ ক্ষতির শিকার হতে পারে।

সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশের উপকূলীয় সকল জেলা – সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, বরগুনা, পটুয়াখালী, বরিশাল, ভোলা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, কক্সবাজারের কোথাও কোথাও বেশি বা অংশবিশেষ এলাকা ছাড়াও যশোর, মাদারীপুর, শরিয়তপুর,

ঢাকা জেলার কিছু অংশ এবং হাওড় এলাকার একটি অংশ ক্ষতির শিকার হতে পারে। সাধারণভাবে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে গেলে জোয়ারের চাপ বাড়বে; এতে জোয়ারের পানি নদীগুলো দিয়ে উজানের (উত্তরের) দিকে অনেক দূর পর্যন্ত উঠে আসবে। পানির প্রবল চাপে দু'কুল ছাপিয়ে যাবে; বন্যা-কবলিত হয়ে পড়বে বসতি, ভূমি। ড. আইনুন নিশাতের মতে, উপকূলীয় এলাকার বাঁধই হলো আমাদের রক্ষাকবচ। বিপজ্জনক হচ্ছে, জলোচ্ছ্বাস। ঘূর্ণিঝড়ের পরিমাণ যেভাবে বাড়ছে, সমান তালে জলোচ্ছ্বাসও যদি বাড়ে তবেই শঙ্কা। ওই শঙ্কা মোকাবেলা করতে আমাদের সক্ষমতা বাড়ানোর কোন বিকল্প নেই।

ক্লাইমেট সেন্ট্রাল-এর জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী ও এই গবেষণা প্রতিবেদনের প্রধান লেখক ড. স্কট কাপ এ প্রসঙ্গে বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যে আভাসগুলো পাওয়া যাচ্ছে, তাতে আমাদের জীবদ্দশাতেই আমাদের নগর ও উপকূলীয় আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। জোয়ারের সীমা বেড়ে ভূমিতে বসবাসকারী মানুষগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হলে, কতোদিন এবং কিভাবে উপকূলীয় মানুষগুলো টিকে থাকবে তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেবে।

ক্লাইমেট সেন্ট্রালের ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাতাসে যদি কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিঃসরণের পরিমাণ আমরা ব্যাপকমাত্রায় কমিয়ে আনতে পারি, তাহলে হয়তো এমন দুঃখজনক পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে না। আর কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিঃসরণের পরিমাণ যদি বর্তমান মাত্রায় স্থির থাকে, তাহলে পরিস্থিতির খুব বেশি উন্নতি হবে না। ফলে আমাদের উচিত, বাতাসে কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ ব্যাপকমাত্রায় কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা পালন করা।

জনস্বাস্থ্যের উপর প্রতিক্রিয়া

চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক প্রভাবশালী সাময়িকী 'ল্যানসেটে' প্রকাশিত এক গবেষণা প্রবন্ধে বলা হয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশে ডেঙ্গু রোগের ঝুঁকি ৩৬% বেড়েছে।[৩] 'ল্যানসেট কাউন্টডাউন অন হেলথ অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ ২০১৯' নামের এই গবেষণা প্রবন্ধটি ১৪ নভেম্বর ২০১৯এ প্রকাশিত হয়।

ল্যানসেট-এর প্রবন্ধে বলা হয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ডেঙ্গু সংক্রমণের হার বেড়েছে এবং শিশুদের মধ্যে এই রোগের প্রকোপ বেশ। বাংলাদেশে ডেঙ্গু বিস্তারের ক্ষেত্রে উষ্ণ তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাতের তারতম্য- এই তিনটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ডেঙ্গু সংক্রমণের ক্ষেত্রে এই তিনটি বিষয়েরই আন্তঃসম্পর্ক বিদ্যমান। যেমন, বাংলাদেশে অসময়ে বৃষ্টিপাত ও তাপদাহের পরিমাণ বেড়েছে। তবে উন্নত বিশ্বের দেশগুলো তাদের জনস্বাস্থ্যখাতের সক্ষমতা উন্নয়নের মাধ্যমে ডেঙ্গু ঝুঁকি কমিয়ে আনতে পেরেছে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ পিছিয়ে আছে।

দেশের স্বাস্থ্য বিভাগের তথ্য অনুযায়ী ২০১৯ সালে ডেঙ্গু রোগের প্রকোপ বেশি। জানুয়ারি হতে অক্টোবর পর্যন্ত ডেঙ্গু রোগে ৯৩ হাজার মানুষ আক্রান্ত হয়েছে; এ সময়ে মারা গেছে ৯৮ জন।

ল্যানসেট-এর গবেষণায় দেখা গেছে, উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে ২০১০ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে জনস্বাস্থ্য খাতে আরও বরাদ্দ বেড়েছে। এর ফলে তারা ডেঙ্গু ঝুঁকি ৩১ শতাংশ কমিয়ে আনতে পেরেছে। এর বিপরীতে, পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলে ডেঙ্গু ঝুঁকি বেড়েছে। বাংলাদেশে ২০১০ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ডেঙ্গু ঝুঁকি প্রায় ৩৯ শতাংশ কমে গিয়েছিল কিন্তু ২০১৪ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে এই ঝুঁকি আবারও প্রায় ৩৬ শতাংশ বেড়ে গেছে।

গবেষণায় বলা হয়, ডেঙ্গু ঝুঁকি নির্ণয়ের জন্যে দুটি বিষয় (সূচক) বিবেচনায় নেওয়া হয়। প্রথমটি হলো, ডেঙ্গু ছড়ানোর ক্ষেত্রে দুই ধরনের এডিস মশার (এডিস ইজিপ্টি ও এডিস অ্যালবোপিকটাস) উপযোগী জলবায়ুর উপস্থিতি। এবং দ্বিতীয়টি হলো, ডেঙ্গু আক্রান্তদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসার জন্যে স্থানীয় স্বাস্থ্যখাতের সক্ষমতা। এই সক্ষমতা পরিমাপ করা হয় বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা নির্ধারিত ইন্টারন্যাশনাল হেলথ রেগুলেশনস কোর ক্যাপাসিটি মনিটরিং ফ্রেমওয়ার্কের ভিত্তিতে। এই দুটি সূচকের ভিত্তিতে সাম্প্রতিক তথ্য বিশ্লেষণ করে গবেষকরা দেখেছেন যে, বাংলাদেশ ডেঙ্গুর ক্ষেত্রে একটি ঝুঁকিপূর্ণ দেশে পরিণত হয়েছে।

বিশ্বের ৩৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার তত্ত্বাবধানে ২০১৯ সালের ল্যানসেট কাউন্টডাউন গবেষণাটি পরিচালিত হয়। এতে কাজ করেছেন যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি কলেজ লণ্ডন, যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল ইউনিভার্সিটি, চীনের ইউনিভার্সিটি অব শিংগুয়া, সুইজারল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অব জেনেভা, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা, বিশ্বব্যাংক প্রভৃতির ১২০ জন চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ।

দ্যা ল্যানসেট কাউন্টডাউন-এর নির্বাহী পরিচালক ও প্রতিবেদনের প্রধান লেখক ড. নিক ওয়াটস এ প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের বলেন, শিশুরা প্রধানত স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে থাকে। কারণ, তাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তখনও যথাযথভাবে তৈরি হয় না। এমনি এক সময়ে শিশুর শরীরে যদি এই ধরনের সংক্রমণ ঘটে, তবে তার পুরো জীবনে এর প্রভাব পড়ে। একারণে আগামী প্রজন্মের স্বার্থে গ্রীনহাউজ গ্যাস নিঃসরণের মাত্রা কমিয়ে আনা উচিত বলে তিনি মন্তব্য করেন।

এছাড়াও ল্যানসেট, বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য-প্রভাব নিয়ে তাদের গবেষণা রিপোর্টে বলেছে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সংক্রমণ ও কীটপতঙ্গবাহিত রোগের ধরনে পরিবর্তন আসবে; তাপপ্রবাহে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়বে; জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, কালবৈশাখী ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয়ে সরাসরি জখমের সংখ্যাও বাড়বে। বিপুল সংখ্যক মানুষ নিজস্ব আবাস ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে পড়বে, সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়বে গর্ভবতী মায়েদের জীবনে। তারা পান না ন্যূনতম স্বাস্থ্য-সুবিধা, ফলে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সন্তান জন্ম দেওয়া, লালন-পালনের কারণে অনায়াসেই সন্তানের শরীরে রোগ-ব্যাধি জায়গা করে নেবে।

বৃষ্টিপাত হ্রাস

ভারতের আবহাওয়া দপ্তরের ১৯৫১ থেকে ২০০৪ খ্রিস্টাব্দের সংগৃহীত উপাত্তের ভিত্তিতে নয়াদিল্লির ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির সেন্টার ফর অ্যাটমোসফেরিক সায়েন্সেস বিভাগের উদ্যোগে বৃষ্টিপাতের ব্যাপ্তি, বর্ষা মৌসুমের ব্যাপ্তি ও বৃষ্টির পরিমাপ ইত্যাদি উপাত্ত যাচাই করে দেখা গেছে যে, ভারতীয় উপমহাদেশে বৃষ্টিপাত কমছে। দেখা গেছে, চারদিনের বেশি সময় ধরে কমপক্ষে ২.৫ মিলিমিটার বৃষ্টিপাতের ঘটনা কমে গেছে। যদিও স্বল্প সময়ের জন্য বৃষ্টিপাত বেড়েছে। কিন্তু এতে মৌসুমী বৃষ্টিপাতের চক্র দুর্বল হয়ে গেছে। এই পরিস্থিতি এজন্য আশঙ্কাজনক যে, এই উপমহাদেশের কৃষিকাজ দীর্ঘমেয়াদি বৃষ্টির উপযোগী। ইতোমধ্যেই (২০০৯) বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে, ধানের ফুল আসার সময় থেকে বীজ বের হওয়ার মাঝখানের সময়টুকুতে প্রয়োজনের তুলনায় বৃষ্টিপাত কম হওয়ায় টি-আমন জাতের ধানের উৎপাদন কমে আসছে। এমনকি ভরা বর্ষায় জয়পুরহাটের কালাই উপজেলায় অনাবৃষ্টিতে আমন ধানের বিশাল খেত রোদে পুড়েছে (২০১০)। যেখানে আমন ধান রোপনের অন্তত ৩ সপ্তাহ পর্যন্ত পানি ধরে রাখা নিশ্চিত করতে হয়, নাহলে কুশি বাড়ে না; সেখানে পানির অভাবে জমিতে ফাটল দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের দেয়া তথ্যমতে, ২০১০ সালে (৪৭,৪৪৭ মিলিমিটার), বিগত ১৫ বছরের তুলনায় (১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দের পরে) সবচেয়ে কম বৃষ্টিপাত হয়েছে, এমনকি এই পরিমাণ ২০০৯ সালের তুলনায় ৯,০০০ মিলিমিটার কম।

লবণাক্ততা বৃদ্ধি

বৃষ্টিপাত কমে যাওয়ায় নদ-নদীর পানিপ্রবাহ শুকনো মৌসুমে স্বাভাবিক মাত্রায় থাকে না। ফলে নদীর পানির বিপুল চাপের কারণে সমুদ্রের নোনাপানি যতটুকু এলাকাজুড়ে আটকে থাকার কথা ততটুকু থাকে না, পানির প্রবাহ কম থাকার কারণে সমুদ্রের নোনাপানি স্থলভাগের কাছাকাছি চলে আসে। ফলে লবণাক্ততা বেড়ে যায় দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের বিপুল এলাকায়। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে এমনটা দেখতে পাওয়া যায়, সেখানে শুষ্ক মৌসুমে গঙ্গার পানির প্রবাহ কমে যাওয়ায় লবণাক্ততা বৃদ্ধি পায়। এই সমস্যা উপকূলীয় অঞ্চল থেকে যশোর, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর এবং কুমিল্লা পর্যন্ত উত্তর দিকে বিস্তৃত হয়েছে এবং আরো উত্তরে বিস্তৃত হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে দেশে লবণাক্ত ভূমির পরিমাণ ছিল ৮,৩০,০০০ হেক্টর, আর ২০০১ খ্রিস্টাব্দে এসে তা হয়েছে ৩০,৫০,০০০ হেক্টর। কম বৃষ্টিপাতের কারণে উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততার সমস্যা দিনে দিনে আরো প্রকট হয়ে উঠবে বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত।[৪]

সুন্দরবন

বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক গঠন এমন যে, কোথাও কোথাও ভূভাগ যথেষ্ট ঢালু। খুলনার সুন্দরবনের অবস্থান এমন একটা জায়গায়, যা ত্রিভুজাকৃতির বঙ্গোপসাগরের শীর্ষবিন্দুতে গাঙ্গেয় মোহনায় অবস্থিত। এই গাঙ্গেয় মোহনার মহীঢাল খুব মসৃণভাবে সমুদ্রে নেমে গেছে। এর ফলে আন্দামান

সাগরে উৎপন্ন জলঘূর্ণিঝড়গুলোর উত্তরমুখী যাত্রায় মহীঢালের অগভীরতার কারণে জলোচ্ছ্বাস অত্যন্ত উঁচু হয়ে আসে। সাগরের জোয়ারও অপেক্ষাকৃত উঁচু হয়। তাই সাগরের নোনাপানি ঢুকে পড়ে উপকূলভাগে, লবণাক্ত করে তোলে ভূ-অভ্যন্তরের পানিও।[৫]

অস্বাভাবিক তাপমাত্রা

বাংলাদেশ নাতিশীতোষ্ণ তাপমাত্রার দেশ হিসেবে পরিচিত হলেও বিগত কয়েক বছরে তাপমাত্রার অস্বাভাবিক আচরণ সেই পরিচিতি ম্লান করে দিচ্ছে। ১৯৬০ সালে বঙ্গীয় এলাকায় সর্বোচ্চ ৪২.৩° সেলসিয়াস তাপমাত্রা নথিভুক্ত করা হয়। স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশে ১৯৭২এর ৩০ মে তাপমাত্রা নথিভুক্ত করা হয় ৪৫.১° সেলসিয়াস, রাজশাহীতে। ১৯৯৫ এসে নথিভুক্ত করা হয় ৪৩° সেলসিয়াস। ২০০৯ সালের ২৬ এপ্রিল নথিভুক্ত করা হয় বিগত ১৪ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪২.২° সেলসিয়াস, যশোরে।[৬] তাপমাত্রার এই পরিসংখ্যানে আপাতদৃষ্টিতে যদিও মনে হচ্ছে তাপমাত্রা কমছে, কিন্তু বস্তুত, অতীতের সর্বোচ্চ গড় তাপমাত্রা ছিলো কম, অথচ বর্তমানে সর্বোচ্চ গড় তাপমাত্রা অত্যধিক বেশি। কেননা, ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ডলাইফ ফান্ড বা WWF-এর গবেষণায় দেখা যায়, শুধু ঢাকা শহরেই মে মাসের গড় তাপমাত্রা ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দের ঐ মাসের তুলনায় বেড়েছে ১° সেলসিয়াস; নভেম্বর মাসে এই তাপমাত্রা ১৪ বছর আগের তুলনায় বেড়েছে ০.৫° সেলসিয়াস।[৭] আবহাওয়া অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, গত ৫০ বছরে দেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার ০.৫%।[৮] এমনকি ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের তাপমাত্রা গড়ে ১.৪° সেলসিয়াস এবং ২১০০ সাল নাগাদ ২.৪° সেলসিয়াস বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে।[৯]

তাপমাত্রা বাড়ার ঘটনাটি অনেকটা সম্পুরক হারে ঘটবে। কেননা বাড়তি তাপমাত্রার কারণে পানির বাষ্পীভবন বেড়ে যাবে এবং বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাড়িয়ে দেবে।[১০] বাতাসে জলীয় বাষ্প বেড়ে যাওয়া মানে আর্দ্রতার পরিমাণ বেড়ে যাওয়া। আর্দ্র বাতাসের প্রভাবে প্রকৃত তাপমাত্রা না বাড়লেও অনুভূত তাপমাত্রা (feels like) বেড়ে যাবে। ফলে তাপমাত্রার তুলনায় বেশি গরম অনুভূত হবে। ইতোমধ্যেই একটি জরিপে দেখা গেছে, বাংলাদেশের আর্দ্রতার মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া ২০৩০ সাল নাগাদ বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১০-১৫ ভাগ এবং ২০৭৫ সাল নাগাদ তা প্রায় ২৭ ভাগ বেড়ে যাবে। এই আর্দ্রতা গরম বাড়িয়ে দিবে। উল্লেখ্য, বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (WMO)-র মতে, ২০১০ সাল ছিল ২৫০ বছরের মধ্যে বিশ্বের উষ্ণতম বছর, আর ২০০১ থেকে ২০১০ সময়টুকু ছিল বিশ্বের উষ্ণতম কাল।[১১]

গ্রীষ্মকালে যেখানে তাপমাত্রা বাড়বে, শীতকালে ঠিক একইভাবে তাপমাত্রা মারাত্মকভাবে কমবে। ২০০৩ সালের পর ২০১১ সালে প্রচণ্ড শৈত্যপ্রবাহের কবলে পড়ে বাংলাদেশ। শ্রীমঙ্গলে নথিভুক্ত করা হয় ৬.৪° সেলসিয়াস তাপমাত্রা। পরিবেশ ও জলবায়ুবিদদের মতে, এ সময় অনুভূত তাপমাত্রা হয়েছিল আরো কম।

মরুকরণ

দিনে দিনে বৃষ্টিপাত কমে যাচ্ছে, সময়মত হচ্ছেনা বন্যা। ২০০৮ সালে বাংলাদেশের গড় বৃষ্টিপাত ছিল ২৩০০ মিলিমিটার, বরেন্দ্র এলাকায় গড় বৃষ্টিপাত হয়েছিল ১১৫০ মিলিমিটার। এরকম স্বল্প বৃষ্টিপাত দিন দিন বেড়েই চলেছে। এর ফলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নেমে গিয়ে খরায় আক্রান্ত হবে বিপুল সংখ্যক মানুষ, এর মধ্যে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের লোকই বেশি। গবেষকদের মতে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ২০৫০ সাল নাগাদ খরায় উদ্বাস্তু হবে প্রায় ৮০ লাখ মানুষ।[১২]

ভূগর্ভস্থ পানির স্তর হ্রাস

বিভিন্ন স্থানে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর হ্রাস পেয়ে দেখা দিচ্ছে স্থায়ী মরুকরণ। রাজশাহীর বরেন্দ্র এলাকায় বৃষ্টিপাত কমে যাওয়ায় নেমে যাচ্ছে পানির স্তর। অনাবৃষ্টির দরুণ ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে। এছাড়া সুপেয় পানির অভাবে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যাপক ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায়ও ভূগর্ভস্থ পানি কমে যাচ্ছে।[১৩]

সুপেয় পানির অভাব

২০০৯ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে জাতিসংঘের আন্তঃসরকার জলবায়ু পরির্বতন-সংক্রান্ত প্যানেলের (IPCC) পানিসম্পদের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিয়ে তৈরি প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশসহ সমুদ্রতীরের বেশ কটি দেশে সামনের দিনে মিঠা পানির তীব্র সংকট দেখা দেবে। বিশেষ করে, দেশের উত্তরাঞ্চলে এই অভাব প্রকট। নওগাঁ জেলার ১১টি উপজেলার মধ্যে পোরশা, সাপাহার, নিয়ামতপুর, ধামইরহাট, পত্নীতলা-এই পাঁচটি উপজেলা নিয়ে যে বরেন্দ্রভূমি, সেখানকার সরকারি-বেসরকারি ৫৪০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় সবকটিতেই ভূগর্ভস্থ পানির স্তর হ্রাস পাওয়ায় স্বাভাবিক নলকূপগুলো অকেজো হয়ে পড়েছে। ফলে দেখা দিয়েছে সুপেয় পানির সংকট। এছাড়া শুষ্ক মৌসুমে এমনিতেই যেখানে পানির স্তর কমে যায়, সেখানে গাছপালার প্রস্বেদন বেড়ে যাওয়ায় ভূগর্ভের সুপেয় পানির অভাব দেখা দিচ্ছে।[১৪]

জলোচ্ছ্বাস

জলোচ্ছ্বাস বা সাইক্লোন যদিও স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের জন্য একটি নৈমিত্তিক ঘটনা, কেননা ভারত মহাসাগরের উত্তর দিকের এই অঞ্চলটি যথেষ্ট ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ অঞ্চল। প্রায় প্রতি বছরের এপ্রিল, মে, জুন এবং সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বরে বঙ্গোপসাগরে লঘুচাপ ও নিম্নচাপের সৃষ্টি হয় ও তা জলঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়।[১৫] আর সেই তাণ্ডবে ব্যাপক জলোচ্ছ্বাসে তলিয়ে যায় উপকূলবর্তী হাজার হাজার একর স্থলভাগ।

বৈশ্বিক উষ্ণতার ঝুঁকিতে থাকা পাঁচটি ক্যাটাগরিতে ১২টি দেশের তালিকা				
মরুকরণ	বন্যা	ঝড়	সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি	কৃষিতে অনিশ্চয়তা
মালাউয়ি	বাংলাদেশ	ফিলিপাইন	সব নীচু দেশ	সুদান
ইথিওপিয়া	চীন	বাংলাদেশ	ভিয়েতনাম	সেনেগাল
জিম্বাবুয়ে	ভারত	মাদাগাস্কার	মিসর	জিম্বাবুয়ে
ভারত	কম্বোডিয়া	ভিয়েতনাম	তিউনিশিয়া	মালি
মোজাম্বিক	মোজাম্বিক	মলদোভা	ইন্দোনেশিয়া	জাম্বিয়া
নাইজার	লাওস	মঙ্গোলিয়া	মৌরিতানিয়া	মরক্কো
মৌরিতানিয়া	পাকিস্তান	হাইতি	চীন	নাইজার
ইরিত্রিয়া	শ্রীলঙ্কা	সামোয়া	মেক্সিকো	ভারত
সুদান	থাইল্যান্ড	টোঙ্গা	মিয়ানমার	মালাউয়ি
শাদ (চাদ)	ভিয়েতনাম	চীন	বাংলাদেশ	আলজেরিয়া
কেনিয়া	বেনিন	হন্ডুরাস	সেনেগাল	ইথিওপিয়া
ইরান	রুয়ান্ডা	ফিজি	লিবিয়া	পাকিস্তান
				সূত্র : বিশ্বব্যাংক

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের ঝড় সতর্কীকরণ কেন্দ্রের দেয়া তথ্য মতে, ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের ২৯ এপ্রিলের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ের পর ১৯৯৫, ১৯৯৭, ২০০০, ২০০১ খ্রিস্টাব্দে জল-ঘূর্ণিঝড় হলেও তা তেমন ক্ষয়ক্ষতি করেনি। ২০০১ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত বলতে গেলে তেমন কোনো ঘূর্ণিঝড়ই হয়নি। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনে একদিকে যেমন বাড়ছে জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতা, তেমনি বাড়ছে এদের সংখ্যা। ২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বর বাংলাদেশে আঘাত হানে ঘূর্ণিঝড় সিডর। তার মারাত্মক প্রভাব রেখে যেতে না যেতেই তার পিছু পিছু ২০০৮ সালের ২ মে ধেয়ে আসে ঘূর্ণিঝড় নার্গিস, একই বছর ২৬ অক্টোবর ঘূর্ণিঝড় রেশমি, ১৫ নভেম্বর ঘূর্ণিঝড় খাইমুক, ২৬ নভেম্বর নিসা, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দের ১৭ এপ্রিল বিজলি, এবং ঐ বছরের ২৫ মে ঘূর্ণিঝড় আইলা। আইলায় খুলনা, সাতক্ষীরা ও কক্সবাজার উপকূলে বাঁধের (পানি উন্নয়ন বোর্ড- পাউবো'র বাঁধ) ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

২০১৩ সালের ১-১৭ মে ঘূর্ণিঝড় ভিয়ারু, আনুষ্ঠানিকভাবে যা মহাসেন নামে পরিচিত হয়, আঘাত হানে চট্টগ্রামে। এতে ১৭ জন মারা যায়। ২০১৫এর ২৯ জুলাই ঘূর্ণিঝড় কোমেন ঘন্টায় ৭৫ কিমি বেগে চট্টগ্রামের নিকটে আঘাত হানে। ঘূর্ণিঝড়ের ফলে সৃষ্ট বন্যায় ১৩২ জন অধিবাসী, যার মধ্যে কোমেন-এর সরাসরি প্রভাবে ন্যূনতম ৩৯ জন মারা যায়। ২০১৬ সালের ২১ মে ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুও আঘাত হানে চট্টগ্রাম উপকূলে। এতে ২৬ জন নিহত হয়।

একই বছর ২০১৬ সালের ২০ আগস্ট ঘূর্ণিঝড় ডিয়ামু-এর আংশিক আঘাত বাংলাদেশের উপর দিয়ে বয়ে যায়। পরের বছর ২০১৭ সালের ৩০ মে ভোর চারটার দিকে ঘূর্ণিঝড় 'মোরা' টেকনাফ ও সেন্টমার্টিন এলাকা অতিক্রম করে। ঘূর্ণিঝড় তিতলি ২০১৮ এর ৬-৯ অক্টোবর পর্যন্ত সক্রিয় ছিল। ভারত মহাসাগরে জন্ম নেয়া এই ঘূর্ণিঝড়টি আমাদের উপকূল ভাগে চোখ রাঙিয়ে ভারতের কলকাতা থেকে ৮০০ কিলোমিটার দক্ষিণে উড়িষ্যা ও অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে আঘাত হানে। ২০১৯ সালের ৪ মে সকালে বাংলাদেশের সাতক্ষীরা, যশোর ও খুলনা অঞ্চল এবং এর আশেপাশের এলাকায় আঘাত হানে ঘূর্ণিঝড় ফণী। আঘাতের আগে এটি দুর্বল হলেও ১৮ জনের মৃত্যু হয়। এবছরই নভেম্বরের ১০ তারিখ সকালে অতি তীব্র ঘূর্ণিঝড় বুলবুল দুর্বল হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। এটি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উপকূলে ক্যাটাগরি-২ মাত্রার তীব্রতায় আঘাত করে। বলা হচ্ছে, এমন ব্যাপক বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় এর আগে দেখা গেছে ১৯৬০ সালে। তবে বাংলাদেশের জন্যে আশার কথা হ'ল, এটি বেশ দুর্বল হয়েই বাংলাদেশে প্রবেশ করে; তাই ক্ষয়ক্ষতি হয় কম।

শিলাবৃষ্টি

দিনে দিনে শিলাবৃষ্টি বেড়ে যাচ্ছে বাংলাদেশে। প্রতি বৈশাখে সাধারণত প্রাকৃতিক স্বাভাবিক কারণেই মাঝে মাঝে শিলাবৃষ্টি হয় এদেশে। ২০১০ সালের পর থেকে বাংলাদেশে শিলাবৃষ্টির পরিমাণ বেড়ে গেছে। ২০১০ সালের ২৭ মার্চ রাতে প্রচণ্ড ঝড় ও শিলাবৃষ্টি বয়ে যায় লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ ও হাতীবান্ধা উপজেলার উপর দিয়ে। স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য থেকে জানা যায়, ছোট শিলার ওজন আধা কেজির কম হবে না আর বড়গুলো দেড় কেজির মতো। কেউ কেউ ওজন করে দেখেছেন বলেও দাবি করেন। এতো বড় বড় শিলাবৃষ্টির আঘাতে অনেকের টিনের ঘর ঝাঁঝরা হয়ে যায়। লোকজন ও গবাদি পশু আহত হয়। নষ্ট হয়ে যায় লিচুর আবাদ, ক্ষতিগ্রস্ত হয় গম, তামাক, ভুট্টা আর বোরোক্ষেত। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, এর আগে এতো বড় শিলার আঘাত তারা কখনোই শোনেননি।

বন্যা

বিশ্বব্যাংক প্রকাশিত তালিকায় বন্যার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ১২টি দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম।[১৬] বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থানের কারণে হিমালয়ের বরফগলা পানিসহ উজানের নেপাল ও ভারতের বৃষ্টিপাতের পানি, বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদ-নদী হয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। প্রতি বছর গড়ে প্রায় ১০৯৪ বিলিয়ন কিউবিক মিটার পানি বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং প্রতি বছরই প্রায় ১৫ লক্ষ হেক্টর চাষের জমি বন্যা ও জলাবদ্ধতার কবলে পড়ে। এদিকে পূর্বানুমান করা হয়েছে যে, শুধু বাংলাদেশেই ২০৩০ সাল নাগাদ বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১০-১৫ ভাগ এবং ২০৭৫ সাল নাগাদ তা প্রায় ২৭ ভাগ বেড়ে যাবে। এই বাড়তি পানি বাংলাদেশের উপর দিয়ে সমুদ্রে যাবার সময় বন্যা হবে। এমনকি ২০১০ সালে বিগত ১৫ বছরের তুলনায় সবচেয়ে কম বৃষ্টিপাত হলেও উত্তরাংশের সিলেট ও রাজশাহীতে আগের দুই বছরের তুলনায় বেশি বৃষ্টিপাত

হওয়ায় হাকালুকি হাওরসহ উত্তরাঞ্চলের বিপুল নিচু এলাকা প্রায় ৭ মাস ধরে প্লাবিত থাকে। কারো মতে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ২০৫০ সাল নাগাদ বন্যায় উদ্বাস্তু হবে প্রায় ৭ কোটি মানুষ।[১৭]

নদীভাঙন

বাংলাদেশে, সাধারণত বর্ষাকালে উজানে প্রচুর বৃষ্টিপাতের দরুন নদীর পানি বেড়ে যায় এবং তা প্রচণ্ড গতিতে সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়। এসময় উপকূলীয় অঞ্চলের নদীসংলগ্ন স্থলভাগে পানির তীব্র স্রোতে সৃষ্টি হয় নদীভাঙনের। বাংলাদেশে এটা স্বাভাবিক চিত্র হলেও সাম্প্রতিক গবেষণায় তা আর স্বাভাবিক বলে পরিগণিত হচ্ছে না। পানি উন্নয়ন বোর্ডের দেয়া তথ্যমতে পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা অববাহিকার প্রায় ১,২০০ কিলোমিটার জুড়ে ভাঙন অব্যাহত আছে। আরও প্রায় ৫০০ কিলোমিটার এলাকায় নতুন করে ভাঙন দেখা দিতে পারে। এতে কৃষি জমির এক বিরাট অংশ নদীগর্ভে তলিয়ে যাবে। অথচ এর বিপরীতে যে চর জেগে উঠছে, তা অপ্রতুল।[১৮]

ভূমিকম্পের আশঙ্কা

প্রাকৃতিকভাবেই কার্বন চক্রের প্রভাবে ভূমিকম্প হয়ে থাকে। বাংলাদেশেও তার ব্যত্যয় ঘটে না। বিগত প্রায় ২৫০ বছরের ইতিহাসে দেখা যায়, ১৯০০ সাল হতে ২০০৪ পর্যন্ত বাংলাদেশে ১০০'রও বেশি ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে; এরমধ্যে ৬৫টিরও বেশি ঘটেছে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের পরে। এ থেকে পরিষ্কার যে, গত ৩০ বছরে ভূমিকম্প সংঘটনের মাত্রা বেড়েছে।[১৯]

বাংলাদেশে ৮টি ভূতাত্ত্বিক চ্যুতি এলাকা বা ফল্ট জোন সচল অবস্থায় রয়েছে। এগুলো হচ্ছে : বগুড়া চ্যুতি এলাকা, রাজশাহীর তানোর চ্যুতি এলাকা, ত্রিপুরা চ্যুতি এলাকা, সীতাকুণ্ড-টেকনাফ চ্যুতি এলাকা, হালুয়াঘাট চ্যুতি এলাকা, ডাওকী চ্যুতি এলাকা, ডুবরি চ্যুতি এলাকা, চট্টগ্রাম চ্যুতি এলাকা, সিলেটের শাহজীবাজার চ্যুতি এলাকা (আংশিক-ডাওকি চ্যুতি) এবং রাঙামাটির বরকলে রাঙামাটি চ্যুতি এলাকা।[২০] ভারতীয়, ইউরেশীয় এবং বার্মার (মায়ানমারের) টেকটনিক প্লেটের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান। ভারতীয় এবং ইউরেশীয় প্লেট দুটি ১৯৩৪ সালের পর থেকে দীর্ঘদিন যাবত হিমালয়ের পাদদেশে আটকা পড়ে আছে, অপেক্ষা করছে বড় ধরনের ভূ-কম্পনের। এছাড়াও পৃথিবীর মোট ১১টি মূল টেকটনিক প্লেটের ৭ নম্বর প্লেটটি মেঘালয়, মিয়ানমার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম হয়ে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। বঙ্গোপসাগরের তলদেশে মিয়ানমারের কাছেই সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চলে প্লেটটি আরেকটি প্লেটের নিচে ঢুকে যাচ্ছে এবং সেখানে একটি চ্যুতি (রাখাইন চ্যুতি) তৈরি হচ্ছে, যা ৬.৫ থেকে ৭ মাত্রার ভূমিকম্প সৃষ্টি করতে পারে।

সাম্প্রতিককালে ঘন ঘন স্বল্প মাত্রার ভূমিকম্প হচ্ছে। মতবিরোধ থাকলেও অনেক ভূতাত্ত্বিক ছোট ছোট ভূমিকম্প সংঘটন বড় ধরনের ভূমিকম্পের পূর্বাভাস বলে উল্লেখ করেন। অতীতের এসব তথ্য পর্যালোচনা করে গবেষকরা বলছেন, যেকোনো সময় বাংলাদেশে রিখটার স্কেলে ৮ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানতে পারে।[২১]

সুনামির সম্ভাবনা

বাংলাদেশের সামগ্রিক ভূতাত্ত্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করে ভূতাত্ত্বিকদের অভিমত, বঙ্গোপসাগর অভ্যন্তরে F১, F২, F৩ এবং F৪ নামে ৪টি ভূ-কম্পন উৎস রয়েছে। এগুলোর প্রতিটিই রিখটার স্কেলে ৭-৭.৫ মাত্রার ভূমিকম্প তৈরি করতে পারে এবং যেকোনো সময় ভূমিকম্প সৃষ্টি করে সুনামি ঘটাতে পারে।[২২] ভূমিকম্প সংঘটনের মাত্র ৩০মিনিট থেকে ১ ঘণ্টার মধ্যে সুনামি, বাংলাদেশের উপকূলে আছড়ে পড়তে পারে। ১৭৬২ সালে সমুদ্রতলে সৃষ্ট একটি ভূমিকম্প থেকে সৃষ্ট সুনামি বাংলাদেশের উপকূলে আছড়ে পড়েছিল, এমনকি ২০০৪ সালে বাংলাদেশ থেকে ২১০০ কিলোমিটার দূরের সুমাত্রা থেকে বাংলাদেশের ফাটল বরাবর সৃষ্ট একটি ভূমিকম্পের দরুন সৃষ্ট সুনামি প্রায় ৩ ঘণ্টা পরে বাংলাদেশের উপকূলে আছড়ে পড়েছিল। ১৭৬২ সালে ভূমিকম্পের কারণে সৃষ্ট ফাটলটি এখনও সক্রিয় রয়েছে।

অস্ট্রেলীয় একদল ভূ-বিজ্ঞানী একটি জরিপে আশংকা প্রকাশ করে বলেছেন, বাংলাদেশের নদীবিধৌত পলি সমুদ্রতলে যে সকল পাহাড় বা টিলার সৃষ্টি করেছে, ভূমিকম্পের কারণে সেগুলোতে ধ্বস সৃষ্টি হলেও বড় ভূমিকম্প বাংলাদেশে আঘাত হানতে পারে। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, বাংলাদেশের উপকূলে ৮০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত ফল্ট এলাকায় ভূমিকম্প থেকে সৃষ্ট সুনামি প্রায় ৪ মিটার (১৩ ফুট) উচ্চতার সুনামি বাংলাদেশে আঘাত হানতে পারে। এরমধ্যে নিঝুম দ্বীপ ৩মিটার (১০ফুট), সুন্দরবন, কক্সবাজার এবং ভোলার কিছু অংশ ২ মিটার (৬.৫ ফুট), ছোট ছোট চর ও দ্বীপাঞ্চল যেমন মনপুরা, মেঘনার মোহনা ইত্যাদি ২ মিটার (৬.৫ ফুট) উচ্চতার জলোচ্ছ্বাস দ্বারা প্লাবিত হবে। এরকম সুনামি আঘাত হানলে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, পটুয়াখালী, ভোলা, বাগেরহাট, খুলনা, বরিশাল ও সাতক্ষীরায় কয়েকশ' কিলোমিটার সমুদ্রোপকূলীয় অঞ্চল বিপর্যস্ত হবে বলে আশংকা করা হয়।[২৩]

সমুদ্রস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধি (SLR)

বঙ্গোপসাগরের সাথে বাংলাদেশের ৭১০ কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূলভাগ থাকায় দিনে দিনে সমুদ্রস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধিতে ডুবে যাবার শঙ্কা রয়েছে। জাতিসংঘের আন্তঃসরকার জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্যানেল-এর তথ্যমতে ২০৫০ সালে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১ মিটার বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশের অন্তত ১৭% ভূমি সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যাবে।[২৪] 'দ্য সায়েন্টিফিক কমিটি অন এন্টার্কটিক রিসার্চ' (SCAIR) জানিয়েছে, যে হারে এন্টার্কটিকার বরফ গলছে, তাতে ২১০০ সাল নগাদ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ৫ ফুট বৃদ্ধি পেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বিগত দিনের পরিসংখ্যানের প্রায় দ্বিগুণ এই হিসাবের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটেনের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (DFID) এ পরিমাণ উচ্চতাবৃদ্ধিতে বাংলাদেশের প্রায় এক পঞ্চমাংশ সমুদ্রে তলিয়ে যাবার আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। বিশ্বব্যাংক প্রকাশিত তালিকায় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিতে ঝুঁকিপূর্ণ ১২টি দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান দশম। এরকম অকস্মাৎ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিতে ২০৫০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ দেশের প্রায় ৮%-এরও বেশি নিম্নাঞ্চল ও প্লাবনভূমি আংশিক অথবা স্থায়ীভাবে জলমগ্ন হয়ে পড়বে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদ্রবিজ্ঞানীদের দেয়া তথ্যমতে, ২০০০ সালের পূর্ব পর্যন্ত সমুদ্র, প্রতি বছর ৩ মিলিমিটার (০.১২ ইঞ্চি) করে বাড়ছিল, কিন্তু পরবর্তী দশকেই প্রতি বছর ৫ মিলিমিটার (০.২ ইঞ্চি) করে বাড়তে শুরু করেছে।[২৫] ২০০৩ সালে সার্কের "আবহাওয়া গবেষণা কেন্দ্র" (SMRC)-এর একটি গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে যে, হিরণ পয়েন্ট, চর চাঙ্গা, এবং কক্সবাজারে জোয়ারের পানির স্তর প্রতি বছর যথাক্রমে ৪.০ মিলিমিটার, ৬.০ মিলিমিটার এবং ৭.৮ মিলিমিটার বেড়েছে।

ইউনেস্কো'র প্রতিবেদন মতে, সমুদ্রস্তরের ৪৫ সেন্টিমিটার উচ্চতা বৃদ্ধিতে সুন্দরবনের ৭৫% ডুবে যেতে পারে।[২৬] ইতোমধ্যেই (২০০৯) সুন্দরবনের পশ্চিম বন বিভাগের সবচেয়ে গহীন অরণ্যে, বঙ্গোপসাগর থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে মান্দারবাড়িয়া ক্যাম্পসহ ১৫ থেকে ২০ কিলোমিটার এলাকার ভূমি সমুদ্রগর্ভে হারিয়ে গেছে, যেখানে সুপেয় পানির একমাত্র উৎস একটি পুকুর ছিল। নদীভাঙনের ফলে জঙ্গলের ছোট ছোট খাল ও নদী পলি জমে ভরাট হয়ে যাওয়ায় জোয়ারের পানি একবার উঠলে আর নামতে পারছে না; পরবর্তী জোয়ারে আরও ভেতরে পানি যাচ্ছে বলে এসব এলাকার গাছপালার বৃদ্ধি কমে যাচ্ছে।[২৭]

জলবায়ু উদ্বাস্তু

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের পাশাপাশি নদ-নদীর পানি কমে যাওয়া, জমিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে ধীরে ধীরে মাৎস্য সম্পদের (মাছ ও জলজ প্রাণী) ঘাটতির আশঙ্কা করা হয়। আবহাওয়াজনিত নানা পরিবর্তনে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় খাদ্যঘাটতির আশঙ্কাও কেউ কেউ করে থাকেন। তবে সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়টি হচ্ছে জলবায়ু উদ্বাস্তু হওয়ার শঙ্কা।

নিকট অতীতে ২০০৯এর ২৫ মে ঘূর্ণিঝড় আইলা'র কারণে খুলনার দাকোপ উপজেলার কামারখোলা ও সুতারখালী ইউনিয়নের কমপক্ষে দুশতাধিক পরিবার একেবারে উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে। আশঙ্কা করা হয়, ২০৫০ সাল নাগাদ ৩ কোটি মানুষ গৃহহীন হতে পারে।[২৮] ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির সংবাদ মতে, বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে বাংলাদেশে প্রতি বছর এক থেকে দেড় কোটি মানুষ বড় বড় শহরের দিকে ধাবিত হচ্ছে।[২৯] আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বিপুল সংখ্যক মানুষ খুলনার দাকোপ ও কয়রা এলাকা ছেড়ে নিকটবর্তী শহর, রাজধানী ঢাকা, রাঙ্গামাটি পাড়ি জমিয়েছে।[৩০] ২০০৯ সালে ভোলা জেলার রাজাপুর ইউনিয়নের ৬৫০টি পরিবার ঘর-জমি হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছে।[৩১] ২০০৮ সালে সাতক্ষীরা জেলার প্রায় ৪২ হাজার মানুষ এলাকা ছাড়তে বাধ্য হয় আচমকা বন্যায়।[৩২]

বিশেষত নদীভাঙ্গনের ফলে দেশের নানা প্রান্তের মানুষ সবকিছু হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ছে। বাবা-মা হারিয়ে অনেক শিশু এতিম হয়ে পড়ছে। আর্থিক অনটন ও জীবন-জীবিকার উৎস হারিয়ে পড়া

পরিবারের শিশুরা ভোগে নানা রোগে-শোকে। বন্ধ হয়ে যায় তাদের লেখাপড়া, জীবনযুদ্ধে পিছিয়ে যেতে যেতে হারিয়ে যেতে বসে সেসব শিশুরা।

জীবিকার উৎস ধ্বংস

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশ-নির্ভর উপজীবীরা তাদের জীবিকা হারিয়ে কর্মহীন হয়ে পড়বে বলে আশঙ্কা করা হয়। এতে দেশে বেকার সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করবে। যেমন মাছের উৎপাদন কমে যাওয়ায় স্বাদু পানির মৎস্যজীবী, সমুদ্রগামী জেলে, উপকূলীয় জেলে ও তাদের পরিবারগুলো জীবিকার উৎস হারাবে।[৩৩] এরকম ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে কক্সবাজারেরই লক্ষাধিক জেলে।[৩৪] সাম্প্রতিক বছরগুলোয় ঘন ঘন নিম্নচাপ সৃষ্টি হওয়ায় সতর্ক সংকেতের কারণে সমুদ্রগামী জেলেরা মাছ আহরণে বাধা পেয়েছে। সতর্ক সংকেতের কারণে বারে বারে নিরাপদ স্থানে ফিরে আসায় তাদের পুঁজি হারিয়েছে, তবে তেমন আয় হয়নি; এতে দেনা-চক্র হতে তারা বের হতে পারছে না।

অর্থনৈতিক ক্ষতি

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার দুর্যোগে মানুষ তাদের সহায়-সম্বল হারায়। গৃহস্থ পরিবারের গরু, ছাগল, মহিষ, হাঁস, মুরগি, বৃক্ষাদি, শস্য, মৎস্য সম্পদ, শস্যবীজ, গবাদি পশুর শুকনো খাদ্য, এমনকি মাছ ধরার জাল, ঝুড়ি, কিংবা জমি চাষের উপকরণ হারিয়ে যায়। ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের পর গবাদি-পশুর শুকনো খাদ্যের আকালে পড়ে অনেক পরিবার। এছাড়া সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের পর লবণপানির প্রভাবে লবণাক্ত জমি হয়ে পড়ে অনুর্বর। ফলে কখনও সাময়িক, কখনও দীর্ঘ সময়র জন্য এক বিরাট আর্থিক অনটনের মুখোমুখি হয় দুর্যোগ-আক্রান্ত মানুষেরা।

জাতীয় পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার প্রয়োজনে বাংলাদেশকে বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখিন হতে হচ্ছে। নানারকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঠেকাতে ও চলমান দুর্যোগ মোকাবিলা করতে বিদ্যমান অবকাঠামোগত স্থাপনায় আনতে হচ্ছে নকশাগত ও অবকাঠামোগত পরিবর্তন। যেমন– লোনা পানি ঠেকাতে দেশের উপকূলীয় এলাকায় বাঁধের (পোল্ডার) নকশা পাল্টে মেরামত ও নতুন পোল্ডার তৈরি করা এবং নদীর পানিপ্রবাহ বৃদ্ধি ও আচরণগত পরিবর্তনে সেচ প্রকল্পের সংস্কার সাধন করতে হচ্ছে। তাছাড়া উপর্যুপরি প্রাকৃতিক দুর্যোগে দেশের অবকাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতির সংস্কার কিংবা পুনর্নির্মাণে প্রতি বছর বাজেটে বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করতে হয়।

বাংলাদেশের অর্থনীতির এক বিরাট অংশ মাৎস্য (মাছ ও অন্যান জলজ প্রাণী-যেমন কাঁকড়া) সম্পদের উপর নির্ভরশীল। কর্মসংস্থান, বৈদেশিক মুদ্রা থেকে শুরু করে চিকিৎসা খাতও এর উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। বাংলাদেশে প্রায় ১ লাখ ৪৭ হাজার হেক্টর (এক হেক্টর = ২.৪৭ একর; এক একর = ১০০ শতক) পুকুর, ৫ হাজার ৪৮৮ হেক্টর বাওর এবং ১১ লাখ হেক্টর জমিতে চিংড়ি চাষ হয়। এছাড়া প্রায় ৪৪ লাখ ৭০ হাজার হেক্টর মুক্ত জলাশয়ে (নদী, হাওর, বিল, খাল) ২৫০

প্রজাতির মাছের বসবাস, যার মধ্যে ২৪টি প্রজাতির প্রজননও এখানেই হয়ে থাকে। এই বিপুল মাৎস্যসম্পদ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে হুমকির মুখে।

আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান জার্মান ওয়াচের গবেষণা প্রতিবেদন (২০১০) অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সার্বিকভাবে বাংলাদেশের বার্ষিক ক্ষতির পরিমাণ ২,১৮৯ মিলিয়ন ডলার, জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে যা ১.৮১% নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৯৯০ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত সারা বিশ্বে হওয়া ক্ষতির প্রায় ২০%-ই বাংলাদেশে হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনে ইতিবাচক প্রভাব

বাংলাদেশ সরকারের প্রাকৃতিক সম্পদবিষয়ক গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সার্ভিসেস (CEGIS)-এর এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হিমালয় থেকে সৃষ্ট নদীসমূহ হতে প্রতি বছর ১০০ টন পলি এসে সমুদ্রে পড়ে আর তা সমুদ্রের জোয়ার-ভাটায় এসে উপকূলে জমা হয়। হিমালয়কেন্দ্রিক নদীগুলো হয়ে যে পলি বাংলাদেশে আসে, তার তিন ভাগের এক ভাগ দেশের ভেতরের নদী ও নদীতীরে জড়ো হয়। এর এক অংশ নোয়াখালী, খুলনা, সাতক্ষীরা, যশোর এলাকার উপকূলীয় নদী, এবং বাকি অংশ সমুদ্র হয়ে (সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড) ইন্দোনেশিয়ার দিকে চলে যায়, এভাবে নতুন ভূমি জেগে ওঠে। এছাড়াও ১৯৫০ সালে আসামে ভূমিকম্পের পর হিমালয়ের একটি বিশাল অংশের পলি হিমালয়-সৃষ্ট নদীগুলো দিয়ে বঙ্গোপসাগরে এসে পড়ে। বিগত ৬৫ বছরে এভাবে পলি জমা হয়ে বাংলাদেশের উপকূলে ১,৮০০ বর্গকিলোমিটার ভূমি জেগে উঠেছে। আগামী ১০০ বছরে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে গিয়ে দেশের ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীগুলোতে পানির পরিমাণ বাড়লেও একই সঙ্গে পলির পরিমাণও বাড়বে।

গবেষণায় এও দেখা গেছে যে, বাংলাদেশের ভূখণ্ডের মেঘনা হচ্ছে পৃথিবীর একমাত্র সক্রিয় বদ্বীপ এলাকা, যেখানে ভূমি এখনো (এপ্রিল ২০১০) গঠিত হচ্ছে। খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলার সীমানায় অবস্থিত পশুর, শিবসা ও বলেশ্বর নদী দিয়ে প্রচুর পরিমাণে পলি এসে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে জড়ো হচ্ছে। নোয়াখালী উপকূলে সবচেয়ে বেশি ভূমি জেগে উঠেছে। ফলে দেশের বেশিরভাগ উপকূল ও নদীর তীরবর্তী এলাকা ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা নেই। সিইজিআইএসের গবেষণা পরিচালক মমিনুল হক সরকার পরিচালিত 'মেঘনা এস্টুয়ারি-ইফেক্ট অব ১৯৯৫ আর্থকোয়েক অ্যান্ড ফিউচার ডেভেলপমেন্ট' এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (ADB) আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত আরেকটি গবেষণার প্রাথমিক ফলাফলের ভিত্তিতে তৈরি 'বাংলাদেশের নদীর ওপরে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব: মাঠপর্যায়ের গবেষণাভিত্তিক ফলাফল' শীর্ষক প্রতিবেদনে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।[৩৫]

৫. নীতিনির্ধারকদের ভাবনায় জলবায়ু পরিবর্তন ও প্যারিস চুক্তি

ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরো শহরে ১৯৯২ সালে প্রথম ধরিত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বলা যায়, কার্বনের বিপদ সম্পর্কে দুনিয়াব্যাপী মানুষেরা তখন থেকেই আলোচনা করতে শুরু করে। আগে যে

বিষয়টি ছিল গবেষক-বিজ্ঞানী এবং সীমিত সংখ্যক নীতি-নির্ধারকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ, সেই বিষয়টি অনেক বেশি নীতি-নির্ধারক এবং আম-জনতার মধ্যে চলে আসে। আজ দুনিয়াব্যাপী মানুষেরা জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদ সম্পর্কে জানে। এবং এও জানে এর জন্যে দায়ী গ্রীনহাউজ গ্যাস তথা কার্বন ও কার্বন যৌগের গ্যাস। যা ধনী, উন্নত দেশগুলোর শিল্পায়নের উপজাত (by-product) হিসেবে দুনিয়াব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে। ফলে পৃথিবী উষ্ণায়নের জন্যে দায়ী এই গ্যাসগুলোর বিস্তার রোধে কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ কমিয়ে আনার বিষয়ে বিশ্বনেতারাও কথাবার্তা বলতে শুরু করেন।

কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে আনার বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কথাবার্তা হয় জাপানের কিয়োটো শহরে ১৯৯৭ সালে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে। সেই সম্মেলনে কোনো চুক্তি হয়নি, তবে একটি প্রোটোকল স্বাক্ষরিত হয়। যাকে বলা হয় কিয়োটো প্রোটোকল। সেই প্রটোকলে বর্ণিত বিষয়, বিশেষ করে কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে আনার বিষয়টি ধনী শিল্পোন্নত কার্বন নিঃসরণকারী দেশগুলো মানতে রাজি হচ্ছিল না। এক পর্যায়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এর বিরোধিতাই করে। যেহেতু প্রটোকল কোনো চুক্তি নয়, প্রোটোকল কাউকে মানতে বাধ্য করা যায় না; এ কারণে একটি চুক্তির কথা জোরেশোরে আলোচিত হতে থাকে। স্বাভাবিকভাবে প্রত্যাশা তৈরি হয় যে, ওই চুক্তিতে কার্বন নিঃসরণের হার কমিয়ে আনার অঙ্গীকার এবং এরজন্যে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে ক্ষতিপূরণ দেয়ার বিষয়টি বর্ণিত থাকবে।

প্রকৃতপক্ষে জাতিসংঘের নেতৃত্বে এই আলোচনাটি হয়। যেখানে বিজ্ঞানীরা ও রাষ্ট্রপ্রধানরাও অংশ নেন। আলোচনার বিষয় কার্বন নির্গমন কমিয়ে আনা এবং এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলো কিভাবে ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারে, তার পথ বের করা। জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে এই সম্মেলনকে কনফারেন্স অব পার্টি (Conferrence of Parties বা সংক্ষেপে CoP বাংলায় কপ) বলা হয়। সাধারণত প্রতি বছরেই একবার কপ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ২০১৯ সালের ২ থেকে ১৩ ডিসেম্বর স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে কপ-এর ২৫তম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যদিও এই বৈঠকটি চিলিতে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল; কিন্তু সেদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে বৈঠক আয়োজনে অপারগতা প্রকাশ করায় মাদ্রিদে অনুষ্ঠিত হয়।

কপ বৈঠকগুলোয় শীর্ষ নেতারা মিলিত হয়েও কার্বন গ্যাস নির্গমনের মাত্রা কমিয়ে আনতে একমত হতে পারেননি। অনেক আলোচনা, আলোচনা থেকে বেরিয়ে যাওয়া, আবারও আলোচনায় ফিরে আসা, কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে আনার দেশীয় পর্যায়ে অঙ্গীকার করা প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে ১৯৯৭ এর ১৮ বছর পর ২০১৫ এর নভেম্বর- ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত প্যারিস সম্মেলনে (কপ ২১) একটি যেনতেন গোছের চুক্তি হয়। মোটাদাগে প্যারিস চুক্তির বিষয় হলো :

১. যত দ্রুত সম্ভব বাতাসে গ্রীনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ বৃদ্ধির হার শূন্যে নিয়ে আসতে হবে। পাশাপাশি, এই শতকের মধ্যে বাতাসে গ্রীনহাউস গ্যাস তৈরি হওয়া এবং তার শোষণের মধ্যে ভারসাম্য তৈরি করতে হবে।

২. পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে বাঁধতে হবে। তবে পাখির চোখ করতে হবে দেড় ডিগ্রির সীমাকে।

৩. এই লক্ষ্যে কাজ কতটা হয়েছে, তার মূল্যায়ন করতে হবে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর।

৪. উন্নয়নশীল দেশগুলোকে ২০২০ সালের মধ্যে জলবায়ু-সুরক্ষা খাতে বছরে ন্যূনতম ১০ হাজার কোটি মার্কিন ডলার অনুদান দিতে হবে। কাজ এগোলে ভবিষ্যতেও আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি মিলবে। প্রাথমিক লক্ষ্য পূরণে কাজ এগোলে ২০২৫ সালে আর্থিক অনুদান বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা হবে।

বিস্ময়কর হচ্ছে, কিয়োটো প্রটোকলে শিল্পোন্নত ৩৭টি দেশ কার্বন নিঃসরণ কমানোর আইনি বাধ্যবাধকতাসহ সমঝোতায় পৌঁছেছিল। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে তাদের মোট বার্ষিক আয়ের দশমিক ৭ শতাংশ দেওয়ার অঙ্গীকার করেছিল। ওই অঙ্গীকার পূরণ না হলে জরিমানার বিধানও ছিল। কিন্তু কোনো দেশই তা বাস্তবায়ন করেনি। আর প্যারিস চুক্তিতে রাষ্ট্রগুলো অঙ্গীকার অনুযায়ী কার্বন নিঃসরণ না কমালে জাতিসংঘের বা ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর কিছু বলার আইনি অধিকারও নেই।

চুক্তিতে জলবায়ুর ক্ষয়ক্ষতি (লস অ্যান্ড ডেমেজ) অংশে প্রধান কার্বন নিঃসরণকারী দেশগুলো সুকৌশলে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষয়ক্ষতি থেকে দায়মুক্তি নিয়েছে। কোনো দেশের জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের কারণে অন্য কোনো দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার দায়িত্ব বিমা প্রতিষ্ঠানগুলো পালন করবে বলে চুক্তিতে বলা হয়। এর মধ্য দিয়ে শিল্পোন্নত দেশগুলোর বিমা কোম্পানিগুলো ক্ষতিগ্রস্ত দেশ থেকে উল্টো আরও বেশি অর্থ নিয়ে যাবে। ফলে এটি আসলে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে আরও আর্থিক ক্ষতির মুখে ঠেলে দেবে। অথচ জলবায়ু বিপন্ন দেশগুলো আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে কিভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা করবে তা চমৎকারভাবে লেখা হয়েছে।

যদিও প্যারিসের দর কষাকষিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে অর্থের যোগান। উন্নয়নশীল দেশগুলো দাবি তুলছে, জীবাশ্ম জ্বালানী ব্যবহার বাদ দিয়ে সরাসরি নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারের দিকে যেতে তাদের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রয়োজন। আগামী ২০২০ সাল নাগাদ এই খাতে বছরে ১শ' বিলিয়ন ডলারের যে প্রতিশ্রুতি পাওয়া যাচ্ছে যাতে অনেক দেশই তুষ্ট নয়। চুক্তি বাস্তবায়ন করতে হলে ২০২০ সালের পরেও বছরে ১শ' বিলিয়ন ডলারের সহায়তা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন বলে মনে করছে তারা।

চুক্তি অনুযায়ী এই শতাব্দীর মধ্যে বিশ্বের তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রাখাটাও একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। কারণ, চুক্তিতে রাষ্ট্রগুলো স্বপ্রণোদিতভাবে কার্বন নিঃসরণ কমানোর যে লক্ষ্যমাত্রা দিয়েছে, তা যদি শতভাগ বাস্তবায়িতও হয়, তাহলেও বিশ্বের তাপমাত্রা এই শতাব্দীর মধ্যে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি বাড়বে বলে বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন।

তারপরও চুক্তিটি যে হতে পারলো এবং সকলেই একে মেনে নিল, এর কারণ, এতে সচেতনভাবেই এক ধরনের নমনীয়তা রাখা হয়েছে। এতে ১৯৫টি আলাদা দেশের বিচিত্র স্বার্থকে যেমন জায়গা

দেওয়া হয়েছে; তেমনি এর আইনি কর্তৃত্ব নেই বললে চলে। আইনি বাধ্যবাধকতার কড়াকড়ি কম থাকায় ধনী ও কার্বন নিঃসরণের জন্যে দায়ী দেশগুলোকে যেমন এই চুক্তি কার্যকরে বাধ্য করা যাবে না; আবার দরিদ্র ও বিপন্ন দেশগুলোর সরকারকে আশ্বস্ত করতে চুক্তিটিতে অনেক উদ্দীপনামূলক কথার সমাবেশ ঘটানো হয়েছে।

প্যারিসে স্বার্থ ক্ষুণ্ন বাংলাদেশের

প্যারিসে টানা দুই সপ্তাহ আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক, দরকষাকষির পর বৈশ্বিক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা নিয়ে একমত হয়ে যে চুক্তিটি হলো, তাতে বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশগুলো ও দ্বীপ রাষ্ট্রগুলোর স্বার্থ অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়ে। বিশেষ করে ক্ষয়ক্ষতির দাবি, জলবায়ু উদ্বাস্তু সমস্যা, নতুন তহবিলের জোগানসহ আরো কিছু বিষয়ে আগের চেয়েও কঠিন সব শর্ত জুড়ে দেওয়া হয় কিংবা আগে যেসব সুবিধা সহজ ছিল সেগুলো বাদ দেওয়া হয়।

উপরন্তু চুক্তিটি কার্যকর করা যাবে কি-না, তা নিয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ, ২০১৭এর মধ্যে (প্যারিস সম্মেলনের পর দুই বছর) বিশ্বের বেশির ভাগ কার্বন নিগর্মনকারী ৫৫টি দেশের অনুমোদন পাওয়ার ওপর ভিত্তি করে চুক্তি কার্যকর করার প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কথা ছিল। বলাইবাহুল্য, সকল দেশ এতে অনুমোদন দেয়নি। উপরন্তু, অন্যতম প্রধান দূষণকারী দেশ-আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এই চুক্তি হতে বেরিয়ে যেতে চাইছে। এছাড়াও উন্নত দেশগুলো প্রতিশ্রুতির ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার দেওয়ার ক্ষেত্রে ২০২০ সাল থেকে সময় বাড়িয়ে ২০২৫ সালে নিয়ে গেছে। যা বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্বার্থবিরোধী।

আরও আছে চুক্তির ৫২ নম্বর সিদ্ধান্ত। যা বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর জন্য কালো অধ্যায়। কারণ ওই সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে, ক্ষতিপূরণের জন্য কোনো দেশ নিজ থেকে দায়ী দেশগুলোর প্রতি দাবি জানাতে পারবে না। তবে উন্নত দেশগুলো তাদের মর্জি অনুসারে সহায়তা দিতে পারে। একই সঙ্গে 'মাইগ্রেশন' শব্দ বাদ দিয়ে কেবল 'ডিসপ্লেসমেন্ট' যোগ করা হয়েছে; যাতে জলবায়ু উদ্বাস্তুদের স্বার্থ বিঘ্নিত হয়েছে। সহায়তার ক্ষেত্রে এতে সমস্যা দেখা দেবে।

কোপেনহেগেন কনসেনসাস সেন্টারের প্রেসিডেন্ট ও জলবায়ু বিজ্ঞানী বিজর্ন লুমবুর্গ চুক্তিটি ব্যাখ্যা করে বলেছেন, এই চুক্তি বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তনের ১ শতাংশ সমাধান করতে পেরেছে। ২০৩০ সাল পর্যন্ত এই চুক্তি বিশ্বের মাত্র ১ শতাংশ কার্বন নিঃসরণ কমাতে পারবে। এই চুক্তি সত্যিকার অর্থে বাস্তবায়িত হলে তা হবে পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে ব্যয়বহুল চুক্তি। কেননা, এই চুক্তির আওতায় বিশ্বের ১৯৫টি দেশ কার্বন নিঃসরণ কমানোর যে অঙ্গীকার করেছে, তাতে জ্বালানি খাতে রাষ্ট্রগুলোর খরচ অনেক বাড়িয়ে দেবে। এর পরিমাণ হতে পারে বছরে এক ট্রিলিয়ন ডলারের ওপরে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উৎপাদন ব্যয় বেড়ে গেলে অনেক দেশেরই বার্ষিক প্রবৃদ্ধি (জিডিপি) কমে যাবে। কিন্তু জলবায়ু তহবিল হিসেবে ২০২০ সাল থেকে এক কোটি ডলারের যে তহবিলের কথা বলা হয়েছে, তা চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য একদমই অপ্রতুল।

লুমবুর্গের এই বিশ্লেষণের সঙ্গে অনেকেই ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন। তবে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করছেন, এমন বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞ প্যারিস চুক্তিকে আশার ফুলঝুরি হিসেবেই দেখছেন। তাঁরা বলছেন, চুক্তিতে সব দেশের দাবি কোনো না কোনোভাবে আছে। কিন্তু কার্বন নিঃসরণ কমানো এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে অর্থ দেওয়ার প্রধান দাবি বাস্তবায়নের কোনো সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা চুক্তিতে নেই। একারণে চুক্তিটিকে 'নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো' বলা যেতে পারে।

সর্বোপরি, প্যারিস চুক্তিতে বিশ্বের সকল দেশের দাবি বিবেচনায় আনায় প্রধান কার্বন নিঃসরণকারী রাষ্ট্রগুলোর কী পরিমাণে কার্বন নিঃসরণ কমানো উচিত এবং তারা কতটুকু কমানোর অঙ্গীকার করল, তা বিবেচনাই করা হয়নি। ফলে চুক্তি একটি আমরা পেয়েছি, যাতে শিল্পোন্নত ও স্বল্পোন্নত দুই ধরনের দেশই তাদের অবস্থান থেকে ছাড় দিয়ে একমত হয়েছে যে, বিশ্বের তাপমাত্রা ২ ডিগ্রির নিচে রাখতে হবে। কিন্তু কিভাবে, তার ব্যাখ্যা বা নির্দেশনা নেই। ফলে কার্বন নিঃসরণকারী দেশগুলো কার্বন নিঃসরণ করেই যাবে, মধ্যবর্তী পর্যায়ের দেশগুলো তাদের উন্নয়নের স্বার্থে কার্বন নিঃসরণ করবে; আর স্বল্পোন্নত দেশগুলো ক্ষতির শিকার হচ্ছে বলে চিৎকার করবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর বাজার চাহিদা লক্ষ্য রেখে উন্নত দেশগুলো তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটাবে। ফলে বলাই যায়, এই চুক্তিতে লাভবান হবে কার্বন নিঃসরণকারী ধনী দেশগুলোই।

বিস্ময়কর হলেও সত্যি যে, প্যারিস চুক্তির ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ কপ সম্মেলনেও (মাদ্রিদ কপ ২৫) কোনো অগ্রগতি হয়নি। আশা করা হয়েছিল, কার্বন নিঃসরণ কমানোর বিষয়ে যদি ধনী দেশগুলোর কোনো প্রতিশ্রুতি মেলে। কিন্তু তা হয়নি। সকলেই বলেছে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দুর্যোগ দুনিয়াব্যাপী বেড়েছে এবং সম্ভাব্য দুর্যোগ মোকাবেলা করা কঠিন হবে; তারপরও ধনী দেশগুলো কার্বন নিঃসরণ কমাতে কোনো অঙ্গীকার করেনি। এমনকি, সহায়তার অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রেও কোনো অগ্রগতি হয়নি।

৬. উপসংহার

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট বিপন্নতা থেকে কিভাবে রক্ষা বা মোকাবেলা করা যায়, তা নিয়ে দুনিয়াব্যাপী জোর আলোচনা চলছে। ধনী দেশগুলোর বিলাসিতায় গরীবদেশগুলো কেন ক্ষতিগ্রস্ত হবে তা নিয়েও দুনিয়া জুড়ে তর্ক-বিতর্ক, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আলোচনায় মুখ্য তিনটি বিষয় উঠে এসেছে; এক, ক্ষতিকর গ্রীনহাউজ গ্যাসের উদগীরণ কমিয়ে আনা (reduce green-house gas emission); দুই, গ্রীনহাউজ গ্যাসের জন্যে দায়ী ধনী দেশগুলোকে ক্ষতির শিকার দেশগুলোকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা (mitigation) এবং তিন, ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলো পরিবর্তিত অবস্থার সাথে মানিয়ে নেয়া বা খাপ খাওয়ানো (adaptation), যাকে অভিযোজনও বলা হচ্ছে।

বিশ্বব্যাপী জলবায়ুর এই ক্ষতিকর পরিবর্তন মোকাবেলা সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনায় জাতিসংঘ নেতৃত্ব দিচ্ছে। বহুপাক্ষিক এই আলোচনার শুরু ২০০৭ সালে ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠিত বালি সম্মেলনে। আশা করা হয়েছিল, ২০০৯ সালের ডিসেম্বরে ডেনমার্কে অনুষ্ঠিত কোপেনহেগেন সম্মেলনে বিশ্বনেতৃবৃন্দ এ বিষয়ে একটি নতুন কার্যকর চুক্তিতে উপনীত হতে পারবে। এই আলোচনায় ধনী দেশগুলোর পক্ষ থেকে গ্রীনহাউজ গ্যাস নিঃসরণের মাত্রা না কমিয়ে অভিযোজনের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়া হয়। অবশ্য, গ্রীনহাউজ গ্যাস নিঃসরণের মাত্রা না কমিয়ে শুধুমাত্র অভিযোজনের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিক্ষর প্রতিক্রিয়া মোকাবেলা করা অসম্ভব। এ কারণে বৈশ্বিক উষ্ণতা ২° সেলসিয়াসের নিচে রাখার জন্যে দাবি ওঠে। ধনী দেশগুলোকে এ লক্ষ্যে ২০২০ সালের মধ্যে ১৯৯০ সালের নিঃসরণকে ভিত্তি ধরে কমপক্ষে ২৫ থেকে ৪০ ভাগ নিঃসরণ কমিয়ে আনার কথা আলোচনায় আসে। এছাড়া, অধিক নিঃসরণকারী কতিপয় উন্নয়নশীল দেশকেও (ব্রাজিল, চীন, ভারত প্রভৃতি দেশসমূহ) একই সময়ে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে নিঃসরণ কমিয়ে আনতে হবে।

বিস্ময়কর হলেও সত্যি যে, ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে এসেও কার্বন নিঃসরণ কমানোর বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার মেলেনি; যদিও প্যারিসের বৈঠকে একটি চুক্তি পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু ওই চুক্তির ভিত্তিতে কোনো কার্যকর বিধিমালা এখনও তৈরি করতে ধনী দেশগুলো একমত নয়। আর মিটিগেশনের টাকা তারা ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ঋণ হিসেবে দিয়ে আর একটি ব্যবসা করতে চায়। অন্যদিকে, অধিকহারে কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশও একদিন দূষণকারী দেশ হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার শঙ্কা রয়েছে।

অবশ্য, আমাদের জন্যে খাপ খাওয়ানো বা অভিযোজন একটি বড় বিষয়। যেহেতু অভিযোজনের একটি সীমা আছে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া এড়ানোর কোনো সুযোগ নেই, একারণে বিপুল সংখ্যায় দরিদ্র জনগণ জলবায়ু উদ্বাস্তুতে পরিণত হবেন বলে অনুমিত হয়। যার আলামত হিসেবে আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত খুলনার কয়রা উপজেলার উত্তর ও দক্ষিণ বেদকাশী, দাকোপ উপজেলার সুতারখালী ও কামারখোলা ইউনিয়ন এবং সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার গাবুরা ও পদ্মপুকুর ইউনিয়নের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ এলাকা ত্যাগ করেছেন। ওই এলাকার অনেকেই মনে করেন, ওখানে আর বসবাস করা যাবে না। উপকূলীয় এলাকায় নোনা বা জোয়ারের পানি ঠেকানোর জন্যে বাঁধ আরও উঁচু ও শক্ত করে দেওয়া হচ্ছে। আবার মুনাফার কারণে বাঁধের ক্ষতি করে এলাকাকে লবণাক্ত জলাভূমিতে পরিণত করেছি। আবার বাঁধ ব্যবস্থার কারণে নদী মরে গিয়ে নিষ্কাশন ব্যবস্থা বিকল করে জলাবদ্ধতা তৈরি হচ্ছে। বৃষ্টির পানি নিষ্কাশিত হতে না পেরে সৃষ্ট বন্যা; আবার সমুদ্রের নোনা পানি ঠেকানোর জন্যে বাঁধ দেয়ার বিকল্প না থাকা, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সহায়তার বদলে ঋণের ফাঁদ– সবকিছু মিলিয়ে আমরা এক জটিল পরিবেশ-প্রতিবেশ-সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি।

তথ্যপঞ্জি

১. Climate Change: Bangladesh Facing the Challenge, অনলাইন, বিশ্বব্যাংক, তারিখ অজানা, আর্কাইভ হতে সংগ্রহ করা, সংগ্রহের তারিখ আগস্ট ২২, ২০১০

২. গৌরাঙ্গ নন্দী, বন্যা ঝুঁকিতে পড়বে সোয়া চার কোটি মানুষ, *কালের কণ্ঠ*, (প্রিন্ট), অক্টোবর ৩০, ২০১৯, ঢাকা

৩. গৌরাঙ্গ নন্দী, দেশে ডেঙ্গু ঝুঁকি বেড়েছে ৩৬%, *কালের কণ্ঠ*, নভেম্বর ১৪, ২০১৯ (প্রিন্ট), ঢাকা

৪. গৌরাঙ্গ নন্দী এবং অন্যান্য, চিংড়ি ও জন-অর্থনীতি : কার লাভ কার ক্ষতি; ২০০৭, *অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ*

৫. খসরু চৌধুরী, জলবায়ু পরিবর্তনের থাবা পড়েছে সুন্দরবনেও, *প্রথম আলো* (প্রিন্ট), ১৩ ডিসেম্বর ২০০৯, পৃষ্ঠা ৭

৬. নিউজ-বাংলা ডেস্ক, দেশে সর্বোচ্চ তাপমাত্রার ১৪ বছরের রেকর্ড ভেঙ্গেছে, এপ্রিল ২৬, ২০০৯, *নিউজ বাংলা*, ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র

৭. সাগর সরওয়ার, সমাজ জীবন : এশিয়ার মেগাসিটিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ঢাকা (অনলাইন), ডয়েচে ভেলে, জার্মানি, ১৬ নভেম্বর ২০০৯

৮. নিউজ-বাংলা ডেস্ক, দেশে সর্বোচ্চ তাপমাত্রার ১৪ বছরের রেকর্ড ভেঙ্গেছে, এপ্রিল ২৬, ২০০৯, *নিউজ বাংলা*, ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র

৯. Satter, Fazlous, Conflict Resulting from Climate Change in Bangladesh, গবেষণা প্রতিবেদন, অনলাইন, CHRDHS

১০. Koudstaal, Rab, Considering Adaptation to Climate Change Towards a Sustainable Development of Bangladesh, অনলাইন

১১. ইফতেখার মাহমুদ, আবহাওয়ার বৈরী আচরণ বিশ্বজুড়ে, *প্রথম আলো*, জানুয়ারি ১৫, ২০১১, ঢাকা

১২. মুশফিকুর রহমান, জলবায়ু পরিবর্তন : কারও কারও জন্য সুখবর, *প্রথম আলো* (প্রিন্ট), আগস্ট ১৬, ২০০৯, ঢাকা

১৩. বন ও পরিবেশ অধিদপ্তর, জলবায়ু পরিবর্তনের গ্রাসে বাংলাদেশ, *প্রথম আলো* (প্রিন্ট), বিশেষ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৩, ২০০৯, ঢাকা

১৪. ফরিদুল করিম, খাওয়ার পানির জন্য কতদূর, *কালের কণ্ঠ* (প্রিন্ট ভার্সন), জুন ২১, ২০১০, ঢাকা

১৫. Alal Uddin, Cyclone Sidr and Bangladesh, *Professors Current Affairs*, January 2008, Dhaka

১৬. জাবেদ সুলতান, বৈশ্বিক উষ্ণায়নে ঝুঁকিপূর্ণ তালিকার শীর্ষে বাংলাদেশ : দরকার দেশব্যাপী প্রচারণা, *প্রথম আলো* (প্রিন্ট ভার্সন) জুলাই ১৯, ২০০৯, ঢাকা

১৭. বন ও পরিবেশ অধিদপ্তর, জলবায়ু পরিবর্তনের গ্রাসে বাংলাদেশ, *প্রথম আলো* (প্রিন্ট ভার্সন), বিশেষ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৩, ২০০৯, ঢাকা

১৮. বন ও পরিবেশ অধিদপ্তর, জলবায়ু পরিবর্তনের গ্রাসে বাংলাদেশ, *প্রথম আলো* (প্রিন্ট ভার্সন), বিশেষ সংখ্যা,

ডিসেম্বর ১৩, ২০০৯, ঢাকা

১৯. সিফাতুল চৌধুরী, কাদের ও খান, আফতাব আলম, ভূমিকম্প, *বাংলাপিডিয়া*, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি

২০. সিফাতুল চৌধুরী, কাদের ও খান, আফতাব আলম, ভূমিকম্প, *বাংলাপিডিয়া*, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি

২১. Staff Writer, Bangladesh Faces High Earthquake Risk, Warn Experts (Online), IANS,; India eNews

২২. মোহাম্মদ আবু তালেব, সুনামি শঙ্কামুক্ত নয় বাংলাদেশ, *দৈনিক ইত্তেফাক*, মার্চ ১৪, ২০১১, ঢাকা

২৩. মোহাম্মদ আবু তালেব, সুনামি শঙ্কামুক্ত নয় বাংলাদেশ, *দৈনিক ইত্তেফাক*, মার্চ ১৪, ২০১১, ঢাকা

২৪. সাগর সরওয়ার ও আব্দুল্লাহ আল ফারুক, জলবায়ু পরিবর্তন, আমাদের সমস্যা আমাদেরকেই দূর করতে হবে (অনলাইন), নভেম্বর ২৪, ২০০৯, জার্মানি, ডয়েচে ভেলে

২৫. George, Nirmala; Disputed Island in Bay of Bengal (Associate Press AP), March 27, 2010, (Online)

২৬. *Case Studies on Climate Change and World Heritage,* UNESCO, 2007

২৭. সাগর সরওয়ার, সমাজ জীবন, জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার সুন্দরবন, অক্টোবর ৩০, ২০০৯, (অনলাইন) ডয়েচে ভেলে, জার্মানি

২৮. বন ও পরিবেশ অধিদপ্তর, জলবায়ু পরিবর্তনের গ্রাসে বাংলাদেশ, *প্রথম আলো* (প্রিন্ট ভার্সন), বিশেষ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৩, ২০০৯, ঢাকা

২৯. Flooding Hits Bangladesh (Online Video), National Geographic, August 27, 2009

৩০. গৌরাঙ্গ নন্দী, আইলার আঘাতের ৯ বছর আজ, কেউ পাহাড়ে কেউ বাঁধে, *কালের কণ্ঠ*, মে ২৫, ২০১৮ (প্রিন্ট ভার্সন), ঢাকা

৩১. শিশির মোড়ল, নেয়ামতউল্লাহ এবং মানিক মজুমদার, ভাঙনে ছোট হচ্ছে ভোলা, হারিয়ে যাবে হাতিয়া, বিশেষ সংখ্যা, *প্রথম আলো*, ডিসেম্বর ১৩, ২০০৯, ঢাকা

৩২. আহসানউদ্দিন আহমেদ, জলবায়ু-উদ্বাস্তুরা যাবে কোথায়, বিশেষ সংখ্যা, *প্রথম আলো*, ডিসেম্বর ১৩, ২০০৯, ঢাকা

৩৩. আনোয়ারা বেগম, ঝুঁকিতে মৎস্যসম্পদ, *প্রথম আলো*, ডিসেম্বর ১৩, ২০০৯

৩৪. আরাফাতুল ইসলাম, সমাজ জীবন, বদলে যাচ্ছে বঙ্গোপসাগর, হুমকির মুখে জেলেরা, (অনলাইন), ডয়েচে ভেলে, জার্মানি, অক্টোবর ২১, ২০০৯

৩৫. ইফতেখার মাহমুদ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিয়ে নতুন তথ্য : বাংলাদেশ ডুববে না, *প্রথম আলো*, এপ্রিল ২৩, ২০১০

ব্যবহৃত ওয়েব লিংকসমূহ

১. www.dw.com

২. https://www.prothomalo.com

৩. http://www.kalerkantho.com

৪. www.thelancet.com

৫. www.climatecentral.org

৬. https://www.scientificamerican.com/article/special-report-climate-change

৭. unfccc.int/resource/docs/publications/impacts.pdf

৮. http://dels.nas.edu/resources/static-assets/exec-office-other/climate-change-full.pdf

৯. https://link.springer.com/journal/10584

১০. en.wikipedia.org/wiki/global_warming

১১. https://www.nature.com

সাক্ষাৎকার

১. উমাশঙ্কর রায়, গ্রাম ও ডাক- কালিগর, কামারখোলা, দাকোপ, খুলনা

২. গৌরপদ বাছাড়, জয়নগর, কালিনগর, কামারখোলা, দাকোপ, খুলনা

৩. মানিক রায়, ছোট জালিয়াখালী, কালিনগর, কামারখোলা, দাকোপ, খুলনা

৪. অমল ঢালী, জালিয়াখালী, কালিনগর, কামারখোলা, দাকোপ, খুলনা

৫. শিবপদ ঢালী, কালিনগর, কামারখোলা, দাকোপ, খুলনা

৬. অলোক সরদার, গুণারী, সুতারখালি, দাকোপ, খুলনা

৭. ফকিরচাঁদ মণ্ডল, গুণারী, সুতারখালি, দাকোপ, খুলনা

৮. মন্টু হালদার, বটবুনিয়া, তিলডাঙ্গা, দাকোপ, খুলনা

৯. শঙ্কু রায়, ছোট জালিয়াখালি, কালিনগর, কামারখোলা, দাকোপ, খুলনা

১০. বাবলু রায়, কালিনগর, কামারখোলা, দাকোপ, খুলনা

১১. বিপ্লব রায়, ছোট জালিয়াখালি, কালিনগর, কামারখোলা, দাকোপ, খুলনা

১২. বিষ্ণু রায়, কালিনগর, কামারখোলা, দাকোপ, খুলনা

১৩. কালিপদ রায়, ছোট জালিয়াখালি, কালিনগর, কামারখোলা, দাকোপ, খুলনা

১৪. যামিনী মণ্ডল, আংটিহারা, দক্ষিণ বেদকাশী, কয়রা, খুলনা

১৫. বারিক মোড়ল, আংটিহারা, দক্ষিণ বেদকাশী, কয়রা, খুলনা

১৬. জালাল গাজী, আংটিহারা, দক্ষিণ বেদকাশী, কয়রা, খুলনা

১৭. আরিফা বেগম, আংটিহারা, দক্ষিণ বেদকাশী, কয়রা, খুলনা

১৮. সুবাস সরকার, আংটিহারা, দক্ষিণ বেদকাশী, কয়রা, খুলনা

১৯. বীরেন্দ্রনাথ সরদার, আংটিহারা, দক্ষিণ বেদকাশী, কয়রা, খুলনা

২০. অরুণ মণ্ডল, আংটিহারা, দক্ষিণ বেদকাশী, কয়রা, খুলনা

২১. মেহেদী হাসান, প্রধান নির্বাহী, ক্লিন, খুলনা

২২. দেবব্রত সরকার, প্রধান নির্বাহী, লোকজ, খুলনা

BL College Journal

ISSN 2664-228X
Volume -1, Issue-2, 2019
pp. 135-153

বাংলাভাষা নিয়ে সংঘাত : ইতিহাসের আলোকে একটি পর্যালোচনা

অমল কুমার গাইন
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, সরকারি ব্রজলাল কলেজ, খুলনা, বাংলাদেশ
ই-মেইল : amalgain75@gmail.com

সারসংক্ষেপ

মানবসভ্যতার বিবর্তনে ভাষা একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। সমাজ, সংস্কৃতি ও ভাষা নানা দিক থেকে গভীর সম্পর্ক-সূত্রে বাঁধা। শৈশবে মায়ের মুখ থেকে শুনে ভাষার প্রথম পাঠ নেওয়া হয় বলেই বোধ হয় নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য সে ভাষার পরিচয় মাতৃভাষা বা প্রথম ভাষা। 'বিলেতি বিশ্বকোষে' বলা হয়েছে, 'ভাষা তার আপন শক্তিতে জাতিরাষ্ট্রের অন্তর্গত ভাষিক জনগোষ্ঠীর সদস্যদের সংহতি রক্ষা করে থাকে।'[১] আধুনিককালে অন্তর্নিহিত ঐক্য ছাড়াও জাতিসত্তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনে ভাষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। নির্দিষ্ট ভাষিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসেবে বহুভাষিক-বহুজাতিক রাষ্ট্রে ভাষা কখনো জাতি-জাতীয়তার পক্ষে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠে। সারা বিশ্বে এমন দৃষ্টান্ত কম নেই, বাংলা ভাষা তার মধ্যে একটি। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে ভাষিক চেতনা বাঙালির মুক্তির প্রেরণা হয়ে ওঠে। বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনার মূল ভিত্তিটাই হলো এই ভাষা।

মূলশব্দ
বাংলা ভাষা, বাঙালি, ভাষা আন্দোলন, মাতৃভাষা, জাতীয়তাবাদ

উদ্দেশ্য

বাংলা ভাষা আন্দোলন বাঙালির জাতীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ এক অধ্যায়। বাঙালির বহুল উচ্চারিত কথা : 'ভাষা থেকে ভূখণ্ড' কিংবা ভাষা আন্দোলনের পথ ধরেই স্বাধীন বাংলাদেশ। ভাষা আন্দোলন, বিশেষ করে বায়ান্নোর আন্দোলন নিয়ে বাংলাদেশের শিক্ষিত শ্রেণি, মূলত তরুণদের মধ্যে এখনো প্রবল আবেগ ও আগ্রহ রয়েছে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তিই এই ভাষা আন্দোলন। কিন্তু যে ভাষা নিয়ে শিক্ষিত বা তরুণ সমাজে এত আবেগ, তার অতীত কেমন ছিল এটাও জানা আবশ্যক। বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন তাৎক্ষণিক কোনো ঘটনা ছিল না। এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিল চল্লিশের লাহোর প্রস্তাবের পরই, যার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে বাঙালি। ১৯৫২তে ঘটে তার চূড়ান্ত বিস্ফোরণ। কিন্তু তার বহু পূর্বে বাংলা ভাষার অবস্থা কেমন ছিল যে সম্পর্কে কিঞ্চিত আলো ফেলাই এ লেখার মূল উদ্দেশ্য।

সাহিত্যিক প্রকাশনা

ভাষা আন্দোলন নিয়ে বেশকিছু গবেষণাধর্মী বই এবং দলিলপত্র প্রকাশিত হয়েছে। বেশকিছু প্রকাশনাতে বিশেষ করে বশির আল হেলাল, বদরুদ্দিন উমর, এম আর আখতার মুকুল, নিগার চৌধুরী প্রমুখের প্রকাশনাতে বাংলা ভাষার দৈন্যদশা এবং সোনালি সময়ের কথা উঠে এসেছে। সেইসব গবেষণা এবং প্রকাশনার কিছু কিছু তথ্য এই লেখনিতে ব্যবহৃত হয়েছে।

পদ্ধতি

গবেষণা পত্রটি লিখতে গিয়ে মূলত বর্ণনাত্মক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। মাধ্যমিক তথ্য হিসেবে বিভিন্ন বই এবং পত্র-পত্রিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

বিশ্লেষণ

বাঙালি জাতি তার ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন। তাদের শ্রেষ্ঠত্ব এই উপমহাদেশে সর্বজনস্বীকৃত। বাঙালিকে যারা আত্মবিস্মৃত জাতি মনে করেছে, তারাই বাঙালির কাছে বিস্মৃত হয়েছে। আর এই ভুলটাই করেন পাকিস্তান রাষ্ট্রের জনক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বাংলা ভাষার যথাযোগ্য মর্যাদা অস্বীকার করে।

বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে সমগ্র পাকিস্তানের জনগোষ্ঠির শতকরা ৫৬ ভাগ লোকের মুখের ভাষাকে অবজ্ঞা করার ধৃষ্টতা বা উর্দুকে সমগ্র পাকিস্তানের জনগোষ্ঠীর উপর চাপিয়ে দেয়ার অশুভ ইচ্ছা জিন্নাহর একক মস্তিস্কপ্রসূত ব্যাপার বা কোনো অপরিকল্পিত ইচ্ছার আকস্মিক বহিঃপ্রকাশ ছিল না। এ ষড়যন্ত্র অনেক পুরানো। পাকিস্তানের জন্মের বহু বছর পূর্বে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বোনা হয়েছিলো।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে নবীন ও প্রবীণের চিন্তাধারার দ্বন্দ্ব ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব পাশের সাথে সাথে এই দ্বন্দ্বের উদ্ভব। চল্লিশের দশক যেমন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিবেচনায় এক দিক থেকে প্রগতির দামাল দশক, অন্যদিকে রাজনৈতিক এবং অংশত সাহিত্যে প্রতিক্রিয়ার যুগ। লাহোর প্রস্তাবের ফলে একদিকে বাংলার তরুণ মুসলিম বুদ্ধিজীবী সমাজের মাঝে প্রতিভা বিকাশের পথে এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন উঁকি দিচ্ছিলো, অন্যদিকে প্রাচিনপন্থীরা এঁদের পথ রোধ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলো। পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলকে কেন্দ্র করে বাঙালি যখন একটা স্বতন্ত্র শিল্প, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখছিলো তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উত্তরসূরিরা ঘোষণা করেন, এক আল্লাহ, এক কোরআন, এক রাসূলের অনুসারি মুসলমানদের আবাসভূমি পাকিস্তান হবে এক রাষ্ট্র, এক ভাষা ও এক সংস্কৃতির দেশ।[২] বিশ শতকের জাতীয়তাবাদী রাজনীতির অদূরদর্শিতা, হিন্দু মহাসভার হিন্দুত্ববাদিতা, বিপ্লবীদের ধর্মীয় চেতনা, মুসলিম লীগ ও জিন্নাহর সম্প্রদায়বাদী দ্বিজাতিতত্ত্ব বিচ্ছিন্নতাবাদী এই রাজনীতির কাজটা সহজ করে দিয়েছিলো। এর সঙ্গে কংগ্রেসের কিছু নীতিগত ভুলভ্রান্তি মুসলিম লীগের রাজনীতিকে

মুসলমান জনতার দাওয়ায় পৌঁছাতে সাহায্য করে। এসব কারণে হাতে গোনা কয়েকজন জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকের পক্ষে ধর্মবাদী রাজনীতির জোয়ার ঠেকানো সম্ভব ছিলো না, ফলে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ বিভাগ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

পূর্ববাংলায় স্বতন্ত্র ভাষা ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে একটি শক্তিশালী জাতি গড়ে উঠুক পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্রষ্টাদের সেটা কোনোভাবেই কাম্য ছিলো না। বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে বাঙালি জাতি মাথা তুলে দাঁড়ালে তাঁদের শাসন-শোষণের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে প্রথম থেকেই তারা সচেতন ছিলো যাতে বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে বাঙালি জাতির বিকাশ না ঘটে। এ কারণে তারা প্রথম থেকে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার শুরু করে। আর বাঙালি সেই ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে কাঙ্ক্ষিত বিজয় ছিনিয়ে আনে।

উনিশ শতকের শেষ দিকে বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তসমাজের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মুসলিম সমাজে বাংলা ভাষা প্রশ্নে বিতর্কের সূত্রপাত হয়। এই বিতর্ক বা ষড়যন্ত্র উনিশ শতকে হলেও মধ্যযুগেও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল। বলা যেতে পারে পাল আমলের পর থেকে বাংলা ভাষা অবজ্ঞার শিকার হতে থাকে। বস্তুত পালদের পরে বাঙালির বাংলা একপ্রকার হাতছাড়া হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে বর্ণশ্রেষ্ঠ অবাঙালি সেনদের শাসনামলে বাংলা যে উপেক্ষার স্বীকার হতে শুরু করলো তা মধ্যযুগের মাঝামাঝি সময়ে বেশ প্রকট রূপ ধারণ করে, পরবর্তীকালে অর্থাৎ বিশ শতকের চল্লিশের দশকে এর সাথে যুক্ত হয় ষড়যন্ত্র। যার সমাপ্তি ঘটে বায়ান্নোর সংগ্রামে বিজয়ের মধ্য দিয়ে। মধ্যযুগে বাংলাভাষাকে যে বিপদের মুখোমুখি হতে হয় সেটা ছিল লেখ্য ভাষার ক্ষেত্রে, যেটি সীমাবদ্ধ ছিল একশ্রেণির সাহিত্যচর্চাকারীদের মধ্যে। বাংলা তাদের ভালো লাগে না, বাংলায় লেখা উচিত কি-না এসব ভেবে তারা দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। কিন্তু কথ্য ভাষার ক্ষেত্রে এ সময়ে বাংলা এমন কোনো বিপদের সম্মুখিন হয়নি। সাধারণ মানুষ তাদের মতো করে বাংলা ব্যবহার করেছেন। মধ্যযুগে বাংলাভাষার এই সংকটের কারণ ব্যাখ্যা করলে দেখা যায়, সেসময় বাংলার ধর্মপ্রাণ মুসলিম লেখকরা বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা করতে দ্বিধাবোধ করতেন। যেহেতু ধর্মীয় গুরুরা বাংলাকে হিন্দুয়ানি ভাষা বলে ফতোয়া দিয়েছিলেন সেহেতু, তাদের মত অনুসারে আরবি-ফারসিতেই সাহিত্য রচনা করতে হবে।[৩] কিন্তু বাস্তবতা ছিলো ভিন্ন, কেননা যাদের জন্য সাহিত্য রচনা-সেই পাঠকসমাজ বাংলা জানতেন, তারা বাংলা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা বুঝতেন না। ফলে অনেকটা বাধ্য হয়ে লেখকসমাজকে বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা করতে হয়েছিলো। মধ্যযুগে বাংলা ভাষায় কাব্য এবং সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে কবি-সাহিত্যিকদের কি পরিমাণ অবজ্ঞা ছিল তা নিম্নোক্ত কবি সাহিত্যিকদের রচনার দিকে তাকালে স্পষ্ট বোঝা যায়-

১৫৮৪ সালে কবি সৈয়দ সুলতান লেখেন-

> 'কর্মদোষে বঙ্গে'ত বাঙালি উৎপন
> না বুঝে বাঙালি সবে আরবী বচন।

আপনা দ্বীনের বোল এক না বুঝিলা
প্রস্তাব পাইয়া সব ভুলিয়া রহিলা।
সে সবে আপনা বোল না পারে বুঝিতে
পঞ্চালি রচিলুঁ করি আছেত দুষিতে।
মুনাফিক বোলে মোরে কিতাবেতে পড়ি
কিতাবেত কথা দিলুঁ হিন্দুয়ানি করি
মোহোর মনের ভাব জানে করতারে
যতেক মনের কথা কহিনুকাহাররে'।[৪]

পাঠকসমাজ আরবি বোঝে না সেজন্য তাঁকে বাংলায় লিখতে হচ্ছে বলে কবি সৈয়দ সুলতান দুঃখ প্রকাশ করেছেন, তেমনই সপ্তদশ শতকে আরেক বাঙালি কবি মুতালিব বাংলায় লিখতে যেয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন–

'আরবীতে সকলে না বুঝে ভাল মন্দ
তে কারণে দেশী ভাষে রচিলুঁ প্রবন্ধ।
মুসলমানি শাস্ত্রকথা বাঙ্গালা করিলুঁ।
কিন্তু মাত্র ভরসা আছ এ মনান্তরে
বুঝিয়া মুমীন দোয়া করিব আমারে।
মুমীনের আশীর্বাদে পূণ্য হইবেক
অবশ্য গফুর আল্লাহ পাপ ক্ষেমিবেক।'[৫]

ষোড়শ শতকের আরেক কবি মুজাম্মিল বলেন–

আরবীর ভাষা লোকে না বুঝে কারণ
দেশীভাষে কইলুঁ তবে পয়ার বচন।
যে বলে বলৌক লোকে কবিলুঁ লিখন
ভালে ভাল মন্দে মন্দ না যায়ে খণ্ডন।

তিনি আরো লিখেছেন–

আরবী বচন
বঙ্গদেশীগণ
সবে না বুঝে বিশেষ
নিজ দেশ বুলি
ভনিলুঁ পঞ্চালি
লেখিলুঁ হিন্দুয়ান অক্ষরে[৬]

চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের প্রাচীনতর কবি শাহ মুহম্মদ সগীরের (১৩৮৯-১৪১০) ভয় যেন তবু কিছুটা কম। তিনি বলেন-

নানা কাব্যকথা রসে মজে নরগণ
যার যেই শ্রধাএ সন্তোষ করে মন।
না লেখে কিতাব কথা মনে ভয় পায়
দূষিব সকল তাক ইহ না জুয়ায়।
গুনিয়া দেখিলুঁ আক্ষি ইহ ভয় মিছা
না হয় ভাষায় কিছু হয় কথা সাচা।[৭]

কিন্তু এতসব সত্ত্বেও প্রথমোক্ত কবি সৈয়দ সুলতান মাতৃভাষাকে অমূল্য রতন বলেও উল্লেখ করেছেন–

'যারে যেই ভাষে প্রভু করিল সৃজন
সেই ভাষ হয় তার অমূল্য রতন।'[৮]

এখনে কবি তাঁর ভেতরের সমস্ত ভয় ও দ্বিধা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছেন।

অপরদিকে সপ্তদশ শতকের কবি আব্দুল হাকিম শুধু ভয়-ভীতি-দ্বিধা-দ্বন্দ্ব অতিক্রমই করেননি, মাতৃভাষার প্রতি তিনি সেই কালে দেখিয়েছেন তাঁর পরম শ্রদ্ধা। বরং যারা বাংলা ভাষাবিরোধী তাদের তীব্র ও কঠোরভাবে নিন্দা করেছেন। তাঁর বিখ্যাত পংক্তিগুলি-

যেই দেশে যেই বাক্য কহে নরগণ
সেই বাক্য বুঝে প্রভু আপে নিরঞ্জন।
মারফত ভেদে যার নাহিক গমন
হিন্দুর অক্ষর হিংসে শয়ে সবেরগণ।
যে সবে বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী
সে সবে কাহার জন্ম নির্ণয় না জানি।
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে না জুয়ায়
নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশ না যায়।
মাতা-পিতামহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি
দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি।[৯]

মধ্যযুগে বাঙালি লেখক, কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে এই যে দ্বিধা-সংশয় তা কেবলমাত্র ভাষাকে কেন্দ্র করে, সেখানে জাতি হিসেবে বাঙালিকে ধ্বংস বা হেয় করার কোন প্রবণতা ছিলো না বললেই চলে। সমস্যাটি অপেক্ষাকৃত সরল ছিল। তখন তুলনাবিচার হতো আরবি-ফার্সির সাথে বাংলার, যেখানে ধর্মই ছিল প্রধান বাধা। ধর্ম ও তার ভাবান্দোলন যেমন সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে ঠিক তেমনি তার

কঠোর নৈতিক প্রভাবে শিল্প-সাহিত্যের প্রস্রবণ শুকিয়ে যায়। কিন্তু আধুনিক যুগে এসে ভাষার ক্ষেত্রে শুধু ধর্মই আসেনি, জড়িয়ে গেছে উচ্চশ্রেণির স্বার্থের প্রশ্নটি। ১৮৭০ সালের আগে শিক্ষিত এবং উচ্চশ্রেণির বাঙালি মুসলমানরা ফারসির মোহে মোহগ্রস্ত ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে বাংলা ভাষার চর্চা ছিলো খুবই সীমিত। পরবর্তী সময়ে উর্দু সেই স্থানটি দখল করে নেয়।[১০]

সমস্যাটি জটিল হয়ে ওঠে প্রধানত ব্রিটিশ আমলে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি (চল্লিশের দশকে) সময়ে ব্রিটিশ সরকার রাজকার্যে ফার্সির স্থলে ইংরেজির ব্যবহার শুরু করলে সেটা হিন্দু মুসলিম উভয়ের জন্য সমস্যা রূপে দেখা দেয়। ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজন দেখা দেয়, সাথে উর্দুও যুক্ত হয়। হিন্দুরা অতি দ্রুত এই সমস্যা মোকাবিলা করেন ইংরেজি শিখতে শুরু করে। তাঁদের কাছে ফার্সি যা ছিল, ইংরেজিও তাই ছিল। কিন্তু মুসলমানরা এই পরিবর্তনকে মনে করলেন তাদের বিরুদ্ধে জাতি-বিদ্বেষ এবং ধর্ম-বিদ্বেষ হিসেবে। ফলে তাঁদের সমূহ ক্ষতি হল। তারা ইংরেজি শিক্ষা থেকে দূরে থাকার নীতি গ্রহণ করে শুধুমাত্র চাকরিতে রুজি-রোজগারের ক্ষেত্রে যে পিছিয়ে পড়লেন তা নয়, উনিশ শতকে চিন্তা, শিক্ষা, জ্ঞান ও ভাবের যে বিপুল জাগরণ ও উন্নতি হলো তাতে মুসলমানদের আর স্থান রইল না। শুধু তাই নয় দিন দিন তারা ইরেজদের বিরাগভাজনও হতে থাকে। কখনও কখনও রোষের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ বা মহাবিদ্রোহের পরে দেখা যায় ভারতের মুসলিম সম্প্রদায় সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটনের কারণে ইংরেজদের নির্যাতন, নিগ্রহ ও বঞ্চনায় পরিণত হয়েছে। এর পিছনে কারণ ছিল তাদের ইংরেজ বিদ্বেষিকতা ও পাশ্চাত্য শিক্ষা বা ইংরেজি শিক্ষা বিমুখতা।

মুসলমানদের এই অচলাবস্থা থেকে উদ্ধার করার জন্য এগিয়ে আসলেন মুসলিম সম্প্রদায়ের দুই প্রবাদ পুরুষ– একজন উত্তর ভারতের স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-১৮৯৮) অন্যজন বাংলার ফরিদপুরের নবাব আব্দুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩)। সৈয়দ আমীর আলীর (১৮৪৯-১৯২৮) নামও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। সৈয়দ আহমদ এবং নবাব আব্দুল লতিফ মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষায় বহুদূর পর্যন্ত সফল হয়েছিলেন সন্দেহ নেই কিন্তু বাংলা ভাষার প্রতি তাদের কোনো আন্তরিকতা ছিলো না। সৈয়দ আহমদ নিজের মাতৃভাষা উর্দুকে উপেক্ষা করতে পারেননি অন্যদিকে বাংলার সন্তান নবাব আব্দুল লতিফের বাংলা ভাষার প্রতি কোনো আকর্ষণ ছিলো না। সরকারের নিকট এক প্রতিবেদনে নবাব আব্দুল লতিফ উল্লেখ করেন, অভিজাত বাঙালি মুসলমানদের জন্য উর্দু এবং নিম্নশ্রেণির মুসলমানদের শিক্ষার জন্য বাংলাকে ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে সে ক্ষেত্রে বাংলায় যথেষ্ট আরবি-ফারসি থাকা বাঞ্ছনীয়।[১১]

১৯০৩ সালে সৈয়দ এমদাদ আলী সম্পাদিত 'নবনূর'পত্রিকায় বাংলা ভাষাকে হিন্দুগণের ভাষা বলে আখ্যায়িত করা হয়।[১২]

১৯১৫ সালে 'আল এসলামে'র লেখক এই ধরনের মনোভাবকে নিন্দা করে বলেছেন– 'মাতৃভাষার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা, বাঙালি হইয়া নিজেদের মাতৃভাষা উর্দ্দু বা আরবী বলিয়া পরিচয় দেওয়া,

কিম্বা বাংলা জানি না বা ভুলিয়া গিয়াছি' এরূপ বলা-এই মারাত্মক রোগ কেবল এক শ্রেণির মুসলমানের মধ্যে দেখা যায়।'[১৩]

কিন্তু ইনি আবার আরবি হরফে বাংলা লেখার সুপারিশ করে বলেন, 'উর্দ্দু, ফারসি ভাষা আরবী অক্ষরে লেখা বলিয়া মুসলমান সমাজে এত আদর পায়। এমনকি অনেক বাঙালি মুসলমান তাহাদিগকে মাতৃভাষা বলিতে চাহেন। ...আমাদের মাতৃভাষা আরবী অক্ষরে লিখিত হইলে নিশ্চয়ই তাহার প্রতি সাধারণের ভক্তি অতি বেশি হইবে।'[১৪]

১৯০৩ সালে 'নবনুরে' আবার বলা হয়, 'বঙ্গভাষা ব্যতীত বঙ্গীয় মুসলমানের মাতৃভাষা আর কি হইতে পারে? যাঁহারা জোর করিয়া উর্দ্দুকে বঙ্গীয় মুসলমানের মাতৃভাষার আসন প্রদান করিতে চান, তাঁহারা কেবল অসাধ্য সাধনের জন্য প্রয়াস করেন মাত্র।'[১৫]

১৯১৫ সালে 'কোহিনূরে' মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী লেখেন– 'বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা বাঙ্গালা, ইহা দিনের আলোর মতো সত্য। ভারতব্যাপি জাতীয়তা সৃষ্টির অনুরোধে বঙ্গদেশে উর্দ্দু চালাইবার প্রয়োজন যতই অভিপ্রেত হউক না কেন, সে চেষ্টা আকাশে ঘর বাঁধিবার ন্যায় নিষ্ফল।'[১৬]

১৯১৬ সালে 'আল এসলামে' মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী লেখেন– 'জীবিতা বাংলাকে মৃতা মনে করিয়া উর্দ্দুর চাদরে ঢাকিয়া রাখিবার যতই চেষ্টা হোক উর্দ্দুর চাদর গা ঝাড়া দিয়া ফেলিয়া যখন উঠিবে, তখন তাহাকে চাপিয়ে রাখা যাইবে না।'[১৭]

মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা প্রসঙ্গে বলেন, 'বঙ্গে মোসলেম ইতিহাসের সূচনা হইতে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষাই তাঁহাদের লেখ্য ও কথ্য ভাষারূপে ব্যবহৃত হয়ে আসিতেছে এবং ভবিষ্যতেও মাতৃভাষারূপে ব্যবহৃত হইবে।[১৮] এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, হিন্দু শাসকদের আমলে অনেকটা ঘৃণিত বাংলা ভাষা মুসলিম শাসন আমলে বিশেষ মর্যাদা লাভ করে এবং এ আমলে যে বাংলা ভাষার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিলো তা বলা যেতে পারে। ইলিয়াস শাহী বংশের শাসনামলে বাংলা যখন দিল্লি থেকে স্বাধীন হয়ে যায় তখন তাঁরা বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতির উন্নয়নের চেষ্টা করেছিলেন। বাংলা ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন তাঁরা। একইভাবে আলাউদ্দিন হুসেন শাহ আরবি ও ফার্সির পাশাপাশি বাংলাকেও বেশ পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। তাঁরা যে বাংলাকে ভালোবেসে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, এমনটি মনে হয় না। এর পিছনে রাজনৈতিক ব্যাপারটিও ছিল যথেষ্ট। আর তা হলো, ব্যাপক সংখ্যক নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত বাঙালির (হিন্দু মুসলিম উভয়) আনুগত্য লাভ করা। যাইহোক, তাঁর আমলেই মহাভারত বাংলায় অনুদিত হয়। আবার সেই যুগেই শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম, যাঁকে কেন্দ্র করে বাংলায় ভাববাদী সাহিত্যের সৃষ্টি হয়, আর এই ভাববাদী সাহিত্য বাংলা ভাষাকে দিয়েছে সমৃদ্ধি। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রবল ভক্তিধর্মের প্রভাবে মধ্যযুগে বাংলা কাব্যের চূড়ান্ত বিকাশ হয়েছিল। কাজেই দেখা যায়, যে সুলতানি আমল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে পৃষ্ঠপোষকতা

করেছিল- পরবর্তী মোঘল আমলে তা আর হয়নি। সাহিত্য ও সরকারি কাজকর্মে তারা ফার্সির ব্যবহার বজায় রেখেছিল। তার উপর সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে উর্দু ভাষার চর্চা বেড়ে গিয়েছিল। এই সময়ে আবার ইরানের সাফাভি বংশের পতনের ফলে বহু শিয়া মুসলমান দেশ ত্যাগ করে বাংলাদেশ পর্যন্ত এসেছিলেন, তারা এসে ফার্সির প্রভাবকে বিস্তৃত করেছিলেন, এ ধারা অব্যাহত ছিল ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত। ১৮৩৫ সালে ব্রিটিশরা ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজিকে অফিসিয়াল ভাষা করলে ফার্সির এই জায়গাটা দখল করে নেয় ইংরেজি। তবুও ফার্সি ও উর্দুর ব্যবহার কমেনি বরং উচ্চশ্রেণির মধ্যে ব্যবহার বেড়েছিল। কাজেই বলা যায়, যে উচ্চশ্রেণির হাতে এক সময় বাংলার প্রসার পরবর্তী সময়ে সেই উচ্চশ্রেণির বাঙালিরাই উর্দুকে মনে করতে থাকে অভিজাতদের ভাষা।

পূর্বেই বলা হয়েছে, মধ্যযুগে কবি সাহিত্যিকরা বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা করতে ভয় পেতো, কেননা ধর্ম ছিল প্রধান বাধা। তবে কোনো কোনো কবি-সাহিত্যকরা সে ভয়কে অতিক্রম করে বাংলা ভাষায় কাব্য এবং সাহিত্যচর্চা করেছেন। 'বাংলা ভাষা হিন্দুর ভাষা এবং এ ভাষায় সাহিত্য চর্চা করবে হিন্দুরা' এই মতবাদ প্রত্যাখ্যাত হতে থাকে যখন বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির আবির্ভাব হতে থাকে। ফলে দেখা যায় বিংশ শতাব্দির শুরুতেই উল্লিখিত বুদ্ধিজীবীরা উর্দুকে বাঙালির মাতৃভাষা করার বিপক্ষে জোরালো প্রতিবাদ করতে থাকে এবং বাংলার পক্ষে সোচ্চার দাবী করে। আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ১৯১৮ সালে 'আল এসলাম' পত্রিকায় তিনি বাংলাকে শুধু মাতৃভাষা নয় জাতীয় ভাষার মর্যাদায় উন্নীত করার গুরুত্ব যুক্তিসহকারে তুলে ধরেন।

কিন্তু পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ পাকিস্তান জন্মের অব্যবহিত পূর্বে ভাষাকে কেন্দ্র করে একটি প্রশ্ন সামনে এসে দাঁড়ায়, সেটি বাংলায় সাহিত্য চর্চা পাপ না পুণ্য, বাঙালির মাতৃভাষা বাংলা হবে কিনা তা নয়। প্রশ্নটি হলো, জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে যে মুসলিম রাষ্ট্র সৃষ্টি হতে যাচ্ছে সেই নবসৃষ্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা কী হবে? আর তা এই কারণে যে, কথিত রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ বাঙালি তাদের মুখের ভাষা বাংলা। কিন্তু রাষ্ট্রের নেতৃত্বস্থানীয় যারা তাদের অধিকাংশই উর্দুভাষী অবাঙালি। বিংশ শতাব্দির প্রথমার্ধে ঐ সব উর্দুভাষী অবাঙালিরা বাঙালির মুখে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিলো উর্দু। এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল বাঙালি বুদ্ধিজীবী ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. মোহাম্মদ এনামুল হক, কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখ। ছাত্র-শিক্ষক-রাজনীতিবিদসহ আপামর জনতার আন্দোলনে নস্যাৎ হয়ে যায় পাকিস্তানি রাষ্ট্রনেতাদের উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার অভিলাষ।

পাকিস্তানের গঠন যখন আসন্ন তখন মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতা চৌধুরী খালেকুজ্জামান হায়দারাবাদে অনুষ্ঠিত এক উর্দু সম্মেলনে বলেন- 'উর্দুই পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা (আজাদ, ১৯মে ১৯৪৭)।[১৯] এরপরে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন আহমদও উর্দুর পক্ষে মত প্রকাশ করেন (জুলাই, ১৯৪৭)। এর তীব্র প্রতিবাদ করেন বহুভাষাবিদ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ। দৈনিক আজাদে তিনি 'পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা' নামের প্রবন্ধে উল্লেখ করেন- ড.জিয়াউদ্দিন

আহমদ পাকিস্তানের প্রদেশসমূহের বিদ্যালয়ের শিক্ষার বাহনরূপে প্রাদেশিক ভাষার পরিবর্তে উর্দু ভাষার পক্ষে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন আমি একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে উহার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। ইহা কেবল মাত্র বৈজ্ঞানিক এবং নীতিবিরোধীই নয়, প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের নীতি বিগর্হিতও বটে।[২০] তাঁর মতে, উর্দু জনগণের ব্যবহারিক ভাষা হতে পারে, তবে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে কখনোই নয়। ১৯৪৭ সালের জুন-জুলাই মাসে 'দৈনিক আজাদ ও ইত্তেহাদে' জনাব আব্দুল হক (বাংলা একাডেমীর পাঠ্যপুস্তক বিভাগের সাবেক পরিচালক) বাংলা রাষ্ট্রভাষার পক্ষে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর মূলকথা ছিলো, গোটা পাকিস্তানের জনসংখ্যা বিচারে বাঙালি সংখ্যাগুরু। কাজেই বাঙালির মাতৃভাষা বাংলা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিৎ।[২১] ২৭ জুন ১৯৪৭ সালে 'মিল্লাত' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বলা হয়- মাতৃভাষার পরিবর্তে অন্যকোনো ভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে বরণ করার চাইতে বড় দাসত্ব আর কিছুই থাকতে পারে না...।[২২] ড. মোহাম্মদ এনামুল হক লেখেন- 'উর্দু বাহিয়া আসিবে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর মরণ, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মৃত্যু' (মাসিক "কৃষ্টি')। ড. কাজী মোতাহার হোসেন লেখেন- 'যদি গায়ের জোরে উর্দুকে বাঙালি হিন্দু- মুসলমানের উপর রাষ্ট্রভাষারূপে চাপিয়ে দেয়া হয়, তবে তা ব্যর্থ হবে'। তাঁর মতে, বাংলা এবং উর্দু উভয়েই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিৎ।[২৩] সৈয়দ মুজতবা আলী তো ভাষাকে কেন্দ্র করে রীতিমতো ভবিষ্যদ্বাণী করে ফেললেন-"পূর্ব পাকিস্তানের অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদি তার ঘাড়ে উর্দু চাপানো হয় তবে স্বভাবতই উর্দু ভাষাভাষী শুধু ভাষার জোরে পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করতে চেষ্টা করবে- ফলে জনসাধারণ একদিন বিদ্রোহ করে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে"।[২৪] এভাবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগেই বিতর্ক শুরু হয়ে যায়।

কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৪ আগস্ট, ১৯৪৭) পরে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, বাঙালি শিক্ষক, সাহিত্যিকের একাংশ এবং মুসলিম লীগের বাঙালি রাজনীতিকরা প্রায় সবাই বলতে থাকেন, উর্দুই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। মাওলানা আকরাম খাঁর মতো সাংবাদিক-লেখক যুক্তির মারপ্যাচে বলেন, পূর্ববঙ্গে বাংলা এবং কেন্দ্রে উর্দুই রাষ্ট্রভাষা হওয়াই সঙ্গত।

একদিকে পাকিস্তানের প্রতি মোহ, অন্যদিকে মাতৃভাষার প্রতি মমতা– এই দুইয়ের টানাপোড়েনে ভুগেছে পাকিস্তানি বাঙালি মুসলমানসমাজ, যা অনেকটাই সুস্থ বাঁক নিয়েছে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পরে। তখন থেকে শুরু হয়েছে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার মুক্তিস্নানের প্রক্রিয়া। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত একটা জরিপ করলে দেখা যাবে যে, এই সময়ের মধ্যে একমাত্র ছাত্রসমাজই রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে একতরফা সমর্থন জুগিয়ে গেছে। শিক্ষক, লেখক, সাংবাদিক এবং পেশাজীবীদের মধ্যে ছিলো বিভাজিত সমর্থন। তবে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক সংগঠন সবই ছিলো বাংলার পক্ষে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে অল্পসংখ্যক মানুষের লেখা বিবৃতির মধ্যদিয়ে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার দাবী ধীরগতিতে এগুতে থাকে। কেননা তখন উর্দু সমর্থক সংখ্যায় কম ছিলেন। সাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং বুদ্ধিজীবীমহলে উর্দুর পক্ষে যথেষ্ট সমর্থন ছিল। বিপরীতে গণআজাদী লীগ, গণতান্ত্রিক যুবলীগ, তমুদ্দুন মজলিস, ছাত্র ফেডারেশন এবং নেপথ্যে কমিউনিস্ট পার্টি রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে কাজ করতে থাকে। তমুদ্দুন মজলিস (১ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭) 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা, না উর্দু' শিরোনামে একটি পুস্তিকা বের করে। এতে মজলিস প্রধান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক আবুল কাশেমসহ ড. কাজী মোতাহার হোসেন ও আবুল মুনসুর আহমদ বাংলা ভাষার পক্ষে লেখেন।[২৫] এ সময়ে একাধিক দল-মতের ব্যক্তি নিয়ে গঠিত হয় প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। তবে তমুদ্দুন মজলিসের ভূমিকা ছিলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পত্র-পত্রিকাগুলোর মধ্যে বাংলা ভাষার পক্ষে জোরালো অবস্থান নিয়েছিলো সাপ্তাহিক মিল্লাত, দৈনিক আজাদ, সওগাত, দৈনিক ইত্তেহাদ ইত্যাদি। তৎকালীন বুদ্ধিজীবীদের চিন্তার বাহন এই সব পত্রিকা বাংলা ভাষার পক্ষে বিভিন্ন প্রবন্ধ, সম্পাদকীয় প্রকাশ করতে থাকে। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি উপস্থাপনের সাথে সাথে, বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক করে তোলে। পাশাপাশি উর্দুর মতো একটা শেকড়হীন ভাষাকে এই উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠতম ভাষার অধিকারী জনগোষ্ঠীর উপর চাপিয়ে দিলে কী পরিণাম হতে পারে, তার হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

সাতচল্লিশ সালের শেষদিকে বাংলাকে বাদ দিয়ে ইংরেজি ও উর্দু ভাষায় সরকারি এনভেলাপ, ডাকটিকিট, পোস্টকার্ড, মানিঅর্ডার ফরম ইত্যাদি ছাপা হলো। এর প্রতিবাদে সরকারি কর্মচারি ও ছাত্ররা সভা ও মিছিলের মাধ্যমে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। স্লোগান ওঠে-'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' 'উর্দুর সাথে বিরোধ নাই' 'সব কিছুতে বাংলা চাই'। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার তিন মাসের মাথায় প্রথম বিক্ষোভ (নভেম্বর ১৯৪৭) হয়। এরপরে করাচিতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে (২৭ নভেম্বর, ১৯৪৭) রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুর পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়ায় ঢাকায় ছাত্রসমাজ এবং বুদ্ধিজীবীদের একাংশ বিক্ষোভ করে।[২৬] শুরু হয় সভা, সমাবেশ, মিছিল। এভাবে একের পর এক সরকারি পদক্ষেপ রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীকে উসকে দিচ্ছিল। বিশেষ করে তরুণ সমাজে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল জাতীয়তাবাদী ও সমাজবাদী চেতনার শিক্ষক, সাংবাদিক, লেখক, আইনজীবী ও সংস্কৃতিকর্মী। রাষ্ট্রভাষাকে কেন্দ্র করে বাঙালির মধ্যে যখন ভাষিক চেতনা বিকশিত হতে শুরু করেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে গণপরিষদে উত্থাপিত একটি সংশোধনী প্রস্তাব ভাষার উপর আবার আঘাত হানে।

পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি। গণপরিষদে কুমিল্লার সাংসদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত খসড়া নিয়ন্ত্রণ প্রণালির ২৯নং ধারার ১নং উপধারা সম্পর্কে একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উক্ত ধারাটি সংশোধন করে ইংরেজি ও উর্দুর

পাশাপাশি গণপরিষদের ব্যবহারিক ভাষা হিসেবে বাংলাকেও সমমর্যাদা প্রদানের দাবি করেন।[২৭] ২৫ ফেব্রুয়ারি উক্ত প্রস্তাবের উপর জোরালো তর্ক-বিতর্ক হয় এবং শেষপর্যন্ত কণ্ঠভোটে প্রস্তাবটি নাকচ হয়ে যায়। প্রস্তাবটির উত্থাপনকারী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন যে, তিনি প্রাদেশিকতার মনোভাব নিয়ে এ প্রস্তাব করেননি। পাকিস্তানের ৬ কোটি ৯০ লাখ অধিবাসীর মধ্যে ৪ কোটি ৪০ লাখ অধিবাসী যেহেতু বাংলা ভাষায় কথা বলে, সুতরাং বাংলাই হওয়া উচিৎ পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।

প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান বলেন, 'পাকিস্তান একটি মুসলিম রাষ্ট্র, এর সাধারণ ভাষা মুসলমান জাতির ভাষাই হবে, অর্থাৎ উর্দু। একমাত্র উর্দুই পারে পাকিস্তানের দুই অংশের জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করত'।[২৮] তাঁর মতে, উক্ত বিষয়টি পরিষদে তোলাই ভুল হয়েছে।

পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন নির্লজ্জের মতো নিজের ইচ্ছাকে জনগণের অভিমত বলে চালিয়ে দিয়ে মিথ্যার আশ্রয় নেন। তিনি বলেন, 'পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ মানুষ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে দেখতে চায়। বাংলাকে সরকারি ভাষা করার কোনই যুক্তি নেই। তবে পূর্ববঙ্গে শিক্ষা ও শাসনকার্যের ক্ষেত্রে যথাসময়ে বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হবে।'[২৯]

এরপরে প্রস্তাবটির বিরোধিতা করে সিন্ধুর এম এইচ গাজদার বলেন, 'প্রস্তাবটিকে বাইরে থেকে নির্দোষ মনে হলেও পাকিস্তানের পক্ষে এ বিপজ্জনক।'[৩০]

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজনফর আলী খান প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বলেন, 'পাকিস্তানের একটি মাত্র সাধারণ ভাষা থাকবে এবং সে ভাষা হচ্ছে উর্দু। আমি আশা করি অচিরেই সমস্ত পাকিস্তানি ভালোভাবে উর্দু শিক্ষা করে উর্দুতে কথাবার্তা বলতে সক্ষম হবে। উর্দু কোন প্রদেশের ভাষা নয়, তা হচ্ছে মুসলিম সংস্কৃতির ভাষা এবং উর্দু ভাষাই হচ্ছে মুসলিম সংস্কৃতি।'[৩১]

প্রস্তাবের পক্ষে যৌক্তিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন কংগ্রেস দলের অস্থায়ী সদস্য শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বক্তব্য রাখেন গণপরিষদের কংগ্রেস দলের সেক্রেটারি রাজকুমার চক্রবর্তী। তিনি বলেন, উর্দু পাকিস্তানের কোন প্রদেশের ভাষা নয়, এটি উপরতলার কিছু মানুষের ভাষা। পূর্ববাংলা এমনিতে রাজধানী করাচি থেকে অনেক দূরে তার উপর তার ঘাড়ের উপর একটা ভাষা চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা হচ্ছে। এটাকে গণতন্ত্র বলে না।'[৩২]

যাইহোক গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে বাঙালির বাংলাবিরোধী ভূমিকায় এবং অবাঙালি সদস্যদের ভোটে উত্থাপিত সংশোধনী প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যায়। এভাবেই জাতীয় চেতনাবোধ, দূরদৃষ্টির অভাবেই বাঙালি রাজনীতিবিদরা পরিষদে মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বিরোধিতা করে স্বজাতি এবং মাতৃভাষার প্রতি চরম অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে।

এ কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত যখন পাকিস্তানের গণপরিষদে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা

করার দাবী উত্থাপন করেন, তখনও উপমহাদেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক হানাহানি অব্যাহত ছিল। ধর্মান্ধ ও মৌলবাদিদের দাপটে রাজনীতি বিপর্যস্ত এবং সমাজজীবন কলুষিত। এমনসময় বাঙালি শিক্ষামন্ত্রী জনাব ফজলুর রহমান উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষার প্রস্তাব উত্থাপন করেন, তখন গণপরিষদে পূর্ববঙ্গের সদস্যরা হয় নিশ্চুপ আর না হয় উর্দুর পক্ষে। বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে অনুধাবনের জন্য পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদের কাঠামোটি একবার দেখা যাক :

পূর্ববঙ্গ	: ৪৪
পশ্চিম পাঞ্জাব (৪ টি মোহাজের আসনসহ)	: ২২
সিন্ধু (১টি মোহাজের আসনসহ)	: ৫
সীমান্তপ্রদেশ	: ৩
সীমান্ত রাজ্যসমূহ	: ১
বেলুচিস্তান	: ১
বেলুচিস্তান রাজ্যসহ	: ১
ভাওয়ালপুর রাজ্য	: ১
খয়েরপুর রাজ্য	: ১
মোট	: ৭৯[৩৩]

এ খবরে পূর্ববাংলার ছাত্রসমাজ তাৎক্ষণিক প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা ধর্মঘট আহবান করে। বিক্ষোভ ঢাকাসহ সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। দেশব্যাপি সফল ধর্মঘট, সভা-সমাবেশ, মিছিল প্রমাণ করে যে বাংলা ভাষার প্রশ্নে জনগণ ক্রমশ সচেতন হয়ে উঠছে। ১৯৪৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি রাজশাহীর ভুবনমোহন পার্কে কাজী জহিরুল হকের সভাপতিত্বে এক সভা হয়। সেখানে বাংলাতে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে ছাত্ররা বক্তব্য রাখে। ২৭ ফেব্রুয়ারি রাজশাহীর নওগাঁয় সিরাজউদ্দিনের সভাপতিত্বে এক বিরাট সভা হয়। ২৮শে ফেব্রুয়ারি খুলনার দৌলতপুর কলেজ (বর্তমানে ব্রজলাল কলেজ) ছাত্রলীগের আব্দুল হামিদের সভাপতিত্বে এক বিরাট প্রতিবাদ সভা হয়। সেখানে আমজাদ হোসেন, ধনঞ্জয় দাশ, মনসুর আলী, জগদীশ বসু প্রমুখ ছাত্রনেতা বক্তৃতা করেন (দৈনিক আজাদ ১ মার্চ ১৯৪৮)। ঐ দিন বিকেলে শহরের গান্ধীপার্কে (বর্তমান শহিদ হাদিস পার্ক) প্রায় দুইহাজারের অধিক লোকের উপস্থিতিতে সর্বদলীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৭শে ফেব্রুয়ারি বরিশাল জেলা মুসলিম ছাত্রলীগের উদ্যোগে ছদরুদ্দিনের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভা হয় মুসলিম ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে। ২৮শে ফেব্রুয়ারি দিনাজপুর স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরাও ধর্মঘট পালন করে। এছাড়াও ধর্মঘট পালিত হয় যশোর, ভৈরব, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, মেহেরপুর, পাবনা, জামালপুরসহ সমগ্র পূর্বপাকিস্তানে। প্রতিটি জনসভার মূল বক্তব্য ছিলো বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়া। পাশাপাশি বাঙালি মুসলীম লীগের রাজনীতিবিদ এবং কিছুসংখ্যক বুদ্ধিজীবী যারা উর্দুর পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলো, অথবা বাংলার ব্যাপারে নীরব ভূমিকা পালন করেন, তাদের তীব্র ভাষায় সমালোচনা

করা। অন্যদিকে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে তাঁর প্রস্তাবের জন্য অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয় (দৈনিক আজাদ ২ মার্চ ১৯৪৮)।[৩৪] এছাড়াও পত্র-পত্রিকায় ২৫শে ফেব্রুয়ারির ঘটনা নিয়ে তীব্রভাবে পাকিস্তান সরকারকে সমালোচনা এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়ার জন্য লেখালেখি চলে দৈনিক 'আজাদ' 'ইত্তেহাদ' সাপ্তহিক 'নও বেলাল' (পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত একমাত্র পত্রিকা) এবং 'আনন্দবাজার' ও 'অমৃতবাজার' পত্রিকাতেও বাংলাভাষার পক্ষে এবং পাকিস্তান সরকারের সমালোচনা করে বিভিন্ন লেখা বের হতে থাকে।

জণগণের এই আন্দোলনমুখী চেতনাকে সঠিকভাবে পরিচালিত করার জন্য প্রয়োজন হয় একটি শক্তিশালী সংগঠনের। এই কথা বিবেচনা করে ফজলুল হক হলে রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক কর্মীদের এক সভা আয়োজন করা হয়। কমরুদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে এই সভায় 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' নামে একটি সর্বদলীয় পরিষদ গঠন করা হয়। এ সভাতে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি এবং তমুদ্দিন মজলিসের যৌথ সিদ্ধান্তে পাকিস্তানের গণপরিষদে সরকারি ভাষার তালিকা থেকে বাংলা ভাষা বাদ দেয়া, পাকিস্তানের মুদ্রা ও ডাকটিকিটে বাংলা ভাষা ব্যবহার না করা এবং নৌ বাহিনীতে নিযুক্তির পরীক্ষা থেকে বাংলা ভাষা বাদ দেয়ার প্রতিবাদে ১১ মার্চ (১৯৪৮ সাল) ঢাকাসহ সারাদেশে হরতালসহ বিক্ষোভ কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত হয়।

১১ মার্চের এই কর্মসূচি খুব বেশি লড়াকু ছিলো না। পূর্বেই এ সম্পর্কে বলা হয়েছে প্রথমদিকে এই আন্দোলন শুধুমাত্র ছাত্রসমাজ এবং মুষ্টিমেয় কিছু রাজনীতিক এবং বুদ্ধিজীবীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো। সাধারণ জনতার এ নিয়ে কোনো ভাবনাই ছিলো না, এমনকি সাধারণ জনতা এ আন্দোলনকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হিসেবে তথা পাকিস্তান ভাঙার আন্দোলন হিসেবে দেখতো। এ কারণে দেখা গেছে ছাত্ররা ভাষার দাবীতে মিছিল বের করলে ঢাকার নবাবপুর রেলক্রসিং পার হলেও জনতা ছাত্রদের মিছিলে ইট পাটকেল নিক্ষেপ করতো। তারপরেও সরকার এই কর্মসূচি বানচালে কঠোর অবস্থান নেয়। নিরস্ত্র ছাত্রদের বিক্ষোভের মুখে পুলিশ ব্যাপক লাঠি চালায়। প্রায় ২০ জন ছাত্র আহত হয় (আনন্দবাজার, ১২ মার্চ ১৯৪৮)। সেদিনের ঢাকায় পিকেটিং এর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান, নইমুদ্দিন আহমদ, অলি আহাদ, শওকত আলী, কাজী গোলাম মাহবুব, মোহাম্মদ তোহা প্রমুখ। এঁদের সবাইকে গ্রেফতার করে পুলিশ। নেতাদের গ্রেফতারের পরেও আন্দোলন থেমে যায়নি। বরং আন্দোলনের তীব্রতা বাড়তে থাকে। এর মধ্যে ১৫ মার্চ পর্যন্ত ঢাকাতে আন্দোলন চালিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। কেননা, ১৫ মার্চ ছিল পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের প্রথম অধিবেশন।

এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন বেশ বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়লেন। কেননা পকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ঢাকা সফর অত্যাসন্ন। যেকোনো মূল্যে তাঁর সফরকে নিরুপদ্রব করতেই হবে। এমনিতেই আজিজ আহম্মেদ জিন্নাহর কাছে মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিনের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত নেতিবাচক রিপোর্ট করতেন। তার উপর এখানে এসে যদি

দেখেন যে, পূর্ববাংলায় ছাত্র আন্দোলন দমন করতে তিনি ব্যর্থ, তাহলে তাঁর উপর গভর্নর নাখোশ হতে পারেন। তা ছাড়া মি. জিন্নাহ নাজিমুদ্দিনকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তার ঢাকায় আসার আগেই যেন তিনি ছাত্রদের সাথে ভাষার গণ্ডগোল মীমাংসা করেন। তার ওপর সামনে প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন। এসব কারণে তিনি সংগ্রাম পরিষদের সাথে একটি সমঝোতায় যেতে চাইলেন। মূলত এই সমঝোতা ছিলো আপদকালীন সমস্যা মোকাবিলা করার একটা কৌশলমাত্র। ১৫ তারিখ সকাল ১১ টায় সংগ্রাম পরিষদের সাথে প্রধানমন্ত্রী নাজিমউদ্দিনের আলোচনা হয়, নানা তর্ক-বিতর্কের পরে ৮ (আট) দফা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উল্লেখ্য চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে জেলে আটক নেতাদের চুক্তির দফাগুলোর' ব্যাপারে তাঁদেরকে অবহিত করে সমর্থন নেয়া হয়।

চুক্তির ধারাগুলোর মূল বিষয়বস্তু ছিলো আন্দোলনে ধৃত নেতা-কর্মীদের মুক্তি, পুলিশি অত্যাচারের ব্যাপারে তদন্ত, পূর্ববঙ্গ আইন সভায় রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে প্রস্তাব পাশ এবং তা গণপরিষদে পাশ করানোর চেষ্টা, প্রদেশের সর্বস্তরে বাংলা ব্যবহারের পক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ, কলকাতা থেকে আসা সংবাদপত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করা ইত্যাদি। পাকিস্তানের জাতির পিতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯ মার্চ, ১৯৪৮ অপরাহ্নে তেজগাঁও বিমানবন্দরে এসে উপস্থিত হন। জাতির পিতার উপস্থিতি উপলক্ষে হাজার হাজার জনতা রেসকোর্স থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত ভিড় করে থাকলেও তাদের মধ্যে কোনো উচ্ছ্বাস ছিলো না। ছাত্ররা ছিলো নিরুৎসাহ।

২১শে মার্চ, অপরাহ্নে রেসকোর্স ময়দানে তাঁকে নাগরিক সংবর্ধনা দেয়া হয়। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে তিনি বক্তৃতা করেন । তাঁর বক্তৃতায় ভাষা নিয়ে বলেন–

> 'আমি আপনাদিগকে সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই যে, উর্দুই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, অন্যকোন ভাষা নয়। একটিমাত্র রাষ্ট্রভাষা ব্যতীত কোন জাতির সংহতি থাকিতে পারে না। অন্যান্য দেশের ইতিহাসের প্রতি তাকাইয়া দেখুন। এ ব্যাপারে কেউ যদি আপনাদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে তাহলে বুঝতে হবে সে রাষ্ট্রের শত্রু। আমি আবারো বলিতেছি যে, পাকিস্তানের শত্রুদের ফাঁদে পা দেবেন না। দুর্ভাগ্যবশত আপনাদের মধ্যে পঞ্চম বাহিনী রহিয়াছে। পূর্ববাংলাকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা তারা পরিত্যাগ করেনি এবং এখনো পর্যন্ত সেটাই তাদের লক্ষ্য। আমি আপনাদের পঞ্চম বাহিনীর ব্যাপারে সতর্ক করে দিচ্ছি, না হলে আপনারা বিপদগ্রস্ত হবেন। মুসলিম লীগ আপনাদের কাছে একটি পবিত্র আমানত।'[৩৫]

মি. জিন্নাহর ঐ দিনের এক ঘণ্টা যাবৎ দেয়া বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে যা পাওয়া যায় তা এরূপ–

জাতিসত্তার মূল ভিত্তি হলো ভাষা। পাকিস্তানে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিলে বাঙালির জাতিসত্তার স্বীকৃতি দেয়া হয়। ভাষাকে জাতিসত্তার ভিত্তি হিসেবে মেনে নিলে জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্বের আর কোনো মূল্য থাকে না। এ কারণে মি. জিন্নাহ ওই দিনের বক্তব্যে পরিষ্কারভাবে ঘোষণা দেন

যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা, অন্যকোনো ভাষা নয়। তা না হলে মেনে নিতে হবে বাঙালির কর্তৃত্ব। কিন্তু বাঙালির কর্তৃত্ব মেনে নেয়ার জন্য জিন্নাহ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের দালালি করেনি। বক্তব্যের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো পশ্চিমা শাসকরা সব সময় বাঙালির যৌক্তিক আন্দোলনকে কমিউনিস্ট এবং ভারতের পাকিস্তান ভাঙ্গার ষড়যন্ত্র বলে আখ্যায়িত করে পূর্ববাংলার জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করতো। জিন্নাহর বক্তব্যে সে বিষয়টিও স্পষ্ট হয়। যাহোক ছাত্রসমাজ তথা সাধারণ জনগণ তাঁর বক্তব্য মেনে নেয়নি। বিশেষ করে ভাষা নিয়ে তাঁর বক্তব্যের সাথে সাথে 'না...না' ধ্বনির প্রতিরোধের মুখে পড়তে হয়।

২১শে মার্চের বক্তব্যের কারণে মি. জিন্নাহ পূর্ববাংলার জনগণের শ্রদ্ধা অনেকাংশে হারান। সাথে সাথে ছাত্রদের একাংশ থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। ২৪শে মার্চ সকালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। এ দিনেও তিনি পঞ্চম বাহিনী, ভারতের শত্রুতা, পাকিস্তানের সংহতির জন্য মুসলিম লীগের প্রয়োজনীয়তার কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। ভাষার ব্যাপারে এদিনেও অনমনীয় মনোভাব 'উর্দুই হবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'। জিন্নাহ যে এ ধরনের বক্তৃতা দেবেন সেটা ছাত্ররা জানতো, ফলে সঙ্গে সঙ্গে ভাষাসৈনিক আব্দুল মতিনসহ অন্যান্য ছাত্ররা 'না, না' বলে চিৎকার করে ওঠে। তখন জিন্নাহ তাঁর কণ্ঠস্বর রাষ্ট্রনায়ক থেকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিয়ে এসে বলেন, "এই রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশগুলি একত্রে এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন একটি মাত্র রাষ্ট্রভাষা এবং আমার মতে একমাত্র উর্দুই হতে পারে সেই ভাষা।"[৩৬]

এ দিনে তিনি বাংলাভাষার পক্ষে আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্যে যেভাবে বক্তব্য দেন, তাতে সহজেই পূর্ববাংলার জনগণের বিভ্রান্ত হওয়ার কথা। তিনি বলেন–

> "আমাদের দুশমনেরা পাকিস্তানকে দুর্বল করার আশায় প্রাদেশিকতা প্রচারে তৎপর হয়ে উঠিয়াছে এবং এইভাবে আপনাদের প্রদেশকে পুনরায় ভারত ডোমিনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করার পথ সুগম করিয়া দিতেছে। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, এই শত্রুদলের মধ্যে এখন পর্যন্ত কতকগুলি মুসলমান রহিয়াছে। যারা এই খেলা খেলিতেছে তারা নির্বোধের স্বর্গে বাস করিতেছে। এই প্রদেশে মুসলমানদের সংহতি নষ্ট করিবার জন্য জনসাধারণকে অরাজকতার উস্কানি দেওয়ার জন্য প্রত্যহ মিথ্যা প্রচারণার বন্যা প্রবাহিত হইতেছে।" [৩৭]

তিনি কলকাতা থেকে প্রকাশিত কতকগুলি পত্রিকার নাম উল্লেখ না করে তাদের উদ্দেশ্যে বলেন–

> "আপনাদের কাছে অদ্ভুত মনে হয় না যে, ভারত ডোমিনিয়নের কতকগুলো সংবাদপত্র, যাহাদের নিকট পাকিস্তান নামটিই অশুভ, ভাষার বিতর্কে তাহারাই আজ আপনাদের পক্ষালম্বন করিয়াছে এবং উহাকে 'আপনাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার' বলিয়া অভিহিত করিতেছে। অতীতে যাহারা মুসলমানদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে অথবা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে অথবা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছে, তাহারাই আজ হঠাৎ আপনাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের ত্রাণকর্তা হইয়া উঠিয়াছে এবং ভাষার

ব্যাপারে গভর্নমেন্টকে অমান্য করার উস্কানি দিতেছে অথচ এই পাকিস্তান হইতেছে আপনাদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের মূল ভিত্তি। ইহাদের এইসব ভূমিকার কোন তাৎপর্য নেই।"[৩৮]

বাংলাদেশে মি. জিন্নাহর এই প্রথম এবং শেষ সফর বাঙালির কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তান সৃষ্টির সাত মাসের মধ্যেই বাঙালির পাকিস্তানের রাষ্ট্রের প্রতি মোহ ভঙ্গ হতে শুরু করে। সফরকালে জিন্নাহের বক্তব্য শিক্ষিত বাঙালির চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় পাকিস্তান কাদের জন্য, পাকিস্তান কেন, পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালির ভবিষ্যৎই বা কী? জিন্নাহের ঢাকা ত্যাগের সাথে সাথে বাংলা ভাষা আন্দোলন অনেকটা স্তিমিত হয়ে পড়ে তবে স্তব্ধ হয়ে যায়নি।

যে উর্দুর প্রতি পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর এত দরদ, সেই উর্দুর জন্মের ইতিহাস যদি আমরা খুঁজি তাহলে দেখবো- উর্দু উপমহাদেশের কোনো ভাষা নয়, এটি একটি শেকড় বিহীন ভাষা। উর্দুর জন্ম তুর্কি সেনাদের ছাউনিতে। তুর্কি ভাষায় উর্দু শব্দের অর্থ সিপাহি, লস্কর বা বরকন্দাজ। বাদশাহী আমলে দিল্লিতে রাজভাষা ফারসির সাথে বিভিন্ন তুর্কি সেনাদের শিবিরে সিপাহিদের মুখে মুখে আরেকটি কথ্যভাষার জন্ম হয়, সেটি হচ্ছে উর্দু ভাষা। অর্থাৎ উর্দিদের মুখে মুখে যে ভাষার জন্ম তাই উর্দু ভাষা। হিন্দি এবং উর্দুর মধ্যে পার্থক্য শুধু হিন্দিতে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার অধিক এবং লেখা হয় দেবনাগরী হরফে। অপরদিকে উর্দুতে আরবি-ফারসির প্রচুর ব্যবহার আর লেখা হয় আরবি হরফে। পরবর্তিতে সিপাহিদের মুখে সৃষ্ট এই মিশ্রভাষা মোঘলদের পৃষ্ঠপোষকতায় পূর্ণতা লাভ করে। ধীরে ধীরে উত্তর ভারতের কথ্য ভাষায় রূপান্তরিত হয়। এবং পূর্বেই বলা হয়েছে সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে উর্দু ভাষার চর্চা বেশ বেড়ে গিয়েছিলো, তাতে সন্দেহ নেই। উনবিংশ শতাব্দীতে অভিজাত পরিবারগুলোর (বিশেষ করে উত্তর ভারতের) ভাষা হয়ে দাঁড়ায় উর্দু। তারা বাংলায় যেমন কথা বলতো না তেমনি লেখাপড়াও করতো না। উর্দু অভিজাতদের ভাষা এই ধারণা মুসলমানদের মনে পরবর্তী সময়ে বিশ্বাস জন্মাতে সক্ষম হয়। বিংশ শতাব্দীর মাঝামঝি সময়ে যাঁরা পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টির সাথে জড়িত ছিলো- তাঁরা নিজেদের অভিজাত বলেই ভাবতেন এবং তাঁদের বেশির ভাগই ছিলেন উর্দুভাষী। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের মতে, 'উর্দুই মুসলিম রাষ্ট্রভাষা'। অপরদিকে মন্ত্রী গজনফর আলী খান এক ধাপ এগিয়ে বলেন, 'উর্দু ভাষাই মুসলিম সংস্কৃতি'। অথচ দুঃখজনক হলেও এটা সত্য যে উর্দুর জন্ম-ইতিহাস সেটা বলে না।

আটচল্লিশের মার্চের আন্দোলনের পরে এবং বিশেষ করে জিন্নাহ সাহেবের ঢাকা সফরে উর্দুর পক্ষে জোরালো অবস্থান, নাজিমুদ্দিনের সাথে সম্পাদিত চুক্তি অবৈধ ঘোষণার পরেও আন্দোলন ঝিমিয়ে পড়েনি। এ সময়ে দেশের অর্থনৈতিক সংকট, সামাজিক অস্থিতিশীলতা, শিক্ষিত শ্রেণি থেকে নিম্নবর্গীয় মানুষের ক্ষোভ, অসন্তোষ এবং সরকারের রাজনৈতিক অনাচার ও দমননীতি একধরনের সরকার-বিরোধী রাজনৈতিক পটভূমি তৈরি করে। এই রাজনৈতিক আবহাওয়ার মধ্যেই ভাষা আন্দোলন আবার নতুন প্রাণ লাভ করে। আটচল্লিশের যে আন্দোলন বাঙালিকে পথে নামিয়েছে,

বায়ান্নোর সেই আন্দোলনে সালাম, রফিক, বরকত, জব্বার আরো নাম না জানা বহু বাঙালির রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। সেই রক্তের ধারা একাত্তরের সাথে মিলিত হয়ে গড়ে তুলেছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

উপসংহার

মানবসভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে বাঙালি এক হাতে বাইরের শত্রুকে ঠেকিয়েছে অপর হাতে নিজের অস্তিত্বের জন্য লড়াই করেছে। আবার তাকে নিজের ঘরের শত্রু বিভীষণের সাথেও সমান তালে লড়তে হয়েছে। এ লড়াই শুরু হয়েছে আর্যদের আবির্ভাবের সাথে সাথে দুর্ধর্ষ আদিবাসীদের সাথে। এই ভূমি শাসিত হয়েছে সেন, আফগান, মোঘল, ইংরেজদের দ্বারা। অনেকে বণিক বেশে এসে রাজমুকুট মস্তকে ধারণ করেছে। বহিরাগতরা উন্নততর সভ্যতা, রণকৌশল, অস্ত্র এবং ষড়যন্ত্রের বলে এ দেশ জয় করতে পারলেও তাদের পরাজিত হতে হয়েছে এ দেশের সংস্কৃতির কাছে। কেননা এ অঞ্চলের জনগণ কখনো বিদেশিদের চাপিয়ে দেয়া ভাষা এবং সংস্কৃতি গ্রহণ করেনি। সহ্য করেনি নিজ সংস্কৃতি, সভ্যতা ও জনগোষ্ঠির অপমান। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা জাতি, ভাষা, সংস্কৃতি রক্ষার প্রয়োজনে বারবার হয়েছে ঐক্যবদ্ধ, ছিনিয়ে এনেছে সাফল্যের মুকুট। এই অঞ্চলের ভাষা ও সংস্কৃতিতে অবগাহন করে অনেকেই ধন্য হয়েছেন। নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড, উইলিয়াম জোন্স, জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন ও উইলিয়াম কেরি'র মতো ব্যক্তিদের কাছে বাঙালি আবার ঋণী, কৃতজ্ঞ। পরদেশিদের শাসনামলে রাজভাষা কখনও ছিল আরবি, ফারসি এবং ইংরেজি। সুদীর্ঘ সময়ে তুর্কি, আরবি, ফারসি, ইংরেজি, ফরাসি, পর্তুগিজ ইত্যাদি ভাষার মিশ্রণে বাংলাভাষা হয়ে ওঠে বিশ্বসাহিত্যের এক রত্নভাণ্ডার।

বাংলার বৌদ্ধ পালরাজাদের আমলে সৃষ্ট এই ভাষা শত্রুর মুখোমুখি হয় তাদের রাজত্বকালের অবসানে। পালদের পরে বর্ণশ্রেষ্ঠ সেনদের আমলে বাংলা ধর্মরোষে পড়ে। কাজেই দেখা যায় হিন্দু রাজাদের আমলে ঘৃণিত বাংলা মুসলিম শাসনামলে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হলো। হিন্দু, মুসলিম মিলে শুরু হল বাংলাভাষার সমৃদ্ধির কাজ। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় হতে সেই মুসলিম সম্প্রদায় যারা হিন্দু আমলের ঘৃণিত বাংলাভাষাকে পৃষ্ঠপোষকতা করে বাংলাভাষার সমৃদ্ধি করেছে তারাই বাংলাকে ঘৃণা করে বাংলা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে উর্দু'র মোহে ছুটেছে। ততোদিনে এই বিশাল জনগোষ্ঠির মাঝে বাংলাভাষা এক শক্তিশালি অবস্থা করে নিয়েছে। ইতোমধ্যে, বাংলাকে ভালোবেসে বাংলায় সাহিত্যচর্চা করে বিশ্বসাহিত্যে মর্যাদার আসন লাভ করেছেন অনেকেই। সমস্ত অবজ্ঞা উপেক্ষা করে বিশ শতকের শুরুতে বাংলাভাষার কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জয় করলেন সাহিত্যের সবচেয়ে সম্মানজনক বৈশ্বিক পুরস্কার। বাংলাকে ঘৃণা করে, বাংলা নাপিত, জেলে, ধোপাসহ নীচ জাতির ভাষা বলে বাংলা ত্যাগ করে যিনি সুদূর ফ্রান্সের ভার্সাই নগরে গিয়ে ইংরেজি সাহিত্যে লেখালেখি শুরু করলেন সেই বিখ্যাত কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তও জীবনের শেষ বেলাতে বাংলাকে ভালোবেসে বাংলা সাহিত্যের মহাকাব্যের জনক হিসেবে পরিচিতি লাভ করলেন।

ভালোবাসা ও সংগ্রামের মধ্যদিয়ে প্রতিষ্ঠিত যে ভাষা সেই ভাষাকে বিশ শতকের চল্লিশের দশক থেকে পাকিস্তানি অপরিণামদর্শী রাজনীতিবিদরা যে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করেছিল, সেটা ছিল তাদের বোকামি। বাঙালি আবারো ঘুরে দাঁড়ালো, আবারো ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে তাদের প্রাণের ভাষা বাংলাকে বিপদমুক্ত করল। এবার অবশ্য বাঙালিকে ভাষার জন্য অনেক মূল্য দিতে হল। বয়ে গেল রক্তবন্যা, বহুপ্রাণের বিনিময়ে বাংলাভাষা পেল জীবন।

তথ্যসূত্র :

১. আহমদ রফিক, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, অনিন্দ্য প্রকাশন, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠা ১১

২. নিগার চৌধুরী, *বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও বাঙালির সংগ্রাম*, সুবর্ণ প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা ১২

৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১২

৪. বশীর আলহেলাল, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮০, পৃষ্ঠা ৬০

৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬০

৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬০

৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬১

৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬১

৯. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬১

১০. নিগার চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৪

১১. বশীর আলহেলাল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৩

১২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭০

১৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭০

১৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭০

১৫. নিগার চৌধুরী : প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৪

১৬. বশীর আলহেলাল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭১

১৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭১

১৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭১

১৯. আহম্মদ রফিক, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩১

২০. বদরুদ্দীন উমর, পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, সুবর্ণ প্রকাশনী, ঢাকা, নভেম্বর ১৯৭০, পৃষ্ঠা ২০

২১. বশীর আলহেলাল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৬৭

২২. নিগার চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৮

২৩. আহম্মদ রফিক, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২০

২৪. বশীর আলহেলাল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৬৯

২৫. আহমদ রফিক, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২০

২৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২১
২৭. এম. আর. আখতার মুকুল, ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা, শিখা প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৪, পৃষ্ঠা ৮৬
২৮. নিগার চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৮
২৯. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩০
৩০. বশীর আলহেলাল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২১০
৩১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২১১
৩২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২১০
৩৩. এম. আর. আখতার মুকুল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮৪
৩৪. বশীর আলহেলাল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২১৭
৩৫. বদরুদ্দীন উমর, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১১৩
৩৬. নিগার চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫০
৩৭. বশীর আলহেলাল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৪৮
৩৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৪৮

BL College Journal

A Peer Reviewed Journal

English Section

- Keats an Escapist or a Realist: A Brief Analysis
  K M Alamgir Hossain 157-161
- Study of Ecology and Shellfish Diversity of River Nabaganga at Jhenidah in South Western Part of Bangladesh
  Dr. Bidhan Chandra Biswas, Dr. Poulami Paul & Professor Ashis Kumar Panigrahi 162-168
- Prospect of Institutional Repositories in Universities of Bangladesh
  Muhammad Hossam Haider Chowdhury & Dr. S. M. Mannan 169-185
- Toxicity of Organophosphate Insecticides to Adult Housefly, *Musca domestica*
  Dr. Hosne Ara & Professor Dr. M. Khalequzzaman 186-197
- Violence against Women in the Name of Religion
  Dr. Shirtaz Begam Laskar 198-204
- Mental Health Status in Relation to Perception of Crowding in Dhaka City
  Dr. Abu Syed Md. Azizul Islam & Professor Dr. Kazi Saifuddin 205-214
- Scenario of Migration in Federal State Nepal : An Anthropological Discourse
  Dilli R. Prasai 215-221
- Morphogenesis of Sodium Silicate Glass and Glass Ceramics with High Amounts of Vanadium Pentoxide
  Md. Kamruzzaman Khan, Golam Mortuza, Rafiqul Ahsan, Md. Jahangir Hossain, Md. Alamgir Hossain & Md. Abdur Rashid 222-231

Volume -1, Issue-2, 2019

BL College Journal

ISSN 2664-228X
Volume -1, Issue-2, 2019
pp. 157-161

Keats an Escapist or a Realist: A Brief Analysis

K M Alamgir Hossain
Professor of English, Principal, Government Brajalal College, Khulna, Bangladesh
e-mail : km.hossain6111@gmail.com

Abstract

Escapism in an effort to escape from the hard realities of life, from this world of misery into an imaginary world of the poet's own creation which is full of beauty and pleasure. An escapist keeps himself aloof from real life and its difficulties. He shrinks in a cowardly manner from the realm of human suffering. Though all poets, more specially the Romantics are escapists to some extent, Keats, in general concept, is regarded as the worst sinner in this respect. He is the only romantic poet whose object as a poet was to create aesthetic delight for the readers and to provide them means to escape from the hurly-burly of hectic life. The whole of his career is a career of conflict between the ideal and the real, between a passionate, fiery and stormy search for permanent bliss away from the impermanence of mundane joy and beauty and the horror of 'the weariness, the fever and the fret'[1] of life. Virtually, the fact is that if we go through Keats' poems minutely we can establish him as an escapist in his early poems, but his later poems show an increasing awareness of life and its problems.

Keywords

Escapist, Realist, Beauty, Truth

1. Introduction

Keats was born at a time when the whole of Europe was shaken by the ideas of French Revolution, and he grew up in this atmosphere but in his poetry these ideas never found expression. The ideas that awoke the youthful passion of Wordsworth and of Coleridge, that stirred the wrath of Scott, that worked like yeast in Byron and brought forth new matter, that Shelley reclothed and made into the prophecy of the future were ignored and unpresented by Keats. He had almost no vital interest in the present, nor in man as a whole, nor in the political movement of human thought, nor in the future of mankind, nor in liberty, equality and fraternity, no interest in anything but in the world of beauty, romance, imagination, art, into Greek mythology and into the

romance of the Middle Ages where he tries to discover a symbol of permanent bliss. And this misleads most of his readers to label him a mere escapist.

2. Objective

The objective of the study is to assess Keats in a broader scale and to ascertain his real worth, that is, to explore whether Keats should be framed as an escapist in a narrow sense or he deserves more.

3. Methodology

The methodology of the study is descriptive analysis and is based on texts and secondary data collected from various sources like published books, web pages, journals and letters.

4. Analysis

4.1. Ode to a Nightingale

In the Poem the sweet and melodious song of the nightingale produces on Keats the narcotic effect of hemlock or dull opiate or Lethe-wards. The poet here seeks oblivion of the earthly sorrows and sufferings in the song of the nightingale in full-throated ease. He then desires to 'Leave the world unseen, And with the nightingale fade away into the forest dim' [2] under the impact of wine that has been cooled for a long time deep under the ground or with the help of a cup of red Hippocrene. In the very next moment, dismissing the idea of wine, the poet decides to fly into the felicitous dark world of romance on the wings of his poetic imagination. And he feels transported from the world of reality imaginatively for a short while. But the poetic imagination itself has only brief flight and the poet apprehends –

> Forlorn! The very word is like a bell
> To toll me back from thee to my sole self!
> Adieu! The fancy cannot cheat so well
> As she is fam' to do, deceiving elf. [3]

It makes us realize that escape from the realities of life is neither possible nor desirable.

4.2. Ode on Melancholy

In 'Ode on Melancholy' the poet presents completely a paradoxical idea from that of 'Ode to a Nightingale'. In this poem, he disapproves of our seeking oblivion. Here he opines that a mood of oblivion is not the right mood for melancholy, because the mood of oblivion means an escape from melancholy, not a full-blooded experience of melancholy. So the poet starts the poem with the lines –

No, no! go not to Lethe, neither twist
Wolf's-bane, tight-rooted, for its poisonous wine,
Nor suffer thy pale forehead to be Kiss'd
By nightshade, ruby grape of Proserpine. [4]

Here Keats concentrates on the world of realities where the poem deals with purely human emotions of pain and joy. In the poem 'Ode to a Nightingale', the poet dwells upon the idea of permanence of the song of the nightingale, but in 'Ode on Melancholy' he accepts impermanence as inevitable. He describes the true character of melancholy. Melancholy arises from the transience of joy and joy is transient by its nature. So joy and pain are inseparable and to experience joy fully, we must experience sadness or melancholy fully. The rose is beautiful indeed, but we can't think of rose without its thorn. It is therefore impossible to escape from inevitable pain in life.

4.3. Ode to Autumn

'In 'Ode to Autumn' which is Keats' Swan song, that is, the last and the best song, the poet gives a comprehensive picture of life with all its bitter-sweets in terms of beautiful nature images. He finds in the continuous cycle of seasons (Summer-autumn-winter-spring-summer) the satisfying symbol of permanence. The season cycle symbolizes the continuity of life with all its growth and decay, appearance and departure, the cycle of coming and going. The ode thus gives a vivid description of different beauties of autumn and depicts a real world – a world that fades, dies, grows and lives again. Here a kind of serenity and impersonality of mood dawned upon Keats by the time he attempted this 'Ode to Autumn', the last and the maturest of his odes.

Superficially altogether different from the 'Ode on Melancholy', 'Ode to Autumn is deeply related to that poem. The melancholy ode accepts the impermanence of beauty and joy as inevitable. In the 'Ode to Autumn', impermanence is again accepted and accepted without the least trace of sadness. Keats is able to see it as part of a larger and richer permanence.

4.4. Ode on Grecian Urn

'Ode on a Grecian Urn' is built upon a tension between ideal beauty and actual life. No doubt the ode has highlighted art, but it cannot be said with certainty that it has established the supremacy of art over life though many of the critics hold an opinion like this. Rather we can say from a broader and unbiased point of view that the poet has balanced art and life. The Urn itself is in an object, an 'Attic Shape', a 'Cold Pastoral', a 'silent form'. Everything on the urn is unchanging expression of beauty, but

it is lifeless. Whereas everything in our real life is subject to change and decay, but it pulsates with life and passion.

The central thought of this ode is the unity of Truth and Beauty. Keats declares emphatically in 'Ode on a Grecian Urn, 'Beauty is truth, truth beauty'.[5]

Beauty and Truth, says Keats, are not two separate things. They are one and the same thing seen from two different aspects. Keats believes, "Beauty is a middle term which connects and reconciles two kinds of truth-through the mediation of beauty, truth of fact becomes truth of affirmation, truth of life.'[6]

Many other poets and the Hindu conception of God echo the same thing about beauty and truth. Robert Browning conceives of God as a manifestation of truth and says, 'God is truth and truth God.' He held that God is the Absolute Truth. In the poem "Rabbi Ben Ezra" he writes,

> "And God and infinite
> Be named here.....
> with knowledge Absolute".[7]

Likewise, Keats' influence on Tennyson is discernible in the latter's adoration of beauty. His Poems express his creed of beauty. Critics hold that Tennyson saw all the universe of the man and nature and God in their relation to ineffable beauty. In this connection, we might also note Anatosh France's wise words, "If I were called upon to choose between beauty and truth, I should not hesitate; I should hold to beauty, being confident that it bears within it a truth both higher and deeper than truth itself. I will go so far as to say that there is nothing true in the world, save beauty".

Similarly the Hindu devotees of God depict the figure of Him as an embodiment of Satyam, Shivam and Sundaram. To Keats, truth presupposes beauty and joy. From this viewpoint his implicit import of these words – beauty and truth – is identical to Vedantic interpretation of God. Just as Keats uses these words with a profound philosophical implication, the Hindu saints too use these words to describe God in terms of beauty, joy and truth.

5. Conclusion

Keats, the mighty lover of beauty, gives an eloquent expression to his aspiration for a life of permanent beauty and bliss away from the cares and anxieties of the oppressing world. Beauty and truth are identical to him. What is beautiful must be true and what is true must be beautiful. As Keats' aim was to pursue beauty which is also truth; he cannot be called an escapist, for in pursuing beauty he pursued truth.

References

1. Keats, John, *The Norton Anthology of Poetry,* Fourth Edition, New York, London, 1996, pp. 845

2. Ibid, pp. 845

3. Ibid, pp. 846-847

4. Ibid, pp. 847

5. Ibid, pp. 849

6. Lionel Trilling in The Poet as Hero : Keats in his Letters

7. Browning, Robert, *The Norton Anthology of English Literature,* Seventh Edition, Volume-2, New York, London, 1996, pp. 1416

BL College Journal

ISSN 2664-228X
Volume -1, Issue-2, 2019
PP. 162-168

Study of Ecology and Shellfish Diversity of River Nabaganga at Jhenidah in South Western Part of Bangladesh

Dr. Bidhan Chandra Biswas
Associate Professor, Department of Zoology
Government Brajalal College, Khulna, Bangladesh
e-mail : bidhan.biswas67@gmail.com

Dr. Poulami Paul
Research Scholar, Department of Zoology, University of Kalyani, West Bengal, India
e-mail : poulami006@gmail.com

Professor Ashis Kumar Panigrahi
Head of the Department of Zoology and
Ecotoxicology, Fisheries and Aquaculture Extension Laboratory, University of Kalyani
West Bengal, India
e-mail : panigrahiashis@gmail.com
Corresponding email: bidhan.biswas67@gmail.com

Abstract

The river Nabaganga is an important river in the south-western part of Bangladesh and played a significant role in the economy of this region. The study was carried out during the period of June 2014 to July 2015 along the bank of the river. A total of 19 species were identified under 2 classes, 13 families and 14 genera. Molluscans form an important component in the food chain for the higher strata transferring the energy in the aquatic ecosystem. Some of the fresh-water molluscs are edible. The molluscans have an economical and commercial importance. The aim of the paper is to construct a diversity structure of shellfish of the river Nabaganga. These are the parts of our precious natural wild life, which also constitute important components of our fresh water ecosystem and biodiversity besides supporting livelihood to the rural people by the riverside areas in more than one way whether in terms of low-priced proteins or commercial utilization for lime and antique purpose.

Keywords

Diversity, Mollusca, Ecology, Pollution and River Nabaganga

Introduction

Molluscs are soft bodied animal which is encircled by calcareous shield and have been known to play important roles in the ecology of fresh water and also to public and veterinary health. So there is an urgent need to be exploring scientifically and more broadly the issue (Supian & Ikhwanuddin, 2002). Several species of freshwater gastropods are known to act as intermediate hosts for the analytic trematode parasites. Besides these, members of the family Pilidae and Thiaridae were reported to harbor larval trematodes (Subba-Rao, 1993;Karimi et al., 2004). A number of factors are measured as disturbing the ecology of snails and other intermediate hosts of diseases, therefore their focal and seasonal distributions (Hossein et al., 2011). These physical factors involved water current, temperature, turbidity, transparency and distribution of suspended solids; Chemical factors are various degree of ion concentration and dissolved gases in water. Biological factors such as availability of food, competition and predator-prey interactions (Williams, 1970; Ofoezie, 1999). Besides, the aquatic plants have been shown to play critical roles in the distribution of snails in different zones (Ofoezie, 1999). Though the importance of different ecological factors vary significantly from one ecological zone to the other and also vary from one water body to the other, there is a need to identify ecological factors which is responsible for survival and distribution of shellfishes in one water body to other bodies (Dazo et al., 1966; Klumpp & Chu, 1977; Ofoezie, 1999; Elkady et al., 2000; Carg et al., 2009).

Materials and Methods

The collection of molluscan was done at a specific duration of every month. The collected specimen was cleaned with a cleaning brush for removing of algal biomass on the shell and then they were fixed with 5% Formalin Solution. For the identification of malaco fauna standard literature was consulted and quantitative studies were conducted through various months.

Studysite

The study was conducted along the course of the river Nabaganga. Survey was carried out from December 2014 to November 2015. Survey was conducted twice per month. Sampling sites were selected based on their distribution, degree of shoal territory with depth less than one meter and ease of use.

Collection of Mollusca

Specimens were collected by using hand picking from study areas. Nets were also used to collect samples. All samples were transported to fisheries laboratory and specimens were preserved in 95% ethanol.

Identification

Species were identified based upon morphological characteristics of the shell and also with the help of the encyclopedia volume 17, Subba Rao (1993); Bouchet & Rocri (2005). Finally species were identified with the help of Zoological Survey of India, Kolkata.

Result and Discussion

Shellfish diversity of the river Nabaganga in Jhenidah district of south-western part of Bangladesh is shown in the table 1 and family wise species composition were shown in table 2 below.

Table 1 : Identified Shellfish Diversity of the river Nabaganga

Class	Subclass	Order	Family(13)	Scientific name (19) genus 14	Common name	Specis composition
Gastropoda						
	Prosobranchiata	Mesogastropoda	Viviparidae	*Bellamya bangalensis* (Lamarck)	River snail	10.53%
				Bellamya crassa (Benson)	Pond snail	
			Ampullariidae	*Pila globosa* (Swainson)	Apple snail	10.53%
				Pila virens (Lamarck)	Apple snail	
			Bithyniidae	*Bithynia (Diagonstoma) ceramepoma* **(Benson)**		10.53%
				Gabbia orcula frauenfeld Var pprodocta (Nevill)		
			Thiaridae	*Thiara (Thiara) scabra* (Muller, 1774)	Screw snail	5.26%
			Pleuroceridae	*Brotia (Brotia) costula* (Rafinesque)	Brotia snail	5.26%

Pulmonata	Pulmonata	Basommatophora	Lymnaeidae	*Lymnaea (Pseudosuccinnea)* acuminatae Lamarck	Lymneid snail	10.53%
				Lymnaea (Psedusuccinea) luneola Lamarck	Lymneid snail	
			Planorbidae	*Gyraulus labiatus* (Benson)		5.26%
		Stylomatophora	Bullinidae	*Indoplanorbis exustus* (Deshayes)	Rams horns snail	5.26%
			Ariophantidae	*Ariophanta interrupta* (Bencon)		15.79%
				Macrochlamys indica (Godwin -Austin)		
			Cerustuidae	*Rachis bangalensis* (Lamarck)		5.26%
			Acatinidae	*Acatina (Lissachatina) fulica fulica* (Bowdich)		5.26%
			Ariophantidae	*Macrochlamys sequax*	Disk shell	15.79%
Pelecypoda		Eulamellibranchiata	Unionidae	*Lamellidens marginalis*	fresh warer mussel	10.53%
				Lemellidens corianus (Lea)	fresh warer mussel	

In case of snail diversity of the river Nabaganga, 19 species were recorded under two classes, 4 orders and 13 families. Family wise species composition were Ariophantidae occupied 15.79%, and Viviparidae, Ampullariidae, Bithyniidae, Lymnaeidae Unionidae covered 10.53%. Rest of the families such as Thiaridae, Pleuroceridae, Pleuroceridae, Planorbidae, Bullinidae and Cerustuidae covered 5..26%.

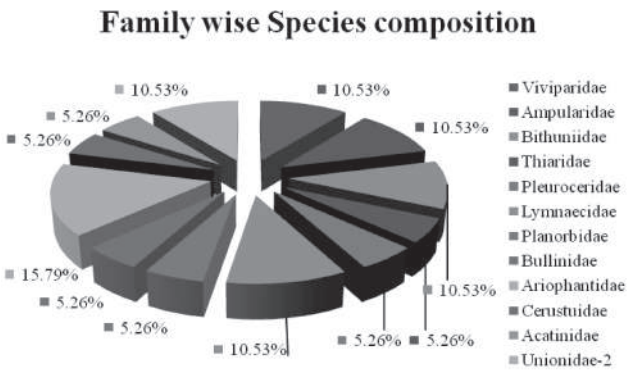

Table 2 : Family wise species composition of collected snails

During the period of study, it was revealed that gastropods and bivalves were dominant in fresh water body of the river Nabaganga. The findings showed similarities with Hossain and Baki (2014). On the basis of structure and function of molluscs, they were heterogeneous in their origin. Fresh water milluscs are now affected both extrinsic and intrinsic factors. The intrinsic factors include habitat degradation, pollution, unavailability of host plants and land use exercise. Prabhakar and Roy (2009) studied the taxonomic diversity of Shellfishes from Kosi region of North Bihar in India. They discovered 20 species of Gastropods and 10 species of Pelecypodes. Goswami et al. (2010) studied the taxonomic accounts of fresh water mollusca and Vincent et al. (1992) also studied sewage pollution impact on water quality and micro zoo benthic fauna.

Apple snails are the common items of Pila globosa found in Bangladesh and India generally eaten by farmers and pet birds. The haphazard use of pesticides in rice fields causes a serious a risk to the survival of shelled animals as they may change the biochemical component resulting in irregular changes in the ethology and physiology. In the present scenario, agriculture completely depends on agrochemicals. Surplus and uncontrolled and repeated use of agrochemicals in the variety of pesticides, fertilizers, and herbicides pollutes the aquatic environment. Molluscs are considered hardy in nature, the changes parameters in soil or water to a large scale affect their movement and feeding, they quickly closed themselves in their shells. This is the prime sign of changed environmental quality viz. pH, hardness of soil, water, and temperature etc. The uses of herbicides in the agricultural fields entered into the water body affect the existence of aquatic plants because aquatic plants were the shelters of some molluscs. Excessive uses of water for cultivation and supply of drinking water affect the diversity of molluscs due to lack of shelters. Over harvesting for lime production and preparation of poultry feed cause havoc to the diversity of fresh-water molluscs (Razi and Brown,1994). In addition migratory birds during winter lessen the molluscan diversity greatly due to overconsumption and shortage of water. Simultaneously, paddy cultivation on the river bed in winter causes the mass mortality of molluscs.

Molluscans form an important component in the food chain for the higher strata transferring the energy in the aquatic ecosystem. Subba Rao (1993); Garg et al. (2009) and Williams (1970) studied a correlation between the molluscan diversity with physiochemical parameter with an effect of water.

Ecosystem management and renovation of the ecology is an essential part of the

conservation for the mulluscans. The ecosystem of a water body has become gaining importance because this type of environments is being poorly managed. From the ecological point of view, producers and consumers showed a positive correlation in all aquatic habitats which possess entirely two different groups of animals one is producers and the other is consumers. Primary and secondary consumers used these as their principal source of energy and maintain energy flow in specific ecosystems. Thus prey-predator relationships in the ecosystem are maintained properly. But the ecosystem of the rivers is gravely hampered due to anthropogenic activities by the human. Man is the top ranking predator destroying the natural environment which caused tremendous effect in our society. Due to degradation of river ecology some species of molluscs are threatened, and some were extinct. According to the IUCN (1996) Red List of Threatened Animals Lists, there were 12 bivalves and 216 gastropods are extinct and 114 bivalves and 806 gastropods are threatened.

Conclusion

This study is conducted to make people aware who are residing by the side of the river, and the policy makers to make them realise how rivers are contaminated which is considered a life line for the South western part of Bangladesh which directly affect the faunal diversity of the molluscan species. Finally, everyone should apprehend that bio- diversity is the part and parcel of our existence.

References

Bouchet P. and Rocri (2005), *Classification and Nomenclature of Gastropod family, Malacologia,* 47(1-2)

Dazo BC, Hairston NG, Dawood IK (1966), *The Ecology of Bulinus Truncatus and Biomphalaria Alexandrina and Its Implications for the Control of Bilharziasis in the Egypt- 49 Project Area*, Bull. Org. Mond. Santé Bull, World Health Organ, 35:339-356

El-Kady G.A., Shoukry A., Reda L.A., El-Badri Y.S. (2000), *Survey and Population Dynamics of Freshwater Snails in Newly Settled Areas of the Sinai Peninsula,* Egyptian J. Biol, 2:42-48

Garg R.K, Rao R.J, Saksena D.N. (2009), *Correlation of Molluscan Diversity with Physicochemical Characteristics of Water of Ramsagar Reservoir,* India, Int. J. Biodivers, Conserv., 6:202-207

GoswamiA.P., Parilh A.N., Mankpdi P.C. (2010), *Taconomic Account of Molluscan Diversity from the Fresh Water Reservoir Around Rajkkot City,* Gijray, Bionano, Frontier, V3(2), pp. 205-208

Hossain M.M., and Baki M.A. (2014), *A Preliminary Survey of Freshwater Mollusca*

(Gastropoda and Bivalva) and Distribution in the River Brahmaputra, Mymensingh, Bangladesh, *The Journal of Zoology Studies* 1(3): 19-22

Karimi, G. R., Derakhshanfar, M. & Paykari, H. (2004), *Population Density, Trematodal Infection and Ecology of Lymnaea Snails in Shadegan,* Iran, Arch

Klumpp, R. K. & Chu, K. Y. (1977), *Ecological Studies of Bulinus Rohlfsi, the Intermediate Host of Schistosoma Haematobium in the Volta Lake,* Bull. WHO, 55: 715-730

Klumpp, R. K. & Chu, K. Y. (1980), *Importance of the Aquatic Weed Ceratophyllum to Transmission of Schistosoma Haematobium in the Volta Lake,* Ghana, *Bulletin of the World Health Organization,* 58 (5): 791-798

Mohamed A. Hussein[1], Ahmad H. Obuid-Allah[1], Amal A. Mahmoud[2] and Heba M. Fangary 2011, *Population Dynamics of Freshwater Snails (Mollusca: Gastropoda) at Qena Governorate,* Upper Egypt, Acad, J. Biolog, Sci., 3(1), 11 -22

Ofoezie, I. E. (1999), *Distribution of Freshwater Snails in the Man-made Oyan Reservoir,* Ogun State, Nigeria, Hydrobiologia, 416: 181-191

Prabhakar A.K. and Roy S.P. (2009), *Taxonomic Diversity of Shellfishes of Kosi Region of North Bihar (India),* Ecoscan 2(2); 149-156

Razi I Brown, D. S. (1994), *Freshwater Snails of Africa and their Medical Importance* (2nd edn.), Taylor & Francis, London, 609 pp. nc., 58: 125-129

Subba-Rao, N. V. (1993), *Freshwater Molluscs of India.* In: Roa K.S. (Ed.), *Recent Advances in Freshwater Biology,* New Delhi, Animal Publication, 2: 187-202

Supian, Z. & Ikhwanuddin, A. M. (2002), *Population Dynamics of Fresh-water Molluscs* (Gastropod : Melanoides tuberculata) in Crocker Range Park, Sabah, *ASEAN Review of Biodiversity and Environmental Conservation* (ARBEC)

Vincent, B., Lafontaine, N. & Caron, P. (1982), *Facteurs Influencant la Structure Desgroupements de Macroinvertébrés Benthiques et Phytophiles Dans la Zone Littorale du Saint-Laurent (Québec)*, Hydrobiologia, 97: 63-73

Williams, N. V. (1970), *Studies on Aquatic Pulmonate Snails in Central Africa. I : Field Distribution in Relation to Water Chemistry.* Malacologia, 10: 153-164

Zaki, H. Y. M. (2008), *Survey on Snail Populations at Abis District, Egypt,* M. Sc. Thesis, Dept. of Parasitology, Faculty of Vet. Med., Alexandria Uni., pp. 94

BL College Journal

ISSN 2664-228X
Volume -1, Issue-2, 2019
PP. 169-185

Prospect of Institutional Repositories in Universities of Bangladesh

Muhammad Hossam Haider Chowdhury
Librarian, Independent University, Bangladesh
e-mail : mhhc@iub.edu.bd

Dr. S. M. Mannan
Professor, Department of Information Science and Library Management
University of Dhaka, Bangladesh
e-mail : smm@univdhaka.edu

Abstract

Institutional Repositories are getting attention of the researchers and their institutions to showcase their own works to others. These are becoming popular specially for unpublished items. Universities are pioneers to initiate establishment of institutional repositories to preserve their faculty and students works. Institutional repositories are playing an important role in World University ranking, as it makes easy access to other researchers. Though, the faculty members of the universities of Bangladesh are regularly contributing to knowledge through their research works and many universities are offering research degrees like, MPhil, PhD, very few universities of the country have such initiatives. Bangladeshi universities need to come forward to establish institutional repositories to showcase their own volume of research from one place.

Keywords

Institutional Repository, Research, Publications, University Ranking, Libraries, Bangladesh

Introduction

The concept of "Institutional Repository" or IR has been receiving considerable attention of the librarians of the western world for the last two decades. The Asian history for establishing IR is almost the same. The libraries of Japan, China, and India are the pioneers in this regard. Universities are playing a vital role for introducing this service in their libraries. The current form of IR, which is getting popularity, is in the

digital form. The definition of IR, which is accepted by the current librarians focuses mainly on the digital format. Easy accessibility of the resources of IR is treated as one of the essential criteria of IR. The internet provides easy accessibility. The resources of digital IR can be accessed throughout the world if it is connected with the internet. The digital IR helps the universities to showcase their scholarly activities. The open access IRs help the authors getting high citations. Many researchers do not have access to required contents due to their inability to subscribe or purchase those. Such researchers may have a copy through the Open Access IRs. Naturally, the authors will have more opportunity to have more citations. Moreover, there is a good number of unpublished items which are regularly producing in universities and mostly those are not appearing to the public in the official forms, like books, journal articles, etc. Theses, dissertations, working papers, etc. are the prominent unpublished items. These unpublished items can be showcased through the current form of IRs. Some universities believe that the IRs would enhance the prestige of the universities through showcasing their faculty's research works. Stepping to establishing digital IRs the universities of Bangladesh can have a platform which can help disseminate their scholarly works and make those accessible to the researchers all over the world.

Objectives

This paper aims to present a brief overview of the 'Institutional Repository' in the context of practices in the world libraries and to give an understanding of its prospect in Bangladesh, specially in this country's university libraries.

Methodology

A sample survey was conducted to understand the position of some leading public and private universities of Bangladesh. Six public and six private university libraries were asked about the collection status of their own research works and publications. Five public and six private universities answered the questions. On the basis of their responses, surfing websites related to institutional repositories, researching SCOPUS and reviewing the literatures on the 'Institutional Repository' helped to shape the understanding of the prospect of institutional repositories in Bangladesh. This paper is the outcome of such understanding.

Definition of IR

The most popular definition of IR is given by Cloford A. Lynch (2003). He defined it as "a university-based institutional repository is a set of services that a university offers to the members of its community for the management and dissemination of digital materials created by the institution and its community members." He also

mentioned, "It is most essentially an organizational commitment to the stewardship of these digital materials, including long-term preservation where appropriate, as well as organization and access or distribution." The statements of Lynch addressed to some important issues, such as, institutional community, organizational commitment, long-term preservation, and services to researchers.

Some essential characteristics of an institutional repository were identified by Crow (2002) in a position paper developed for the Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC). He mentioned some essential elements of IRs, which were: (i) institutionally defined, (ii) scholarly content, (iii) cumulative and perpetual, and (iv) interoperability and open access.

The institutional repositories preserve the original research, scholarly works, and other intellectual property generated by the own institutions or by their constituent population. In an organization various people are active various areas and contributing. Some of them may develop new dimensions in the process and they usually share it through developing papers. Such papers may come out in different formats, such as, journal articles, working papers, books, thesis, dissertations, etc. sometimes these are sponsored by the own organization, sometimes these are developed for other organizations or published outside their own organization. Wherever they contribute, the institutional repositories try to capture their own people's new and original outputs. This concept is termed as "Institutionally defined" by Crow and "Institutional Community" by Lynch.

"Long-term Preservation", mentioned by Lynch and "Cumulative and Perpetual" identified by Corw both convey the same idea. Lynch gave more importance to this concept by identifying "Organizations Commitment" as an essential issue. In fact without the "Organization Commitment" long-term preservation cannot be achieved. Merely librarians' initiative in the universities cannot ensure "Cumulative and Perpetual" access to the resources. The appropriate authorities' approval is essential. This has to reflect the goals and objectives of the organization.

All these efforts are for ensuring service to the researchers. The extent of service needs to be determined. Recently, Open Access (OA) is getting considerable popularity. Open access IRs ensure higher accessibility to the resources. Making IRs open access also needs organizational commitment. The current form of IRs demand at least a part of resources will be open to all. OA activists are mostly in favour of complete open access IRs. In their view this is the most effective way to ensure maximum access to the scholarly works (Harnad, 2001). Harnad (2001) strongly opined to keep open all works at least which are publicly funded.

Growth of Repositories

Preservation of own scholarly works of the universities is not a recent trend. Since medieval period university faculty members have been playing an important role in this regard (Brichford, 1971). But those were useable only inside the libraries. At best, materials could be borrowed under the inter-library loan system. Preserving resources in digital form brought about a revolution. Information Technology (IT) has played an instrumental role in ensuring easy access to these scholarly items.

The use of information technology earned popularity in the 1980s (Paul, 2014). Librarians mostly used IT to replace their card catalogues. Some libraries were able to introduce circulation by using IT. Digitization started receiving attention in the 1990s. Even in 1994, the digitization was a new phenomenon to the libraries of USA (Waters and Garrett, 1996). National Science Foundation (NSF) of USA identified the digital libraries as an important research area and provided support throughout 1990s (Fox, 1999). In this decade, IT services extended in many folds, especially the internet and World Wide Web made a tremendous progress in the arena of information delivery and accessing. In this period subject based repositories were grown. The most popular subject based repository was established in 1991. It was arXiv which was established for preserving digital version of papers in particles and high-energy physics and later expanded its scope by including mathematics, computer science, nonlinear sciences, quantitative biology and statistics (arXiv.org). The arXiv was established initially at Los Alamos National Laboratory and later shifted to Cornell University Library. The popularity of arXiv motivated other professionals to develop repositories on their own subject areas. The prominent subject repositories are: RePEc (Research Papers in Economics) for economics, CogPrints for cognitive science, NTRS (NASA Technical Reports Server) and ADS (Astrophysics Data System) for astronomy, astrophysics and geophysics, AgEcon Search, AEI (Archive of European Integration), NCSTRL (Networked Computer Science Technical Reference Library) for computer science, Organic EPrints, PubMed for Health Science, Social Science Research Network (SSRN), etc.

The initiatives for establishing centralized repository for preserving Electronic Theses and Dissertations (ETD) was seen in mid 1990s. Virginia Tech University, University of Michigan and two small software companies decided in meeting held in 1987 in Michigan, USA, to establish a centralized ETD and the output of the meeting was the Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD) which was established in 1996 (Ahmed et al., 2014; NDLTD, n.d.). Ahmed, Alreyaee, and Rahman (2014) found that forty universities of the USA and hundred institutions from

the rest of the world were contributing to NDLTD. Later some countries had given effort to establish nationwide centralized ETP repository. It can be mentioned that in Asia, China, Japan and South Korea established such national repositories. It was also observed that some universities initiated to maintain their repository for ETD and some of them made students mandatory theses and dissertations submission to their institutional repositories, such as Cranfield University in the UK (Bevan, 2005).

Researchers found difficulties in subject based or centralized repositories. These repositories were not controlled by the researchers of those subjects. A repository serves the organizations better of which the repository is a part. However, there were distrust and fear among the researchers of losing control over their works. Due to that, participation of researchers in the centralized system of repository was very low.

Researchers looked for more dependable repositories and eventually "Institutional Repositories" emerged. The researchers found it more dependable because this is the part of their own organization or institution and they can have better control over it. Release of two software, Eprint in 2001 and DSpace in 2002, both open sourced software, have high influence in expanding repositories in the institutions individually. The sharp increase of the repositories started after these two software were released. Many universities those had required infrastructure started to establish their own repositories using these software. According to Open DOAR, over 50% repositories of the world are using DSpace and Eprint is used over 27% repositories.

Alongside, Open Access (OA) concept received attention of the researchers. In fact researchers raised their voices against the high prices of journals. The high price of journals hinders many researchers to get access to the research contents. As a result the authors were not getting adequate citations. Harnad (2001) wrote extensively in popular scientific journal 'Nature' on this issue. He strongly advocated that the authors wrote for citations and high pricing of journals were the impediment to get citations. He advised to make active the alternative channels for scholarly communication. He tried to motivate researcher to publish their works through the gold channel, i.e., Open Access Journals and initiate for green channel, i.e., establishing institutional repositories. Many researchers of the world also had the same feelings. The reflection of such researchers' attitude was found in the Budapest declaration on Open Access (OA) initiatives in 2002. The Budapest Open Access Initiative (BOAI) is the bench mark of OA movement. The purpose of this movement is to take the advantage of the internet and make literature availability free to all. That is researchers should be able "to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full text of the articles, crawl them for indexing, pass them as data to software, or use them for any other

lawful purpose, without financial, legal or technical barriers other than those inseparable from gaining access to the internet itself" (Krishnamurthy and Kemparaju, 2011). It is also the foundation of open access institutional repositories. Institutional repositories along with ETDs started to collect other items, such as faulty works.

Bailey (2006) mentioned top three reasons for implementing an IR in universities. These were: 1) to increase global visibility, 2) the free, open and timely access to institution's scholarship, and 3) preservation of and long term access to institutional scholarship (Woodberry and Bailey Jr, 2008).

A good number of universities made their faculty members and students compulsory placement of their research outputs into their respective institutional repositories. Sometimes final products cannot be submitted due to embargo of publishers. In such situation pre-prints can be kept into IRs. Other than research papers, researchers can submit data sets, images, multimedia content, etc. All contents of IRs can be searchable from the library's Online Public Access Catalog (OPAC) in addition to Google Scholar. The IR managers provide required metadata to ensure appropriate access to items through Online Public Access Catalog (OPAC) or Google Scholar. This service is emerging as a clearinghouse for the institution's scholarly works.

Repository Establishment by Department

The modern institutional repositories are mainly in digital form. To organize, establish and running a successful institutional repository needs involvement of various stakeholders. Its digital nature demands obviously the involvement of information technology personnel. It is true that establishment of IR needs help of IT staff members of the university. To run it the manager of IR needs skills which are fully related to skills of librarians. Libraries are known as repositories of knowledge. Libraries preserve knowledge/information items for long time survival. Librarians take necessary initiative for collecting and preserving knowledge/ information items. They are experts in selecting required information items for the benefit of their users. Libraries have long history of storing and managing information items. They organize the collected information items for their logical dissemination. They are dealing regularly with the knowledge users. They can evaluate the performance of collection and make decisions relating to access, conservation, and preservation (Chan et al., 2005). They are utilizing information technology for the improvement of service. The introduction of technical infrastructures of libraries enables long-term sustainability of resources (Kretzschmar and Potter, 2010; Kutay, 2014). To adapt with the new technological demands librarians are continuously trying to update their own access systems to resources preserved (Balnaves, 2005).

Librarians' skills may be related to print materials. But many of their skills related to print collections can be transferable to the digital environment (Rao, 2007). Moreover, librarians showed their enthusiasms to prepare themselves for the digital world (Allard et al., 2005; Hirko and Ross, 2004). In view of Allard et al (2005), librarians were qualified for managing institutional repositories. They mentioned, "Librarians have kept pace with the dynamic information environment and have adapted collection manager responsibilities to address issues related to the introduction of digital materials which have changed the very character of the collections (Branin et al., 2000; Lee, 2000; Pettijohn and Neville, 2003)".

Librarians found that their expertise of information management matches with the various works of information technology related jobs. Acquiring skills related to repository running, librarians initiated to capture scholarly outputs of the universities available on the web and established institutional repositories to put those (Hanlon and Ramirez, 2911) and the academic community takes these initiatives positively. Many literature shows that librarians are the pioneer in establishing IRs. A study found that 71.1% institutional repository personnel of Australia had background of library and information management (Kennan and Kingsley, 2009; Simons and Richardson, 2012). The Indian library science professionals' association in establishing and maintaining institutional repositories is also very high (Sawant, 2011). Half of the members of the Association of Research Libraries (ARL) of United States of America (USA) were found, by Bailey et al. (2006), to either have or plan to implement institutional repositories soon. This indicates that librarians are playing a vital and leading role in the growth of institutional repositories (Simons and Richardson, 2012).

Research Publishing Trends in Bangladesh

Several organizations were established to conduct research in various subject areas. We can mention few organizations on an specific field. In agriculture research organization are functioning are: Bangladesh Atomic Energy Commission (BAEC), Bangladesh Agriculture Research Council (BARC), Bangladesh Agriculture Research Institute (BARI), Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research (BCSIR), Bangladesh Fisheries Research Institute (BFRI), Institute of Child and Mother Health (ICMH), Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS), Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture (BINA), Bangladesh Livestock Research Institute (BLRI), Bangladesh Rice Research Institute (BIRI), International Centre for Diarrhoeal Disease Research Bangladesh (ICDDR,B), National Institute of Preventive and Social Medicine (NIPSOM) and many more.

In addition to teaching, universities have a responsibility to conduct research. Bangladeshi universities also are regularly contributing in research. Students are working under the supervision of the faculty members, producing theses and dissertations. Moreover, the faculty members are also pursuing research and their research works outputs are publishing in various forms, such as an article of a journal, or as a book, etc. SJR (SCImago Journals & Country Rank) is a database which maintains records of world journals based on Scopus, a service of Elsevier for ranking research of the world, and ranks journals. It was checked in May 2016 to understand the position of Bangladesh. We found that SJR recorded around twenty seven thousand publications which were published between 1996 and 2014 where Bangladeshi researchers were associated. These documents were either journal articles or conference papers on various disciplines. Table 1 shows the year-wise coverage of subjects of Bangladeshi research outputs recorded in SJR during 1996 to 2014.

Table 1: Year-wise subject coverage of publications of Bangladeshi researchers

Subjects	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Agricultural and Biological Sciences	131	121	99	112	121	132	121	131	149	193	257	297	291	353	441	469	481	547	537
Arts and Humanities	4	4	6	8	5	4	7	6	7	11	15	13	15	23	28	35	46	40	110
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology	44	33	41	32	39	49	48	59	61	72	98	132	133	148	190	214	258	310	379
Business, Management and Accounting	2	5	4	2	3	3	6	1	4	9	10	19	21	27	28	50	48	51	56
Chemical Engineering	14	12	11	15	19	14	20	30	21	40	29	37	41	65	109	100	109	90	111
Chemistry	39	41	43	70	33	71	54	62	84	89	82	115	90	105	96	150	160	157	172
Computer Science	10	15	29	15	29	14	23	28	41	72	93	319	378	363	352	357	491	536	713
Decision Sciences	1	5	6	1	2	3	5	3	-	2	5	6	5	10	19	24	16	14	19
Dentistry	1	2	-	1	3	-	1	1	-	-	-	1	1	1	1	1	2	4	3
Earth and Planetary Sciences	13	18	23	15	28	24	28	28	35	23	46	41	58	67	67	82	95	112	112
Economics, Econometrics and Finance	3	9	6	2	3	6	1	5	3	13	9	13	21	33	29	44	51	57	68
Energy	12	16	13	13	22	29	9	23	18	20	26	36	33	85	42	62	106	75	241
Engineering	56	75	85	62	79	69	89	86	115	153	180	323	382	285	532	393	767	711	825
Environmental Science	27	38	46	43	57	53	78	81	93	100	122	142	145	181	216	211	270	287	323
Health Professions	1	-	1	3	2	4	1	-	1	2	3	2	9	1	12	17	11	13	5
Immunology and Microbiology	26	14	17	19	29	20	22	28	41	46	65	68	56	95	100	106	125	130	137

Materials Science	57	45	52	58	68	63	77	83	89	94	112	136	107	146	182	202	205	223	181
Mathematics	23	19	30	19	22	19	35	34	42	26	46	40	63	95	102	102	135	127	111
Medicine	145	149	137	180	194	189	146	213	218	241	307	336	397	461	487	601	723	719	766
Multidisciplinary	8	9	15	18	8	9	7	24	15	21	29	30	16	36	33	30	32	74	52
Neuroscience	-	4	2	3	1	-	1	6	2	3	6	3	5	7	7	6	15	14	21
Nursing	10	10	9	11	9	10	16	24	15	13	19	25	27	31	41	42	42	30	35
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics	17	15	15	26	18	28	23	29	37	31	46	67	85	110	135	224	198	156	168
Physics and Astronomy	63	58	70	71	82	78	73	108	101	104	98	103	139	134	146	213	235	264	247
Psychology	1	1	1	2	4	2	1	3	2	5	1	6	7	4	12	10	13	12	18
Social Sciences	32	38	41	43	39	44	38	62	58	61	75	74	93	109	161	159	178	188	232
Veterinary	9	6	9	8	6	13	9	15	20	15	19	14	20	23	35	33	53	52	50

Recently, Scopus was searched with the term "AFFILCOUNTRY(Bangladesh)" to know the status of Bangladesh too. We found 45,678 documents in the record of SCOPUS.

Figure 1: Number of publications of public universities and colleges of Bangladesh in Scopus

Figure 2 : Number of publications of private universities of Bangladesh in Scopus

We found sixty one organizational affiliations from Bangladesh. Two thirds of those organizations were universities. Twenty six of them were public universities and colleges; thirteen were private universities and one international university. Figure-1 and Figure-2 show the documents listed in Scopus for public and private universities and colleges of Bangladesh respectively. Public universities' documents listed in Scopus are much higher than that of private universities; though the number of private universities is around three times than the public universities. Private university is a recent phenomenon in Bangladesh. It started its function from 1993. Note that, the first public university was established in 1921. Undoubtedly time is a great factor for such huge difference. At the same time private universities are not getting permission to offer research degrees like, MPhil, PhD degrees. Universities which offer such degrees have the better opportunity to produce research works in a regular basis. However, there is a trend to publish research papers by the people working in private universities.

Scopus indexed very old documents too. A publication where D G Crawford was associated along with other authors published in British Medical Journal (BMJ), was found to be the earliest document from Bangladesh in the Scopus. It was published in

BMJ, Volume 1, Issue 1374, 30 April 1887. Mr. Crawford was affiliated with Mymensingh, Bangladesh (no organization mentioned).

Two documents published in 1925 in proceedings of the Edinburgh Mathematical Society were found as the earliest document associated with Bangladeshi universities in Scopus. Jyotirmaya Ghosh was associated as author of both the documents. Mr. Ghosh was affiliated with the University of Dhaka.

The two oldest documents found in Scopus for private universities of Bangladesh were of 1997. One author was affiliated to Independent University, Bangladesh (IUB) and the other was affiliated to North South University (NSU).

Figure 3 : Publishing trend of Bangladesh from 2003 to 2017 based on Scopus

The Scopus showed an upward trend in publishing research output among the Bangladeshi researchers. Figure 3 shows the last fifteen years trend of Bangladeshi works indexed in Scopus. The figure clearly shows that the publishing trend of Bangladesh is upward. Except one year, every year the number of documents increased. The figure only represents the documents indexed in Scopus. Scopus does not index all publications. They have their own policy to include a document for indexing.

It is important to note that these figures are made based on Scopus database. Scopus database does not include all published materials. They have their own criteria to include publications in their database. In reality, there will be more research outputs by the Bangladeshi researchers. Every year not only researchers are publishing, there are many researches being conducted in universities by the students which were not published anywhere.

Along with published research outputs, a good number of unpublished materials are being produced in the universities of Bangladesh. Each of the universities should showcase their research to the global community. The authors of Bangladesh should be more alert for receiving more citations from other authors. One hundred sixty sources were found in SCOPUS where the writings of Bangladeshi authors were found. A large number of sources, i.e, journals, proceedings, etc., were originated outside Bangladesh. If the authors of Bangladesh do not try to keep their copyright to themselves, a day may come when Bangladeshi researchers will not get access to their own resources due to high prices. To address this issue, the universities can provide their authors a platform to preserve their own research papers or any research related items, such as data sets, etc.

Prospect of Institutional Repositories in Universities of Bangladesh

Bangladesh has 45 public universities, 103 private universities and three international universities (University Grants Commission of Bangladesh, 2019). Trends of establishment of institutional repositories in the universities of Bangladesh are not yet clear enough, although public universities have high chances to establish successful institutional repositories. It is assumed that most of the universities of Bangladesh do not have institutional repositories. Possibly, most of the librarians of these universities are not aware of the technology available for the establishment of institutional repositories. Old public universities are offering research degrees like MPhil, PhD, etc. These universities have high prospect for establishing institutional repositories.

There are two registries which register institutional repositories. These are- OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories) and ROAR (Registry of Open Access Repositories). Websites of the both registries were surfed on May 5, 2018 to know the existence of IRs in Bangladesh. Among university repositories of Bangladesh, only seven registered in OpenDOAR and eight in ROAR (Table-2).

Table-2 : Institutional repositories of Bangladesh in DOAR and ROAR

DOAR	ROAR
--	Bangabondhu Sheikh Mujib Medical University
BR BRAC University	BRAC University
D Daffodil International University	Daffodil International University
East West University	East West University
Eastern University, Bangladesh	Eastern University
Independent University, B Bangladesh	Independent University, Bangladesh
Islamic University of Technology	Islamic University of Technology
University of Dhaka	University of Dhaka

Among the public universities, only the University of Dhaka registered its repository in both the sites. There is one more public university which was registered only in ROAR. One international university, i.e., Islamic University of Technology, also registered in both the sites. All other repositories are of private universities. All five private universities' repositories have appearance in both the registries.

Zillur Rahman (2013) in his PhD thesis mentioned about the initiatives of some universities for establishing IRs under HEQEP (Higher Education Quality

Enhancement Program), a project of University Grants Commission of Bangladesh. He found seven universities. These were: Bangladesh University of Engineering and Technology, Bangladesh Agricultural University, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, Khulna University of Engineering and Technology, Sher-e-Bangla Agricultural University, Chittagong Veterinary and Animal Science University, Department of Information Science and Library Management of the University of Rajshahi, and Sylhet Agricultural University.

Selected six public and six private university librarians or library-heads were asked about the status of unpublished items in their libraries to get an idea in mid 2016. It was found that university libraries were receiving various unpublished documents like theses, dissertations, reports, etc., (Table-3).

Table-3 : Unpublished contents received in the libraries

	Maximum	Minimum	Sum	Missing	Total
PhD Theses/Dissertations	2047	84	2869	8	11
MPhil Theses/Dissertations	2500	150	2650	9	11
Maters Theses/Dissertations	15467	194	25351	5	11
Internship reports	7000	193	12585	6	11
Project reports	3000	183	6003	7	11
Other reports	1300	1300	1300	10	11

PhD, MPhil and Master Theses or Dissertations were received by three, two and six university libraries respectively. Five universities received internship reports of the students and four university libraries received project reports. A good number of other reports (not specified) were also received by one university library.

These unpublished items were mostly in hard copies (Table-4). All libraries received hard copies. Around one third of those libraries had provision for digital submission. However, two thirds of those libraries received unpublished items on CD-ROM.

Table 4 : Forms of Unpublished Items Collection

		Count	Total N %
Collection of Unpublished Items	Hard copy	11	100.0%
	CD-ROM	7	63.6%
	Digital submission	4	36.4%
	Total	11	100.0%

Analysis

Universities of Bangladesh are regularly contributing to different field of knowledge. Faculty members as well as students are producing scholarly materials. Faculty works are usually published in journals, sometimes as books, conference papers, working papers, etc. Their works would be useful to the Bangladeshi researchers. Bangladesh does not have good number of libraries which can provide access to adequate resources. As a result, they are possibly losing citations. Students' works are mostly unpublished, such as, theses and dissertations. Placing students' works in the institutional repositories will increase volume of scholarly works of the universities. Additionally, the absence of their own IRs their scholarly works cannot be identified exclusively as their institutions own works. The exclusive showcasing of the scholarly works of the universities would help to get better place in the ranking.

Literatures showed that all over the world mostly librarians were in the forefront to establish institutional repositories, being librarians are trained in collecting, preserving and disseminating information materials. Institutional Repositories have been establishing for around two decades to collect, preserve and disseminate research outputs of the respective institutions. Research outputs are usually come out in several formats. All of those forms are collectable in the libraries as information sources. Current trend of institutional repositories is to collect all of those information materials in digital form. Due to its digital nature librarians may need to take help of Information Technology (IT) personnel. IT personnel can help the librarians in several stages of IR establishment and running. Such as, to choose hardware and software at the initial stage; to keep running the software and hardware including networks; and to keep all of these up-to-date. But day to day works would be done by the librarians. Librarians works related to IR running would be like, training the users, i.e., faculty, researchers and students in case of universities; marketing of IR service; taking care of metadata and control vocabulary to ensure uniform practice and accurate dissemination of the collected materials, etc.

Conclusion

Universities are playing an important role to generate knowledge. These days, Western universities are emphasizing on showcasing their knowledge outputs. It is influencing the university rankings too. Out of six metrics for world university ranking done by QS (Quacquarelli Symonds Limited), one is citations per faculty. One fifth of the score depends on this particular criterion (Methodology, 2018). Times Higher Education (THE) World University Rankings also consider citations per faculty as an indicator for university ranking (World University Ranking 2018, 2018). Research is

considered as one of the major group of indicators by RUR (Round University Rankings) (Round University Rankings Methodology, 2018) and US News Global Universities Rankings (Morse and Krivian, 2017). IRs can help the universities to increase the citations of their authors. Very few universities of Bangladesh are maintaining IRs. As per registries, less than 10% of Bangladeshi universities have IRs. It is assumed that other libraries need a guidance to develop their IRs. All universities have thrust to see themselves at the top of rankings. Without showcasing the research works of the universities it will be a difficult task. IRs are not only meant for showing-up scholarly works generated in a university, it can also help to get better or higher citations of their researchers if open access IRs can be maintained. University Grants Commission (UGC) of Bangladesh is running UGC Digital Library (UDL). The UDL is currently assisting the universities in purchasing electronic books and subscribing electronic journals. These digital resources are originated in foreign countries. The libraries of Bangladesh can only serve as access points to reach those resources. The true digital library can be built if the repositories can be established with own resources. The naming of UDL will be more meaningful if it can contribute to motivate universities to develop their own institutional repositories and provide necessary support in terms of technical assistance and funding.

References

Ahmed, A., Alreyaee, S. & Rahman, A. (2014), *Theses and Dissertations in Institutional Repositories : An Asian Perspective,* New Library World, [online] 115(9/10), pp.438-451

Allard, S., Mack, T. R. & Feltner-Reichert, M. (2005), *The Librarian's Role in Institutional Repositories : A Content Analysis of the Literature,* Reference Services Review, [online] 33(3), pp.325-336,

arXiv.org. (2015), General Information : about arXiv. [online]. Cornel University Library, Available at: http://arxiv.org/help/general [Accessed 7 October 2015]

Bailey, C. W., Coombs, K., Emery, J., Mitchell, A., Morris, C., Simons, S. & Wright, R. (2006), Executive Summary, [online]. Spec Kit 292 : Institutional Repositories. Washington DC: Association of Research Libraries, pp.13-21. Available at: http://www.arl.org/spec/ [Accessed 7 October 2014]

Balnaves, E. (2005), *Systematic Approaches to Long Term Digital Collection Management. Literary and Linguistic Computing,* [online] 20(4), pp.399-413

Bevan, S. J. (2005), *Electronic thesis Development at Cranfield University, Program,* [online] 39(2), pp.100-111

Branin, J. J., Groen, F. & Thorin, S. (2000), *The Changing Nature of Collection Management in Research Libraries,* Library Resources and Technical Services, [online] 44(1), pp.23-32 Available at: http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/alcts/resources/lrts/archive/44n1.pdf [Accessed 22 June 2015]

Brichford, M. (1971), *University Archives : Relationships with Faculty, The American Archivist,* [online] 34(2), pp.173-181. Available at : http://americanarchivist.org/doi/pdf/10.17723/aarc.34.2.g724227207t80462?code=same-site [Accessed 6 February 2017]

Chan, D. L., Kwok, C. S. & Yip, S. K. (2005), *Changing Roles of Reference Librarians : The Case of the HKUST Institutional Repository,* Reference Services Review, [online] 33(3), pp.268-282

Crow, R. (2002), *The Case for Institutional Repositories : A SPARC Position Paper,* [online], Washington, DC, The Scholarly Publishing & Academic Resources Coalition. Available at: http://works.bepress.com/ir_research/7 [Accessed 7 October 2015]

Fox, E. A. (1999), *Digital Libraries Initiative (DLI) Projects 1994-1999, American Society for Information Science,* Bulletin of the American Society for Information Science, [online] 26(1), pp.7-11

Hanlon, A. & Ramirez, M. (2011), *Asking for Permission : A Survey of Copyright Workflows for Institutional Repositories,* Portal : Libraries and the Academy, [online] 11(2), pp.683-702, Available at : http://muse.jhu.edu/journals/pla/summary/v011/11.2.hanlon.html [Accessed 22 June 2015]

Harnad, S. (2001), *The Self-archiving Initiative, Nature,* [online] 410 (6832), pp.1024-1025

Hirko, B. & Ross, M. B. (2004), *Virtual Reference Training : The Complete Guide to Providing Anytime, Anywhere Answers,* 1st ed. [ebook] Chicgo : American Library Association, Available at : https://books.google.com.bd/books?id=fjsF3fKUxzg

Kennan, M. A. & Kingsley, D. A. (2009), *The State of the Nation : A Snapshot of Australian Institutional Repositories, First Monday,* [online] 14(2), Available at: http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/2282/2092 [Accessed 17 June 2015]

Kretzschmar, W. A. & Potter, W. G. (2010), *Library Collaboration with Large Digital Humanities Projects, Literary and Linguistic Computing,* [online] 25(4), pp.439-445, Available at: http://llc.oxfordjournals.org/content/25/4/439.short [Accessed 24 June 2015]

Krishnamurthy, M. & Kemparaju, T. (2011), *Institutional Repositories in Indian Universities and Research Institutes : A Study. Program,* [online] 45(2), pp.185-198

Kutay, S. (2014), *Advancing Digital Repository Services for Faculty Primary Research Assets : An Exploratory Study,* The Journal of Academic Librarianship, [online] 40(6), pp.642-649

Lee, H. L. (2000), *What is a Collection? Journal of the American Society for Information Science,* [online] 51(12), pp.1106-1113

Lynch, C. A. (2003), *Institutional Repositories : Essential Infrastructure for Scholarship in the Digital Age,* Portal : Libraries and the Academy, [online] 3(2), pp.327-336

Methodology, (2018), [online], Quacquarelli Symonds Limited, Available at : https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings/methodology [Accessed 7 May 2018]

Morse, R. & Krivian, A. (2017), *How U.S. News Calculated the Best Global Universities Rankings.* [online]. US News, Available at: https://www.usnews.com/education/best-global-universities/articles/methodology [Accessed 7 May 2018]

NDLTD. (n.d.). Mission, Goals, and History. [online]. NDLTD. Available at : http://www.ndltd.org/about [Accessed 7 February 2017]

Paul, S. (2014), *Digitization Initiatives and Special Libraries in India. The Electronic Library,* [online] 32(2), pp.221-238

Pettijohn, P. & Neville, T. (2003), *Collection Development for Virtual Libraries,* [online]. Building a Virtual Library. Hershey, PA: IGI Global, pp.20-36. Available at: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=773094 [Accessed 7 October 2015]

Rao, P. V. (2007), *Institutional Repositories : A Key Role for Libraries, Paper Presented at 5th International CALIBER,* [online], Chandigarh, pp.689-695, Available at: http://ir.inflibnet.ac.in/handle/1944/1443 [Accessed 7 October 2015]

Round University Ranking Methodology, (2018), [online], Round University Rankings. Available at: http://roundranking.com/methodology/methodology.html [Accessed 7 May 2018]

Sawant, S. (2011), *Institutional Repositories in India : A Preliminary Study. Library Hi Tech News,* [online] 28(10), pp.6-10

Simons, N. & Richardson, J. (2012), New Roles, New Responsibilities : Examining Training Needs of Repository Staff, *Journal of Librarianship and Scholarly Communication,* [online] 1(2), pp.1-16

University Grants Commission of Bangladesh, (2019), [online], Dhaka : University Grants Commission of Bangaldesh. Available at: http://www.ugc.gov.bd/ [Accessed 9 November 2019]

Waters, D. & Garrett, J. (1996), *Preserving Digital Information : Report of the Task Force on Archiving of Digital Information.* [ebook]: ERIC, Available at : https://www.clir.org/pubs /reports/pub63watersgarrett.pdf [Accessed 1 February 2017]

Woodberry, E. & Bailey Jr, C. W. (2008), *SPEC Kit 292 : Institutional Repositories, Australian Academic & Research Libraries,* [online] 39(2), pp.129-130

World University Rankings 2018, [online], *Times Higher Education,* Available at : https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2018/worldranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/scoes [Accessed 7 May 2018]

Zillur Rahman, M. (2013), *A Plan for Modernization of University Libraries in Bangladesh,* [online], PhD thesis, University of Dhaka, Available at: http://repository.library.du.ac.bd/xmlui/handle/123456789/563 [Accessed 9 October 2015]

BL College Journal

ISSN 2664-228X
Volume -1, Issue-2, 2019
pp. 186-197

Toxicity of Organophosphate Insecticides to Adult Housefly, *Musca domestica*

Dr. Hosne Ara
Associate Professor, Department of Zoology
Government Brajalal College, Khulna, Bangladesh
e-mail : hosneara.khulna01@gmail.com
and

Professor Dr. M. Khalequzzaman
Department of Zoology, University of Rajshahi,
Rajshahi 6205, Bangladesh
e-mail : kzaman@ru.ac.bd

Abstract

The present study was made to find out the dose mortality experiments using several most commonly used insecticides applied in agriculture. Interaction between insecticides and insects in mortality offers the chance of evaluation of the level of toxicity. The present study has been done with four organophosphate insecticides, viz. malathion, chlorpyrifos, diazinon and phenthoate. The toxicity test was carried out by the topical application (contact bioassay) on adult housefly in different doses. Insecticides used in this investigation were active against male and female housefly, *Musca domestica.*

The LD_{50} of malathion, chlorpyrifos, diazinon and phenthoate were calculated as 0.823, 0.909; 0.249, 0.276; 2.519; 2.114, 2.151, 1.849 µg/fly-1, respectively. The aim of the study was to find out mortality of general used of insecticides applied in the field for controlling pests.

Keywords

Insecticides, Organophosphate, Toxicity, Housefly, *Musca domestica,* LD_{50}

Introduction

Chemical insecticides have been considered an essential component of insect pest control since the early 1950s. Increasing insecticidal use since world war in the result

of several advantages for insect control. Insecticides have brought inestimable benefits to humanity in terms of human lives also saving of public health, sufferings diminished and brought about economic gain (Metcalf, 1968; Smith and Van den Bosch, 1967).

Insecticides are the most powerful tools available for use in pest management. They are highly effective, rapid in curative action, adaptable to most situations, flexible in meeting changing agronomic and ecological conditions, and relatively economical. Insecticides are the only tool for pest management that is reliable for emergency action when insect pest populations approach or exceed the economic threshold. The misuse, overuse and unnecessary use of insecticides (Bailey and Swift, 1968) have been the most important factors in growth of interest in pest management, and indeed this concept seeks to maximize the advantages in their use and minimize the disadvantages. It should always be remembered that the application of insecticides represents purposeful environmental contamination and can be justified only where benefit or risk ratios are clearly titled in favour of insecticide use.

An insecticide can only control an insect pest if it is suitably toxic and applied in such a way that it reaches its intended target. Many interacting factors are involved in the process of ensuring a suitably formulated, toxic, active ingredient is applied to provide adequate coverage and subsequent pickup and mortality of the insect. It is first necessary to ensure that under optimal conditions, the active ingredient is sufficient by efficacious then that the application parameters produce droplets on deposits that can be picked up and transferred to the targeted stage of the insect life cycle.

Laboratory bioassays to establish insecticide efficacy include standardization of insect species, stage, sex, age and physiological and behavioural conditions (Dent, 1995), since all these factors will influence the susceptibility of a pest. Extrinsic factors such as temperature, humidity, feeding and time of treatment, density of treated insects and illumination also have an impact on susceptibility and need to be standardized. The insecticide may be applied topically to the outer surface of the insect using micropipettes or special syringes.

Houseflies may be contaminated with several species of pathogenic bacteria (*Sukontason et al.,* 2000) and are correlated with diseases, such as gastroenteritis, ulcers, nosocomial infections, dysentery, cholera and tuberculosis (Grubel *et al.,* 2000; Sulaiman *et al.,* 2000; Olsen and Hammack, 2000; Fotedar, 2001). Also the potential of houseflies for transmitting viruses was demonstrated by Tan et al., 1997. By transmitting diseases, houseflies cause annoyance to man and animal. The present study was designed to test the lethal effect of different insecticides on adult houseflies with topical method.

The objective of the study is to evaluate efficacy and to compare efficacy of different organophosphate insecticides on adult housefly *(Musca domestica).*

2. Materials & Methods

Test organisms: The adult housefly stock cultures were maintained in the Integrated Pest Management Laboratory, Institute of Biological Sciences, University of Rajshahi. To produce a consistent quality insect at an economical cost, the culture process was conducted by rearing the houseflies according to the methods described by Morgan (1980-81), Morgan and Patterson (1978) and Morgan *et al.* (1978).

The adult houseflies were provided with a medium in which they lay eggs. This medium was presented in plastic pots (250 ml). The medium consisted of 9g milk powder and 5g yeast dissolved in 100ml of water and added to 100g wheat bran, following method of Wilkins and Khalequzzaman (1993). The mixture was then thoroughly stirred and put into the pots leaving 3cm from the top. The pots were placed in the cage for 24 hours. During that time the females laid batches of eggs, each batch containing about 100-150 eggs.

Batches of approximately 100 eggs were separated out and transferred to similar pot containing the same mixture and fitted with plastic lids with gauze centers. These were then placed in an incubator at 28? ± 0.5?. Within 8-12 hours' eggs were hatched and larvae developed into pupae from 5 to 8 days. Pupae were collected and kept in separate pots at the same temperature and newly emerged into adults approximately of same age.

When imagoes became adult, they were sexed by examining the adult's abdominal tips. The abdomen of the males is somewhat smaller than that of females. The male bears large black spot with bristles, but the female bears smaller black spot having no bristles. The male has no ovipositor, but the female has an ovipositor.

Selection of Insecticides : Four organophosphate insecticides used in this investigation were malathion, diazinon, chlorpynifos and phenthoate. Malathion was procured as Limithion 57EC by Cheminova, Denmark. Chlorpyrifos was procured as Classic 20EC by ACI Limited of Bangladesh (Lupin Agrochemicals). Diazion was procured as Diazinol 60EC by ACI Limited of Bangladesh (The Limit Agro-products Ltd.). Phenthoate commercially available as Cidial by ACI Limited of Bangladesh was used. The insecticides were diluted in acetone and different doses were made. Bioassay method including a control dose of only acetone for each insecticide were used in this study.

All experiments were carried out using *Musca domestica* reared at 28? ± 3?, 70% relative humidity and fed on milk and sugar cubes. The flies were sexed and treated with insecticide separately.

Contact bioassay: Bioassays were carried out by topical application of a 1µl drop of an insecticide solution of different concentration to the thoracic notum of 5 days old adult flies (anaesthetized flies) with a Hamilton gas tight micro syringe (No. 630) . Different concentrations were used in which eight replications of flies (each having 10 flies) were treated. One batch of control flies were maintained in which only solvent was applied topically.

A set of ahoc experiments of each insecticide with a particular dose before the final experiment were done, to obtain the dose in which mortality rate was 10-90%. Then the actual experiments were carried out with the appropriate doses.

The treated flies were kept in a beaker (500 ml) with a wad of cotton soaked with sugar solution as food. Mortality of test insects was recorded 24 hours after treatment. Moribund insects were counted as dead. The insects, which could not walk and failed to respond even after touching with an entomological forceps were also considered as dead.

Mortality of the treated flies was recorded after 24 hours of treatment. Corrected mortality percentage was calculated using Abbott's formula (Abbott, 1925; Busvine, 1971)

Each trail was repeated 2-3 times to obtain more uniform results and a smaller error. Probit analysis was done according to Busvine (1971) and Finney (1971) using a software developed in the Department of Agricultural and Environmental Science, University of Newcastle Upon Tyne, United Kingdom. The program also calculates confidence limits for LD_{50}.

3. Results

The results obtained from the toxicity experiments were shown in tabular form and probits were shown in graphical presentation. (fig.1)

Initial bioassays were carried out to establish the effect of the insecticides. Different doses of malathion, chlorpyrifos, diazinon and phenthoate were applied topically on adult housefly *Musca domestica*. The calculated LD_{50} value on adult houseflies were 0.824, 0.250, 2.519, 2.151 µg/fly-1 for male and 0.909, 0.276, 2.114, 1.849 µg/fly-1 for female treated on malathion, chlorpyrifos, diazinon and phenthoate respectively.

The results indicate that chlorpyrifos was the most toxic and diazinon was the least toxic to both male and female houseflies. The order of toxicity of the insecticides was chlorpyrifos> malathion> phenthoate> diazinon for both male and female houseflies. The regression equations, 95% confidence limits and? 2 (df) values are presented in the table 1 below.

Table1 LD_{50}, 95% confidence limits and regression equations of the tested insecticides (topical application) on adult houseflies (*Musca domestica*) after 24 hours of treatment

Male Houseflies

Insecticide	LD50 ($\mu g/cm^2$)	95% confidence lower limit ($\mu g/fly^{-1}$)	95% confidence upper limit ($\mu g/fly^{-1}$)	Regression equation	$\chi 2$ (3 df)
Malathion	0.823	0.695	0.975	Y=3.257242+1.9031X	0.749
Chlorpyrifos	0.249	0.212	0.293	Y=2.250086+ 1.968246X	0.723
Diazinon	2.519	2.129	2.979	Y=2.356537+ 1.886506X	0.691
Phenthoate	2.151	1.841	2.513	Y=2.208063+ 2.094941X	1.605

Female Houseflies

Insecticide	LD50 ($\mu g/cm^2$)	95% confidence lower limit ($\mu g/fly^{-1}$)	95% confidence upper limit ($\mu g/fly^{-1}$)	Regression equation	$\chi 2$ (3 df)
Malathion	0.909	0.755	1.094	Y=3.362447+1.70838X	0.041
Chlorpyrifos	0.276	0.236	0.322	Y=1.987593+2.089705X	0.297
Diazinon	2.114	1.808	2.471	Y=2.244117+2.079653X	0.550
Phenthoate	1.849	1.577	2.168	Y=2.421213+2.035317X	0.869

For the doses of malathion, the offered LD_{50} was 0.823 µg/fly-1 for male and 0.909 µg/fly-1 for female with 95% confidence limits as 0.695 to 0.975 µg/fly-1 for male and 0.755 to 1.094 µg/fly-1 for female. The regression equation for male flies is

Y=3.257242+ 1.9031X and for female flies is Y=3.362447+1.70838X. With the ? 2 value of 0.749 for male and 0.041 for female houseflies at 3 degrees of freedom. No significant heterogeneity was found in male and female house flies.

In cases of chlorpyrifos, the offered LD_{50} was 0.249 µg/fly-1 for male and 0.276 µg/fly-1 for female with 95% confidence limits as 0.212 to 0.293 µg/fly-1 for male and 0.236 to 0.322 µg/fly-1 for female. The regression equation for male flies is Y=2.250086+1.968246X and for female flies is Y=1.987593+2.089705X. With the ? 2 value of 0.723 for male and 0.297 for female houseflies at 3 degrees of freedom. No significant heterogeneity was found in male and female house flies. It was found that chlorpyrifos was highly toxic to houseflies.

Furthermore, diazinon, the offered LD_{50} was 2.519 µg/fly-1 for male and 2.114 µg/fly-1 for female with 95% confidence limits as 2.129 to 2.979 µg/fly-1 for male and 1.808 to 2.471 µg/fly-1 for female. The regression equation for male flies is Y= 2.356537+ 1.886506X and for female flies is Y=2.244117+2.079653X. With the ? 2 value of 0.691 for male and 0.550 for female houseflies at 3 degrees of freedom. No significant heterogeneity was found in male and female house flies. It was found that diazinon was a less toxic insecticide to the housefly.

Lastly, for the doses of phenthoate the offered LD_{50} was 2.151 µg/fly-1 for male and 1.849 µg/fly-1 for female with 95% confidence limits as 1.841 to 2.513 µg/fly-1 for male and 1.577 to 2.168 µg/fly-1 for female. The regression equation for male flies is Y=2.208063+ 2.094941X and for female flies is Y=2.421213+ 2.035317X. With the ?2 value of 1.605 for male and 0.869 for female

houseflies at 3 degrees of freedom. No significant heterogeneity was found in male and female house flie.

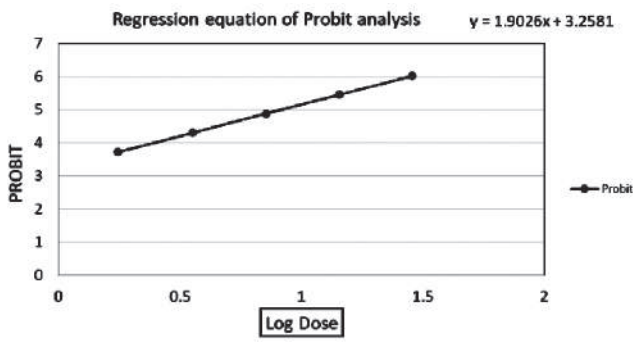

Figure : 1-Toxicity of Malathion treated on Male Housefly after 24 hours

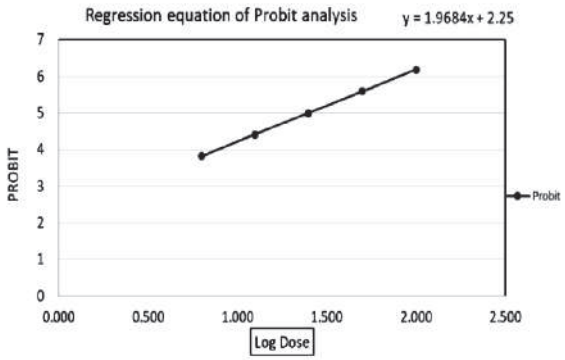

Figure : 2-Toxicity of Chlorpyrifos treated on Male Housefly after 24 hours

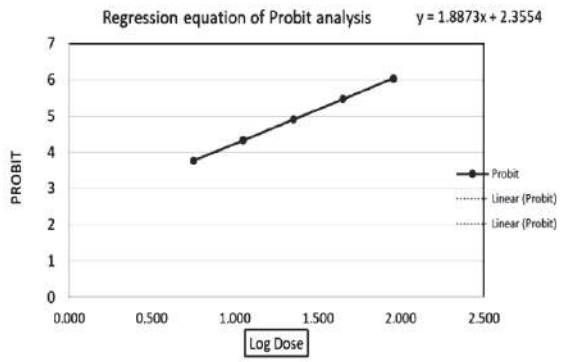

Figure : 3-Toxicity of Diazinon treated on Male Housefly after 24 hours

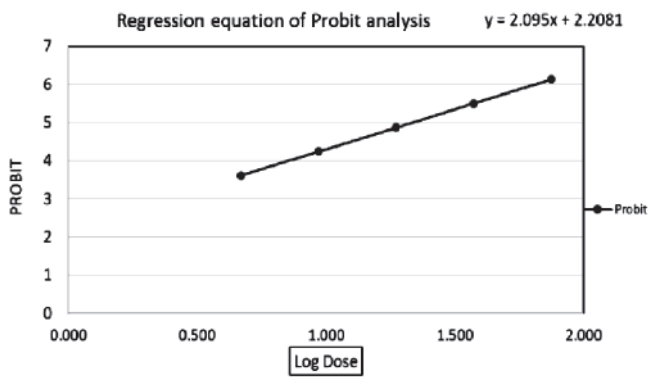

Figure : 4-Toxicity of Phenthoate treated on Male Housefly after 24 hours

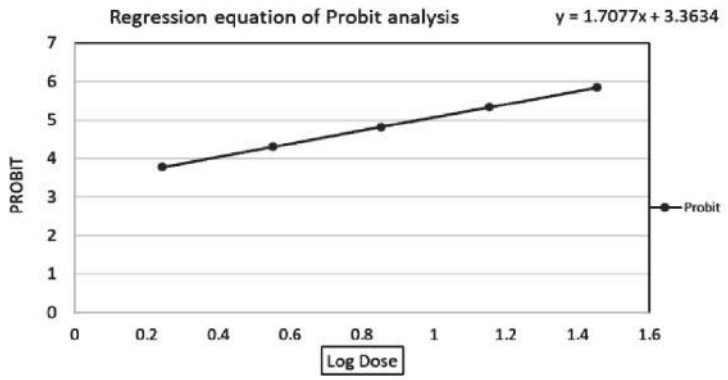

Figure : 5-Toxicity of Malathion treated on Female Housefly after 24 hours

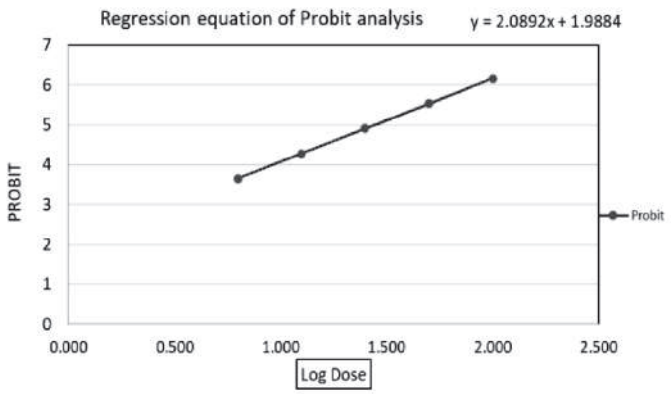

Figure : 6-Toxicity of Chlorpyrifos treated on Female Housefly after 24 hours

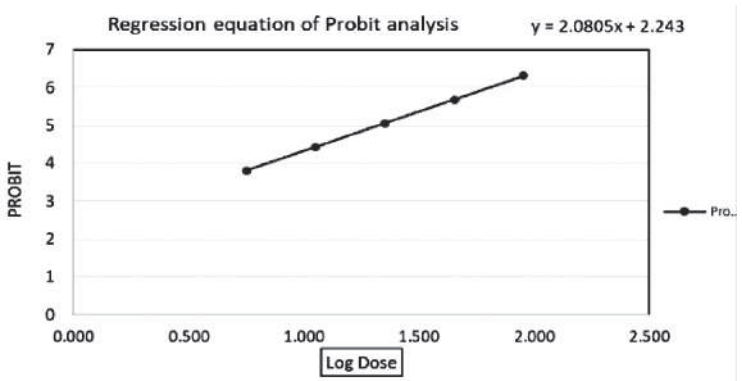

Figure : 7-Toxicity of Diazinon treated on Female Housefly after 24 hours

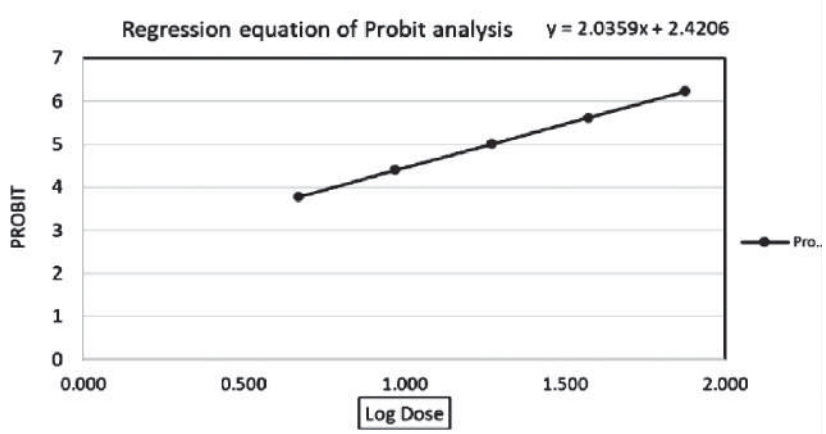

Figure : 7-Toxicity of Phenthoate treated on Female Housefly after 24 hours

Figure : 1-Graphical Presentation of Probit Analysis

4. Discussion

The common housefly has been extensively utilized as a test organism to screen candidate insecticides, chemosterilants and insect growth regulators by scientists in public or private research institutions, since the immature stadia can survive in various substrates, entomologists have normally used materials that are available locally (Spiller, 1964,1966; Louw, 1964; Sawicki, 1964; Keiding and Arevad, 1964; Schoof, 1964). Organophosphate insecticides are of great importance in this regard. In this investigation organophosphate insecticide; malathion, chlorpyrifos, diazinon and phenthoate was against adult housefly *Musca domestica*. The present investigation revealed that from organophosphate insecticides, chlorpyrifos was more active than other insecticides to control flies. According to the calculated topical LD_{50} values, chlorpyrifos was the most toxic (LD_{50} 0.249 µg/fly-1 and 0.276 µg/fly-1 for male and female respectively) while diazinon was the least toxic (LD_{50} 2.519 µg/fly-1 and 2.114 µg/fly-1 for male and female respectively).

The primary Parasympathomimetic effects of organophosphate insecticides, in both the pest organisms and in mammals, are attributes in part or entirely to phosphorylation of a serine residue to the active site of acetylcholinesterase (AChE), a critical enzyme in the nervous system. It was hypothesized by Johnson (1975) that organophosphate compound induced delayed neurotoxicity is attributable to a large degree of inhibition of an enzyme characterized as neurotoxic esterase (NTE) in nervous system, but not to inhibition of AChE.

Arrange of mechanisms have been implicated in resistance of houseflies (Devonshire, 1975; Oppenoorth, 1982; Scott et al., 2000) organophosphate compounds undergo various metabolic reactions in living organisms. Recent studies revealed that these enzymes show clear stereo selectivity in the metabolism of topically active organophosphate compounds (Ohkawa, 1982). In the present investigation four organophosphate insecticides showed different toxicity levels to adult housefly. Malathion is a non-systemic insecticide and acaricide of low mammalian toxicity. Metabolism is by hydrolysis of the carboxylate and phosphorodithioate esters or oxidation to the phosphorodithioate (sometimes known as malaxon); methods for their separation have been reported (Worthing and Walker, 1987).

The LD_{50} of malathion has been recorded in the present investigation as 0.825 and 0.909 µg/fly-1 for male and female flies, respectively. Nicholson and Sawicki (1982) recorded the LD_{50} of malathion as 0.27 µg/fly-1 on cooper stain and 30 µg/fly-1 on lapis stain of housefly after 24 hours of topical application. Acute oral LD_{50} of malathion for rats is 2800 mg/kg.

5. Conclusion

Present investigation reveals the influence of chemical insecticides on adult housefly toxicity (mortality) to find efficient ways to chemically control this pest. The goal was to search for insecticides to be used in the field that follow the best available profile; rapidly kills adults and decreases egg laying. The effectiveness of an insecticidal treatment is influenced not only by the toxicity of the insecticide but also by the primary response of the insect to its mode of application. The objectives when attempting to eradicate pest infestation is to obtain maximum pick up of toxicant by the pest and the chances of this are reduced when the dust or spray repels the pest. Each successful use of such a substance will decrease the need for toxic pesticides and will ultimately be of benefit to the environment, ecology and mankind.

References

1. Abbott, W.S. 1925, *A Method of Computing the Effectiveness of an Insecticide*, J. Econ. Ent.18: 265-267

2. Bailey, J.B. and Swift, J.E. 1968. *Pesticide Information and Safety Manual,* Division of

Agricultural Science, University of California, pp. 147

3. Busvine, J.R. 1971. *A Critical Review of the Techniques for Testing Insecticides*. Commonwealth Agricultural Bureau, London, pp. 345

4. Dent, D.R. 1995, *Integrated Pest Management*, Chapman and Hall, London

5. Devonshire, A. L.,1975, *Studies of the Acctylcholinesterase from Houseflies* (*Musca domestica L.*) *Resistant and Susceptible to Organophosphorous Insecticides,* Biochem. J.,149 : 463-469

6. Finney, D.J. 1971. *Probit Analysis :* 3rd Edn. Cambridge University Press, London, 333 pp.

7. Fotedar, R. 2001, *Vector Potential of Houseflies (Musca domestica) in the Transmission of*

Vibrio Cholerae in India. Acta Trop. 78 : 31-34

8. Grubel, P., Hoffman, J, S., Chong, F.K., Burstein, N.A., Mepani, C. and Cave,D.R., 1997, *Vector Potential of Houseflies (Musca domestica) for Heliobacter Pylori,* J. Clin. Microbiol. 35: 1300-1303

9. Johnson, M.K. 1975, *Organophosphorus Esters Causing Delayed Neurotoxic Effects; Mechanism of Action and Structure / Activity Studies,* Arch. Toxicol. 34: 259-288

10. Keiding, J. and Arevad, K. 1964, *Procedure and Equipment for Rearing a Large Number of Housefly Strains*, Bull. Wld Hlth. *Org.* 31: 527-528

11. Louw, B.K. 1964, *Physical Aspects of the Laboratory Maintenance of Muscoid Fly Colonies.* Bull. Wld Hlth. Org. 31: 529-533

12. Metcalf, R.L. 1968, *Methods of Estimating Effects.* pp. 17-29 in *"Research in Pesticides"*, C.O. Chichester, ed. Academic Press, New York

13. Morgan, P.B. and Patterson, R.S. 1978, *Culturing Microhymenopteran Pupal Parasitoids of Muscoid Flies* In "Facilities for Insect Research and Production". USDA Tech. Bull. 1576, pp. 86

14. Morgan, P.B., La Brecque, G.C. and Patterson, R.S. 1978, *Mass Culturing the Microhymenopteran Parasite, Spalangia Endius,* Walker. J. Med. Ent. 14: pp. 671-673

15. Morgan, P.B. 1980, *Mass Culturing Three Species of Microhymenopteran Pupal Parasites,* Spalangia Endius *Walker, Muscidifuroax Reptor,* Girault and Sanders and *Pachycrepoideus Vindemiae* (Rondani) (Hymenoptera, Pteromalidae) VIII, *Reunion Nacionalde Control Biologico*. Tecomon, Colima, Maxico. April 1980. pp. 22-25

16. Morgan, P.B. 1981. *Mass Production of Musca domestica L. In "Status of Biological Control of Filth Flies, Proceeding of a Workshop, February, 4-5, 1981". Insect Affecting Man and Animals Research Laboratory,* USDA, ARS, SR. Florida-Antilles Area and University of Florida, Gainesville, Florida, pp. 212

17. Nicholson, R.A. and Sawicki, R.M. 1982, *Genetic and Biochemical Studies of Resistance to Permethrin in a Pyrethroid-resistant Strain of a Housefly (Musca domestica)*, Pestic. Sci.13: 357-366

18. Ohkawa, H. 1982, *Stereoselectivity of Organophosphorus,* In *"Insecticide Mode of Action"*

(Ed. Coats, J.R.), Academic Press, New York, London, pp. 163-185

19. Olsen, A.R. and Hammack, T.S. 2000, *Isolation of Salmonella spp. from the Housefly, Musca domestica L. and the Dump Fly, Hydrotaea aenescens* (Wiedemann) (Diptera: Muscidae), at Caged-layer Houses, J. Food Prot. 63: 958-960

20. Oppenoorth, F.J. 1982. *Two Different Paraoxon Resistant Acctylcholinesterase Mutants in the Housefly,* Pesti. Biochem, Physicol, 18: 26-27

21. Sawicki, R.M. 1964, *Some General Gonsiderations of Housefly Rearing Techniques,* Bull.

Wld Hlth, Org. 31: 535-537

22. Schoof, H.F. 1964, *Laboratory culture of Musca, Fannia and Stomonys,* Bull. Wld Hlth.

Org. 31: 539-544

23. Scott, J.G., Alefantis, T.G., Kaufman, P.E. and Rutz, D.A. 2000, *Insecticide Resistance in Houseflies from Caged-layer Poultry Facilities,* Pest Management Science. 56 : 147-153

24. Smith, R.F. and Van den Bosch, R. 1967, *Integrated Control,* In *"Pest Control- Biological and Selected Chemical Methods"* (Eds. Kilgore, W.W. and Doutt, R.L.), Academic Press, London, pp. 295-340

25. Spiller, D. 1964, *Nutrition and Diet of Muscoid Flies,* Bull. Wld Hlth. Org. 31: 551-554

26. Spiller, D. 1966, *Houseflies,* In *"Insect Colonization and Mass Production"* (Eds. Carroll, N. and Smith, R.F.), Academic Press, New York, pp. 618

27. Sukontason, K., Bunchoo, M., Khantawa, B., Piangjai, S. and Choochote, W. 2000, *Musca domestica as a Mechanical Carrier of Bacteria in Chiang Mai*, North Thailand, J. Vector Ecol, 25: 114-117

28. Sulaiman, S., Othman, M.Z. and Aziz, A.H. 2000, *Isolations of Enteric Pathogens from Synanthropic Flies Trapped in Downtown Kuala Lumpur,* J. Vector Ecol. 25: 90-93

29. Tan, S.W., Yap, K.L. and Lee, H.L. 1997, *Mechanical Transport of Rota Virus by the Legs and Wings of Musca domestica,* (Diptera: Muscidae), J. Med. Entomol, 34: 527-531

30. Wilkins, R.M. and Khalequzzaman, M. 1993, *Envirnomental Interactions of Pesticides, Synergism of Permethrin by Simazine against the Housefly.* Proc. Brighton Crop Protect Conf. 3B-7: 157-162

31. Worthing, C.R. and Walker, S.B. 1987, *The Pesticide Manual.* British Crop Protection Council, London, pp. 1081

BL College Journal

ISSN 2664-228X
Volume -1, Issue-2, 2019
pp. 198-204

Violence against Women in the Name of Religion

Dr. Shirtaz Begam Laskar
Assistant Professor, Department of Philosophy
Janata College, Kabuganj, Cachar, Assam, India
e-mail : shirtaz02@gmail.com

Abstract

Violence against women is quite a common feature throughout the history of human civilization. Violation in its various forms is a violation of human rights, the very nature of which deprives women of their ability to enjoy fundamental rights. It is a serious obstacle of the development process of the status of women. Among the societies of different culture or religious origin, violation is found to prevail with various intensities. In Islamic society, violence against women in the name of religion is visibly possible in many aspects of women's life.

Keywords

Women, Violence, Beating, Killing, Mutilation

Introduction

Violence against women, which is a common feature of our today's world, is known to have had a long history. Down the ages women were subjected to violent practices and that too with different degrees of intensity and extent. With the slightest variations in kinds the societies of different cultural origin, even today, do exhibit the phenomenon in a considerable degree. Taking the existing scenario in to consideration it can be argued thus that subordination of women is a universal phenomenon. Behind the concept of or the act of violation against women workings of several cultural prejudices are visible. Of such, the fundamental one is the presumption that women are the weaker sex and hence should have the readiness for being used as objects of domination by the stronger kind, that is, men. Among the other prejudices, the most common are like that of the projected lack of rationality in women, their emotional bent of minds, sexual vulnerability, etc. Such cultural prejudices apart from causing severe damages to women's lives, possibly in every sphere, also have seriously impacted the process of knowledge formation. In almost every discipline of science

and humanities, the construction of sex or gender based theorizations has not remained merely a matter of convention only. While on the one hand, they have awfully delimited the very scope of the disciplines, on the other, the implications of the theoretic constructions have caused adoption of faulty public policies too, detrimental to the wellbeing of women in general.

The position of women in a society can be best assessed in terms of her entitlement, capability and achievements. What role does she play and is expected or compelled to play in the life of a man, in the family, and in the community life in general are indicative of both her actual status and limitations. The extent of participation of woman in the so-called private and the public spheres and the limits set on the actualization of her human potential would bring out not only the praxis of her existence but also throw light upon the nature and intensity of violence she is subjected to.

Violence against women in Islamic society is visible possibly in each and every respect of women's life. Following are some major varieties most prevalent at present. Apart from the violations of fundamental human and women rights, enforcement of direct violence to women is a common feature of the Islamic society. It starts with the family and extend up to the so-called public affairs at the community levels.

Objective

The present paper will attempt to explore some major varieties of violence most prevalent at present and will also try to find out whether these violations are sanctioned in the Holy Texts of Islam or not.

Data and Methodology

The present study is based on both primary and secondary data. The primary data consists of the textual reading of the Holy Quran and the Hadith and the secondary data consists of other books, journals, information procured through internet etc. related to the subject of the present study.

As the study is using references from the textual sources and their interpretational variations, so, apart from the descriptive-analytic method it will be required to make use of certain hermeneutical method too. The contrasted frames of references in interpretational variation will be analysed in terms of the hermeneutical frames of faith and suspicion both, with a slight variation from what exactly being devised by Paul Ricoeur.[1]

Domestic Violence : Wife Beating in Islam

The question, whether the Holy Quran has permitted domestic violence like wife beating etc., has been a controversial one. The verse in chapter 4 of the Holy Quran is often referred as providing the sanction for the domestic violence :

> (Husbands) are the protectors and maintainers (quawwamun) of their (wives) because Allah has given the one more (strength) than the other and because they support them from their means. Therefore the righteous women are devoutly obedient, and guard in (the husband's) absence what Allah would have them guard. As to those women on whose part ye fear disloyalty and ill-conduct, admonish them (first), (next) refuse to share their beds (and last) spank them (lightly); But if they return to obedience, seek not against them means (of annoyance) for Allah is the Most High, Great (above you all).[2]

The orthodox thinkers argue that through the above verse the Holy Quran permitted men's authority over women and also permitted to beating them. But the Islamic scholars and women right activists challenge the orthodox interpretation of the verse and they have interpreted the verse differently. There are some keywords in the verse- quawwam, qanita and daraba which are most controversial. As mentioned earlier, to some orthodox translators quawwam means the ruler or authority and understood in this way the Holy Quran has permitted men's authority over women. Modern Islamic thinkers and women right activists, however, have interpreted these words differently. According to them, the term simply means one who maintains or takes care of financial and other needs of family. Since women were not economically independent in early days, the Holy Quran made it obligatory on men to maintain women and take care of them. Now, if a woman maintain her husband and runs the household, she can also be called quawwam and if both the husband and wife earn and maintain the household together then both will be quawwam. So, it can be said that quawwam is only a functional term and not a term of superiority or authority as orthodox ulema generally interpret it.

Besides this, before interpreting any verse, it is very important to understand the context in which the verse was said to be revealed. According to the noted Quranic commentators Kasaf and Tarabi, the verse was revealed in the context when a woman complained to the Prophet Muhammad that her husband slapped her without any fault, what should she do now? The Prophet replied to go and retaliate. The woman was happy but it cast a gloom over the men. They came to the Prophet Muhammad and asked how could they exercise control if their wives are allowed to retaliate against them? Then the Prophet Muhammad replied that it was his opinion and he will wait for revelation from Allah. And this verse was revealed. So, the verse is purely contextual and it does not set any permanent norm of behaviour. Another controversial

word in this verse is idribuhunna which is generally translated as 'beat them'. As the word quawwam has different meanings, this word has also different meanings. The modernists and reformists have accepted it in the sense of 'separating' or 'removing'. In that case if a woman misbehaves then first persuade her, next leave her alone and last strike her off or separate from her. But if she changes her behaviour, go near her.

The Holy Quran repeatedly advice men to treat their wives kindly even at the time of separation and it is expressed in the verse 2:229 (even when retaining her or divorcing her, treat her kindly). The Quran also says that believing women and believing men are mutual friends and they enforce what is good and prevent what is evil (9:71).

Honour Killing

Another form of control over women which is closely bound to the issues of male honour is the practice of honour killing. Killing of women in the name of honour takes place in Islamic states all over the world. In some parts of the country, these are practices legitimized by custom and tradition, but the concept of honour has also been used for an ulterior purpose and is increasingly being extended to situations far beyond its original scope under local custom and tradition. The traditional concept of honour killing is rooted in the perception of women being the property of male members of the family. It is, thus, their 'honour' which is affected if women violate cultural codes or social norms by entering in to an illicit relationship. Whether a woman is actually guilty of the charge is often considered irrelevant, since it is the public perception of the guilt which affect the honour of the family. "The mere allegation of girls and women having entered illicit sexual relationship usually suffices for their male relatives to take the law in to their own hands and to kill them. The women are usually not given an opportunity to respond to such allegations. An allegation is enough to defile a man's honour, and therefore enough to kill a woman".[3] In most cases, the decision to kill the women is made by the family, and in some cases by the family's tribal council because according to the cultural heritage in general and tribal mode of acculturation in particular, the blame is always laid on the women concerned and the legal authority with its thousands lots of opaqueness defines such matters as internal family disputes.

The incident of honour killing is indicators of the denial of the basic right to life to women. Where some practices receive support from cultural attitudes, acts of violence and causing women's death have also not been appropriately dealt with by the courts. The court does not give any severe punishment to the offender and in many cases it allows the perpetrator to go free or with little consequence.

Adultery & Rape

In Islam, rape is punishable by death. It is recognised as a criminal offence in Shariah Law. However, spousal rape is not included within the definition of rape. In fact, in Quran we get no equivalent word for rape. But in Sunan Abu Dawud, Book 38,Number 4366 a conversation is narrated where the Prophet Muhammad was asked to respond to a woman's query regarding the matter of her being raped by a man. In response the Prophet said to the woman "Go away, for Allah has forgiven you. And about the man who had intercourse with her, he said: stone him to death." The implication of the same is this that a woman victim of rape is not guilty whereas the punishment for the rapist is death. However, in most of the Islamic countries there is no separate law for rape. On the contrary, rape and adultery are too often confused with each other and a woman who is a rape victim is made to suffer the penalty of adultery.

It is mentioned in the Quran that both men and women are equally rewarded for the good deeds and equally punishable for evil acts but according to the Hudood Ordinance (1979) of Pakistan if a woman files a rape case then four male eyewitnesses are required to prove it. But it is very difficult on the part of a woman to prove an allegation of rape, and her failing to adduce evidences may place her at risk of prosecution under another Hudood ordinance, qazf for blaming an innocent man of adultery.

As legal scholar Martin Lau points out.

> While it was easy to file a case against a woman accusing her of adultery, the Zina ordinance made it very difficult for a woman to obtain bail pending trial. Worse, in actual practice, the vast majority of accused women were found guilty by the trial court only to be acquitted on appeal to the Federal Shariah Court. By then they had spent many years in the jail, were ostracized by their families, and had become social outcasts.[4]

Female Genital Mutilation

Female Genital Mutilation is one of the severest crimes which have paved the way for dehumanizing the body and mind of the female half of the various Islamic nations. However, this practice of Female Genital Mutilation often termed as 'modification' or 'cutting', is supposed not to originate with Islam because it was practically unknown to the Islamic source lands and there is no mention or sanction of either female or male circumcision in the Quran. The starting of first female genital mutilation was associated with the name of Sarah and Hagar. According Ibn Kathir[5] a fourteenth-Century historian and a Quranic commentator, Sarah was the wife of the common

progenitor of the Semitic monotheist Abraham. In the traditional literature, it is mentioned that Abraham is the person who made the source of both male circumcision and female genital mutilation. As ill luck, Sarah could not bear children and with her permission Abraham had a child named Ismael with Sarah's hand-maiden Hagar. But after the birth of Ismael, Hagar grew haughty with Sarah and out of jealousy Sarah vowed to cut "three limbs" of Hagar and consequently Abraham ordered Hagar to pierce her ears and circumcise herself.[6] In the traditional literature it was recorded as an extra Quranic evidence. Thus the female circumcision is simply identified as having originated with Hagar. Again some traditions suggest that only a little of the clitoris be cut in order to allow the women to experience pleasure.

Entire Islamic world has been divided into two halves as to the legality of the practice of mutilation. According to some Islamic thinkers, this practice is illegal and there is no basis for this practice in Islam. On the other hand, according to some other Islamic thinkers, this female circumcision is a part of the legal body of Islam and this is surely a laudable practice that does honour to the women.[7] Many Islamic jurists believe that the female circumcision is an Islamic tradition mentioned in the tradition of the Prophet and it is sanctioned by the Ulemas (religious leaders) and jurists in spite of their differences on the issue of whether it is a duty of sunna or not. All of them support the practice and sanction it in view of its effect on attenuating the sexual desire of women and directing it to the desirable moderation. However, all Muslims don't practice this surgical procedure and this practice is mainly confined to the communities of African regions regardless of faith. This practice prevails in the human societies till now and the reason behind it is that the importance of honour in patrilineal societies is given as a reason, for it is thought that female genital modification reduces female libido and the consequent sexual discomfort dissuades women from seeking extra-marital partners and thus the patriarchal system by the enforcement of this process wants to ensure both the paternity of children and to control women's sexual behaviour.

Conclusion

From the above discussion we get a very gloomy picture of the status of women in the Islamic society. We have seen that there is nothing in the text which provide a base for the continuation of the violent practices against women. In the present context, it is pertinent to ask: In the given context it is pertinent to ask: if the true spirit of the textual source of Islam did not permit any discrimination between men and women at all, how then the discriminatory practices got so easily legitimized and sustained, and that too, in the name of Islam as religion? The entire issue calls for an intensive study of the textual sources on the one hand and reflection on the kinds of the deviation

from the prescribed norms on the other. What is of extreme importance now is to identify and examine the passages of the scriptures that have been frequently referred and used as justifications for the male superiority thesis. The question of rereading or reinterpretation of the texts, as demanded by the liberal thinkers and the Islamic feminists with or without religious orientations has to be reasonably dealt with for the purpose. Sufficient amount of clarity is required to be developed also on the very nature of ethical and religious beliefs of Islam vis-a-vis the construed domains of cultural prejudices grounded on sex/gender lines.

References

1. Ricouer, Paul(1970), *Freud and Philosophy: An Essay on Interpretation,* Trans. D.Savage, New Haven, Ct: Yale University Press
2. Ali, A. Y. (trans.) (2004), *The Meaning of The Holy Quran, verse 3:34,* pp. 195-196
3. *Violence Against Women in the Name of Honour,* Amnesty International, September, 1999, pp. 6
4. Lau, Martin(20070 *Twenty five Years of Hudood Ordinance* in Washington and Lee Law Review 64(4) 1292, Retreived 18 Nov 2014, pp. 1296
5. Kassam Zyan (2007) *Islamic Ethics and Gender Issues* in Ethics in the World Religion, Joseph Runzo and Nancy M. Martin (eds.) , Oxford, One World, pp. 120
6. Stoeasser, B.F. (1994) Women in the Quran : *Traditions and Interpretations,* New York, Oxford University Press, pp. 47
7. Kassamali, N. J. (1998) *When Modernity Confronts Traditional Practices: Female Genital Cutting in Northeast Africa in Women in Muslim Societies* : Diversity Within Unity, ed. Herbert L. Bodman and Nayereh Tohidi, Boulder, Lynne Rienner, pp. 43

BL College Journal

ISSN 2664-228X
Volume -1, Issue-2, 2019
pp. 205-214

Mental Health Status in Relation to Perception of Crowding in Dhaka City

Dr. Abu Syed Md. Azizul Islam
Associate Professor & Head, Department of Psychology
Government Brajalal College, Khulna, Bangladesh
e-mail : syedazizulpsy@gmail.com

Professor Dr. Kazi Saifuddin
Dean, Faculty of Life and Earth Sciences
Jagannath University, Dhaka, Bangladesh
e-mail : kazisaifuddin@yahoo.com

Abstract

The main purposes of the present study are twofold: i. investigating the relationship between mental health and perception of crowding; ii. and finding the effects of perceived crowding on mental health. The data was collected from 140 persons were purposively selected from different areas of Dhaka city. Those who are capable of perceiving their environment accurately. The instruments used in this study were personal information questionnaire, Bangla version of the General Health Questionnaire (GHQ-12) of Goldberg (1972). Crowding Perception Measuring Scale (CPMS) of (vasky&shelby2008) was adapted in Bengali by the present researchers. The result showed that there is a significant correlation between Mental health and perception of crowding, and there are negative effects of crowding (in a room, residential work place, streets, transportation) on mental health.

Keywords

Mental Health, Perception, Crowding, Perception of Crowding

Introduction

Psychology is the scientific study of behaviour and mental processes. To understand human behaviour systematically or scientifically psychologists have conducted many researches or studies in the different fields of psychology. There are many sub-fields of psychology of which environmental psychology is one of the most important

branches of psychology that focuses on the relationship between people's behaviour and physical environment. By conducting many researches, environmental psychologists have found the effects of physical environment on human being's behaviour. They explained that some elements (crowding, population density, polluted environment, etc.) of environment have a negative effect on physical and mental health. Due to unhealthy and unhygienic environment persons cannot cope with their family and work environment properly, they cannot work productively and fruitfully and so on. As a result, they face different types of mental health problems. Considering the importance of the above discussion the present investigator would like to conduct this type of study to investigate the relationship between physical environment and mental health of the inhabitants of Dhaka city.

Mental health is a state of emotional and psychological well-being in which an individual is able to use his or her cognitive and emotional capabilities, function in society, and meet the ordinary demands of everyday life. Mental health refers to how a person thinks, feels and acts when faced with a life situation. It is how people look at themselves, their lives and other people in their lives; evaluate the challenges and problems; and explore choices. This includes handling stress, relating to other people and making decisions. It also implies a large degree of adjustment to the social environment. Mental health has the capacity to think rationally and logically, and to cope with the transitions, stresses, traumas, and losses that occur in all lives, in ways that allow emotional stability and growth. In general, mentally healthy individuals value themselves, perceive reality as it is, accept its limitations and possibilities, respond to its challenges, carry out their responsibilities, establish and maintain a close relationship, deal responsibly with others, pursue work that suits their talent and training, and feel a sense of fulfilment that makes the efforts of daily living worthwhile.

Crowding is a subjective evaluation of a density condition. Crowding is psychological phenomena but density is physical phenomena of population distribution.

Crowding is the one potential source of stress. Environmental psychologists distinguish between the physical measurement of density and the psychological feeling of crowding. Density is defined as the physical area available to the given number of individuals present, while crowding is the psychological feeling of not having enough space available. Paulus (1980) concluded that while high density (numerous individuals per unit of space) is usually necessary for crowding, it does not

always produce the negative feeling of crowding. Crowding is a psychological phenomenon. Most people think of crowding as a negative situation. Crowding is a subjective evaluation of a density condition, including its appropriateness in time or place (Stanky, et al., 1976). Perception of crowding as the individual weighing of the number of people seen or encountered compared to what was expected or desired (Dawson & Watson, 2000). According to Vaske and others 2008 the elements of crowding are generally used as a type of crowding these are In-room crowding, Residential crowding, Work-Place crowding, Street crowding, Transportation crowding.

Perception is a process by which as an organism becomes aware of the Concern stimulus from the environment. Perception is the power, act or state of receiving knowledge of external things by impressions on the senses, cognition, discernment, conception.

Perception of crowding is the ability to understand or to feel about the crowding environment sensitively. And crowding is an essential bottleneck, setting limits on objects perception, eye and hand movement, visual search, reading and perhaps other functions of in peripheral, amblyopic and developing vision. Crowding impairs not only discrimination of object features and contours but also the ability to recognize and respond appropriately to objects in a clutter. Studying crowding might lead to a better understanding about the human beings mental health accurately. Reactions to crowding are conditioned by cultural context and by an individual's subjective experience of crowding (Gove et al. 1979). Even within a given culture, individual reaction will vary depending on age, gender, ethnicity, the composition of the household, a person's hierarchical position in the dwelling unit and life-cycle stage (Edwards et al. 1994). The debate about cultural preferences for and tolerance of different levels of crowding is referred to in the discussion of crowding and mental health. The findings challenge the assumption that members of particular ethnic or cultural groups will respond to household density in a particular way.

Review of the Related Literature

Mitchell (1976) describes a number of spatial measures used by researchers as indicators of crowding. De Lauwe (1959) in Mitchell (1976), for example, suggested two critical density thresholds. One, based on objective observations of children, was for 90 sq ft per person. Madge (1968) in Mitchell (1976) refers to 170 sq ft per person as the lower limit for mental health. The American Public Health Association set the

desirable standard at twice this figure in 1950. Healthy housing is not just concerned with the sanitary and hygienic design of the shelter but with the whole health spectrum of physical health, mental health and social well-being both within the dwelling and the residential environment. (WHO strategy, in Ranson 1991).

One of the most widely quoted studies is that of Gove, Hughes and Galle (1979 in Chicago. This large cross-sectional study revealed a strong relationship between crowding (persons per room) and poor mental health. The authors developed a series of scales to measure mental health, social relations in the home, physical health and care of children. (They subsequently became engaged in a debate with Booth et al. (1980) on the validity of their conceptualizations, but defended their usefulness.) A factor analysis led Gove et al. to conclude that :

Crowding results in physical withdrawal, psychological withdrawal, a lack of general planning behaviour and a general feeling of being "washed out".

The experience of crowding is strongly related to poor mental health and to poor social relationships in the home.

The experience of crowding is strongly associated with a number of characteristics of a poor child care, although it is only moderately associated with poor interaction between parent and child.

Rationale of the Study

Good mental health is crucial to living a long and healthy life. Good mental can enhance one's life, while poor mental health can prevent someone from living an enriching life. But mental health may be affected by many factors (such as population density, traffic jam, temperature, noise, etc.) of our environment that should be studied extensively. Thus, the study will bear important feature understanding the human behavior in terms of crowding environment.

Hypothesis of the Study

The hypothesis of the present study are :

i. There is a Significant relationship between Mental health and perception of crowding;

ii. Positivity of the perception of crowding correlates the better Status of Mental health;

iii. Negativity of the perception of crowding correlates the degradation of Mental health;

Method

Sample and Sampling Technique

A cross-sectional survey design was followed for conducting the present study. A total number 140 (80 male and 60 female) people will be selected purposively from the different areas of Dhaka city. Their age range will be 20 to 60 years. Their educational qualification will be HSC to post Graduate degree. All the respondents will be chosen from normal population e.g. those who are capable to perceive their environment accurately.

Measuring Instruments

Demographic and Personal Characteristics Questionnaire

By this questionnaire, the data on age, sex and education level were collected.

The General Health Questionnaire (GHQ-12)

This scale was originally developed by Goldberg (1972) in 1981 to measure mental health of respondents. This 12 item scale contains 6 positive and 6 negative items. Responses were given weights of 0, 1, 2 and 3. The items were answered on a four-point response format ("not at all", "somewhat" "to a considerable extent" and "to a great extent"). Positive items were scored in 4 points, from 3 to 0 and the negative in the reverse order form 0 to 3.Total scores are the sum of all the items, with a range of 0 to 36. High score in the scale indicates the high mental health problems. The reliability of the Bangla version of the GHQ-12 (Sarker and Rahman 1989) was measured by parallel form a method which was found to be quite satisfactory (r=0.69)

Crowding Perception Measuring Scale (CPMS)

The scale consists of 15 items measuring the crowding perception of the adult people who able to perceived their environment accurately, using 4 point likcrt type of scale. The four responses in this scale are not at all crowded, slightly crowded, Moderately crowded and extremely crowded. The scores for the response categories range from 0 to 3. The not at all crowded = 0, slightly crowded = 1, Moderately crowded = 2 and extremely crowded = 3. The minimum and maximum possible score on this scale are 0-45 respectively Higher scores indicate high perception of crowding and lower scores point out less perception of crowding. cronbach alpha was computed to determine the

internal consistency reliability. The cronbach alpha was forund ·86, This value is highly significant with an alpha level of ·05. The scale was adapted in Bangali by the present researchers.

Procedure

Data of the present study were collected individually. Necessary level of rapport was established before administrating the questionnaire. The participants were ensured that this answer will be completely anonymous as well confidential and will be used only for research purpose. The participants are requested to fill up the personal information sheet carefully. Then they are told to leave the first page and please try to give the following questions answer. They were instructed to complete their task according to the instruction. They were asking to give tick (√) mark in the appropriate box. Then the answer sheets were collected from then. In this way data were collected.

Results

In order to analyze the data Mean, Standard Deviation, Co-relation and stepwise multiple regression analysis were applied on the obtained score. The obtained results are presented in table 1 through 5.

Table 1 Mean and Standard deviation of Mental health and Elements of crowding perception

Variable	Mean	SD
Mental health	20.42	2.14
Transportation	6.42	.56
Street	6.38	.59
Work place	6.26	.78
Residential	6.16	.84
In room	6.04	.98

Table 1 Presents Mean and SD of dependent and independent variable. The Mean and Standard deviation are, 20.42, 6.42, 6.38, 6.26, 6.16, 6.04 and 2.14, .56, .59, .78, .84, .92, respectively.

Table 2 : Correlation matrix among of study variables.

Variable	1	2	3	4	5	6
Mental health	-	-	-	-	-	-
Transportation	.64	-	-	-	-	-
Street	.62	.56	-	-	-	-
Work place	.58	.54	.46	-	-	-
Residential	.51	.52	.51	.48	-	-
In room	.48	.50	.48	.62	.48	-

Dependent Variable Mental health

Table 3

Stepwise Multiple Regression co-efficient of elements of crowding perception on Mental health.

Independent Variable	Standardized Bata (ß)	t	Significance
Constant	_	3.22	.005
Transportation crowding	.401	8.41	.005
Street crowding	.388	7.62	.005
Work place crowding	.298	6.20	.005
Residential crowding	.162	5.41	.005
In room crowding	.142	3.42	.005

Table 3, Show the partial standardized betas (ß s) indicated that five elements of perception of crowding in the model were predictor of mental health. These elements were in room crowding ß=.142, p<.005, Residential crowding ß =.162, p<.005, work-place ß =.298, p<.005, street crowding ß =.388, p<.005 and Transportation crowding ß =.401, p<.005.

Table 4

Selected Statistics from Regression of elements of crowding on mental health.

Independent Variable	R	R^2	R^2 Chang	Significance
Transportation	.681	.463	.463	.001
Street	.723	.555	.092	.001
Work place	.780	.642	.087	.001
Residential	.837	.701	.059	.001
In-room	.847	.717	.016	.001

Result of regression analysis indicated that strongest predictor of mental health was transportation, which alone explained 46.3% of variance. The result of the analysis further indicates that street was the second important predictor of mental health. R^2 change indicated that 9.2% of variance in mental health was accounted for street, 8.7% of variance in mental health was accounted for by the work place, .06% of variance in mental health was accounted for by the residential, .02% of variance in mental health was accounted for by in the room.

R^2 indicated that these five elements of crowding account for 71.7% of variance in mental health.

Table 5
The Over-all F-Test for regression of perception of crowding on mental health

SV	SS	df	MS	F	Significance
Regression	2138.40	5	427.68	193.52	.005
Residual	296.14	134	2.21		
Total	2434.54	139			

The significant of F-test (F=193.52 df =5,134, P<.005) indicate that variation in the mental health was accounted by joint linear influences of the elements (transport, street, work place, resident and in the room) of crowding.

Discussion

Crowding issue is one of a prime concern of present day environmental debate. Although many steps have been taken to eliminate crowding specially in many city area, but it has never been studied seriously from a psychological view point. Thus the present researcher tried to probe into the matter from a psychological perspective. The main purpose of the study was to understand the different types of crowding situation on the psychological point of view and to investigate effects of perceived crowding on the status of mental health. The area of research is the metropolitan area of Dhaka city. Also the objective of the present study was to explore the relationship between mental health status and the psychology of crowding for those people who lives in such a city entitled in the meantime as overcrowded.

The aimed of the present study was to investigate qualitative and quantitatively both the relation between mental health and the perception towards crowding.

The perception of crowding and mental health of the participants was measured by administering crowding perception measurement scale (CPMS) and General Health Questionnaire (GHQ-12). The plan of analysis were also designed to investigate the score of mental health and the five elements (In room, Residential, Workplace, Street and Transportation) of crowding by descriptive statistical method, correlation method and regression analysis method using SPSS-23 versions.

The hypothesis were formulated on the basis of the purpose of the study. The main hypothesis of the study was there is a significant positive correlation between mental health and perception of crowding and the higher level of perception of crowding degrades the status of mental health. In room, Residential, Workplace, Street and Transportation crowding sequentially higher responsible for the degradation of the status of mental health.

A cross- sectional survey design were used and data were collected at a single point in time. The sample consisted 140 (80 male and 60 female) the sample are selected purposively, chosen from the normal population, who are capable to perceived their environment accurately.

The prime objective of the present study was to investigate the relationship between mental health status and the perception of crowding of the people lives in Dhaka city. Result presented in Table 2 indicate that there is a significant positive correlation between mental health and the elements of crowding (Transport, street, workplace, resident, in the room).

The direct effect of each independent variable on mental health is estimated by the partial standardized regression Co-efficient (ß) with all other independent variable in the equation Table-3. Partial standardized regression co-efficient tell us how much of a change we would make in the dependent variable (mental health) by making a one unit change in the independent variable(transport, street, workplace, resident, in the room) while keeping all other variable constant. The partial standardized ß indicates that five elements of perception of crowding in the model were predictor of mental health (Table 3).

Conclusion

Overall findings of the study are suggestive of the fact that, Perception of crowding is the ability to understand or to feel about the crowding environment sensitively, on the other hand mental health is a state of emotional and psychological well-bang. The gross study was conducted where five types of crowding perception (In room, Residential, Workplace, Street and Transportation) were tested its effects on the status of mental health of the inhabitant of Dhaka city. Result showed, in short, the overall perceived crowding effects to degrade status of mental health. By the conclusion of this study a new field of applied knowledge is proposed here to be explored entitled "Environmental Mental Health".

References

Allport, G. (1935), "Attitudes," in *A Handbook of Social Psychology*, ed. C. Murchison. Worcester, MA: Clark University Press, 789-844

Clark, W., Deurloo, M., and Dieleman, F. (2000), 'Housing Consumption and Residential Crowding in U.S. Housing Markets'. *Journal of Urban Affairs,* 22, 49-63

Cook, T. D. and Campbell, D. T. (1979), *Quasi-experimentation: Design and Analysis Issues for Field Settings*, Chicago: Rand McNally

Gabe, J., and Williams, P. (1993), *Women, Crowding and Mental Health, Unhealthy Housing: Research, Remedies and Reform,* R. Burridge and D. Ormandy, (eds.) E and FN Spon, London

Gordon, M. (1964), *Assimilation in American Life: The Role of Race, Religion and National Origins.* Oxford: Oxford University Press.

Gove, W. R., Hughes, M., and Galle, O. R. (1979), *Overcrowding in the Home: An Empirical Investigation of Its Possible Pathological Ponsequences,* American Sociological Review, 44, 59-80

Goldberg, D. P. (1972), *The Detection of Psychiatric Illness by Questionnaire: A Technique for the Identification and Assessment of Non-psychiatric Psychiatric Illness.* London, New York: Oxford University Press, London

Guilford, J. P. (1954), *Psychometric Methods,* McGraw-Hill, New York Google Scholar

Likert, R. (1932), *A Technique for the Measurement of Attitudes,* Archives of Psychology, 140, 1-55.

Mitchell, R. B. (1976), *Cultural and Health Influences on Building, Housing and Community Standards: cost Implications for the Human Habitat,* Human Ecology, 4(4)

Paul, B., and Paulus, L. E. (1980), *Associates,* PSYCHOLOGY, 494

Saifuddin, K. (2012), *Environmental Planning Psychology.* The Sky Publishers, Banglabazar, Dhaka

Sarker, N.R., & Rahman, A. (1989), *Occupational Stress and Mental Health of Working Environment,* UFG, Dhaka

SPSS (Statistical Package for Social Sciences), 23 versions, IBM in 2009

Stokols, D. (1976), *The Experience of Crowding in Primary and Secondary Environmental Behavior,* 8, 49-86

Vaske, J.J and Shelby; L B (2008), *Crowding as a Descriptive Indicator and an Evaluative Standard,* Journal of Leisure Sciences, 30 (2), pp. 111-126

Vaske, J.J, Donnelly; MP and Heberlein, A.T (2008) *Perception of crowding and resource quality by early and more recent visitors,* Journal of Leisure Sciences 3 (4) pp. 367-381

Wikipedia the verge, 2015, *Digital Media Use and Mental Health*

World Health Organization (1987), *Housing : The Implications for Health,* World Health Organization, Geneva

BL College Journal

ISSN 2664-228X
Volume -1, Issue-2, 2019
pp. 215-221

Scenario of Migration in Federal State Nepal : An Anthropological Discourse

Dilli R. Prasai
Associate Professor, Department of Anthropology
Tribhuvan University, Nepal
e-mail : dilliprasai@yahoo.com

Abstract

Nepal is a land link country where industrial growth is limited making land the most important economic asset. During the period of colonization, land in Nepal was more abundant and people could obtain large amounts of land and all Nepalese people engage the agriculture sector. In recent years, there has been a challenging pattern of migration in Nepal from the hill and mountain regions to the Madesh (Tarai). The Madesh is a fertile agricultural area along the southern border of Nepal. The 2011 national census indicated a pronounced shift from a mountain-rural to a plain-urban and a plain-urban to overseas-abroad due to this every Nepalese household loosed their young and educated member from the family, only female, old people, children and physically weak person have been staying their household. The migrants hope to make a better life for themselves by moving to agricultural hub of the country. However, these migrants are having difficulty finding betterment of their life. the latest people's movement (2002/2003) had a dramatic impact on economic development as well as social and political structures in Nepal leading to, among others, changing migration patterns. While migration within Nepal and from Nepal to India have been practiced for decades, migrant destinations such as the Middle East, Southeast Asia, Europe, North America, and Australia have attracted an increasing number of young Nepalese in search of better livelihoods. The issue of mobile populations, both within the country and across national boundaries poses particular challenges to the ongoing state restructuring process.

Keywords

Land link , Colonization, Overseas , Coherence, Federal

Introduction

Nepal is a land-linked country between two giant neighbors, India and China. With an area of 147,181 sq km, Nepal is home to 26.6 million inhabitants representing over 120 ethnic groups and 100 languages. The share of female population is 51% and 48% of the people are children and youth under 18 years The density of population is 181/sq km and an average family size is 4.7. Around 83% of the population live in rural areas and the remaining 17% reside in urban areas. In addition, some two million Nepalese have migrated to live outside the country mostly as labour migrants and some are NRN. Nepal is divided into seven federal state and 77 Districts Coordination Committee including 6 metropolitan cities, 11 sub-metropolitan cities, 276 municipalities and 460 rural municipalities (MFAGA, 2018). Migration has become an integral part of the current global economy. Both internal and international migration can have major development and poverty implications for individuals and their families, for origin and destination areas, as well as for national economies. The aim of this paper is to review existing literature, and find out evidence on linkages between migration and Population in Nepalese context. Recently, evidence has emerged on the linkages between migration and Population at national levels. Migration itself is not a new phenomenon in Nepal and even in recent years, there has been only but a modest increase in the absolute number of migrants. What is new is that there has been a significant diversification in terms of destinations of these migrants. Until the early 2000s migrants predominantly crossed to India in search of seasonal agricultural work as well as other jobs. In the mid-1990s, the wave of economic as well as political liberalization led to removal of restrictions on obtaining passports and visas that were required to seek work in international destinations outside India. Concurrently, the Government of Nepal entered into a series of labor agreements with fast-growing countries in East Asia (Malaysia, South Korea) and the Gulf region (Saudi Arabia, UAE, Qatar) resulting in a large outflow of unskilled, predominantly rural, working age males to these destinations. Since the contracted wages in these countries are much higher in comparison to local wages and wages that could be expected in a variety of jobs in India, the transfers that these workers were able to remit back to their villages have been unprecedented. In the following sub-section we discuss the history of migration in Nepal and display document how the composition of migrants as well as the destinations has changed in recent years in a greater detail.

Objective

The main objective of this paper is to show the socio-economic scenario of migration in reality and to see the general attitudes pattern of the people towards this population

mobility. Besides these, the specific objectives of this paper are listed as below :

- To study the socio-economic impact of both internal and external migration
- To discuss the motivational and contusive factors of attraction towards the migrants in Nepal.

Methodology

An exploratory cum-descriptive as well as analytical research design had been applied to analyse and interpret the quantitative data collected from the available literature. But this research design has focused on quantitative aspect rather than qualitative. Both descriptive and analytical research design have been based on archive as well as secondary sources of data.

Nature and Sources of Data

Relatively qualitative types of data have been used in this paper. Similarly, mainly secondary data have been used and most of the findings uses for this paper are secondary in nature to make more effective and authentic. Secondary data have been collected from the previous literature using the tools/techniques such as different publications, periodicals, CBS report Nepal, books, journals and research papers.

Reliability and Validity of Data

Researcher has used the accurate data by the sources of CBS Records, government's records, NGO/INGO records and other related sources. During the study, several data collection methods and cross checking procedures to enhance the reliability and validity of the data and analysis, I have written about the research process in this paper. Likewise, I have convinced the concerned authority that the purpose of this short-research is for academic publication. Similarly, I have maintained their individual, social as well as organizational privacy rigorously and original field notes and other documents have been stored in a safe place where the access of public is almost impossible. So, this study has maintained the ethical guideline of the research and I do hope that the present paper is reliable, credible and plausible.

Pattern of Migration in Nepal

Nepal's history of international labor migration goes back at least 200 years. The earliest Nepali migrants were mercenaries in the army of the Sikh ruler Ranjit Singh in Lahore in modern day Pakistan. It is perhaps from here that the colloquial Nepali term for migrants, "lahure" is derived. After having established their reputation as fierce warriors in various regional wars at the time, including the Anglo-Nepal war of

1814-1816, Nepali soldiers became willing recruits to the British Army. After India independence, the Gurkha regiments of the British army were preserved although a significant number of erstwhile Gurkhas joined the Indian army. From this day an estimated 50,000 Nepalis work in these two armies alone. (Seddon, Adhikari, and Gurung, 2002) In addition, a significant number of Nepalis were drawn to the tea plantations, construction, coal mining and land reclamation in the Indian states of Assam, Bengal, Darjeeling, Kumaon and Garhwal in the late 1800s (Thieme and Wyss, 2005). While a majority of these early migrants settled in these areas permanently, a lot of the newer migrants started to move to industrialized areas such as Delhi, Mumbai and Bangalore where employment was easier to find in the growing service sectors. Temporary migration across the open border to India in search of seasonal employment in agriculture in the bordering states of Uttar Pradesh, Bihar and Punjab has also been a fairly common phenomenon over the years. The advent of democracy in 1990 and the subsequent liberalization of the economy throughout the 1990s opened up newer destinations for Nepali migrants. Obtaining travel documents and passports became easier and together with the reduced costs of acquiring information, international destinations that were either previously unknown or inaccessible to those outside the migration networks became feasible options. Toward the mid-1990s, the Government of Nepal made provisions by which Nepali workers could be recruited directly through procedures involving the Ministry of Labor and registered Kathmandu-based manpower agencies acting on behalf of recruiters in countries like Saudi Arabia, Qatar, UAE, Bahrain, Oman, Kuwait, Iraq, Malaysia, Brunei and South Korea (Seddon, Adhikari, and Gurung, 2002). As a result of this "liberalization of international migration", the share of international migrants opting for these newer destinations increased dramatically between census years 1991 and 2001. Although there was a modest increase in the number of absentees between 1991 and 2001, migrants per 1000 people actually declined from 35 to 32 between 1991 and 2001. In terms of the composition however, whereas 90 percent of those absent from home were in India in 1991, the share had dropped to 75 percent in 2001. During this period, the fraction of migrants that were in the Middle East increased from 1 to 12 percent and the fraction of migrants that were in East Asian countries went up from roughly 2 to 4 percent. Historically, the primary reason for migration out of Nepal has been inadequate round the year employment within the villages. This is also reflected in the stated reasons for migration in recent censuses. In 2001, 65 percent of the population absent from home were away seeking employment. This number had increased to 78 percent in 2011. Given the cultural practice of patrilocal exogamy, it is not surprising that dependency after marriage is the second largest self-reported

reason for migration. While 95 percent of all international migrants seeking work were in India in 2001, the number had declined to 75 percent in 2011. In contrast, the Middle East which hosted 1 percent of all employment-seeking international migrants in 2001 was hosting 18 percent in 2011. There was a similar increase for East Asia as well. The importance of social networks in determining the paths of migration is well documented (Munshi, 2003). Geography is clearly an important component of social capital. For example, specific villages in the district of Achham in Nepal are linked to particular localities in Mumbai and the primary destination for migrants from villages in Bajhang district is Bangalore. But linkages based on kinship, caste and ethnicity are equally important. The British Army for example has a formal, well-structured recruitment procedure. Yet they recruit mainly from certain ethnic groups, notably those from the Gurung, Magar, Rai, and Limbu caste groups. The significantly higher up-front costs notwithstanding, the opening up newer destinations did universalize access to international migration to a large extent even for potential migrants living in villages with no prior history of migration.

Impact of Migration in Nepal

Beside the political, economic, religious and cultural impact, basically Nepalese societies have been facing two levels of long-term impact of migration such as :

Impact on Social Coherence

Migration has in recent decades changed the composition of households along age- as well as gender-lines. There is a relative absence of family members in the reproductive age group, and there is a relative absence of men compared to women. At the same time, rural villages have been depopulated because of migration. Simultaneously, staying family members have become increasingly dependent on reception of remittances from abroad.

Impact on National Prosperity

Migration has played a significant role on National prosperity. Youth and educated groups are obviously beyond state, they could give innovative knowledge in development, the federal democracy and prosperity. The political process and the various interests involved in the discussion of whether Nepal should be a prosperous state or not, the total belief and justification of federalism may be collapse and looses the peoples' faith, ultimately it can invite great crisis in prosperity, nationality, federal state-sustainability process and broad sustainable development of country.

The young and full of energy population are the labor migrants. They need special care from the government to train them at least a minimum level of spoken language of to be destined country. The social-cultural aspects and dos and don'ts dos in certain social-cultural context are critical points for the out going labor migrants. The insurance for happenings and earning the compensation, assurance and guarantee of the agreed amount and conditions are basic requirements that government can assure through agreements with the receiving countries. Women labor migrants require special care and arrangements that should not be taken for granted by the government. The policy of control has proofed ineffective in the real situation. The restriction and non-facilitation by the government did not and could not stop labor migration through illegal channels. The government have to have agreement directly if not it has to make special arrangements with other friendly country to look after the Nepali labor migrants till direct arrangements can be materialize. The understanding and need assessment of the probable labor market can be helpful to train would be labor force. The government should start doing basic required training as a prerequisite for applying for foreign employment. The training program meant for the outgoing labor migrants is not taken seriously by all the parties. It needs to be taken seriously. Security, earning, living, remittances, and safe back home are the prime necessity of the labor. It has to be seen these issues in the context of a person coming from a rural context without any formal education and is going in the country he/she does not know anything, the single motivating factor to be there is poverty at home and prospect of earning in the foreign land. Open and transparent manpower supply scheme at home is also equally critical to making labor migration as a service industry.

Conclusion

The labor migrants are contributing receiving country by contributing on their development by providing cheap competitive labor force. The sending countries are getting benefits of socio-economical betterment with the remittance and some level of skills learned from the host country. The local development, education, living of the family is being better. But The age, sex, place of residence, marital status, education, employment were the main determining factors of labor migration. Therefore, labor migration also affect of age and sex structure of the population of the Nation. It is directly affect the demographic dividend issued of Nepal. So, it is concluded that the current labor migration trend needs to be addressed to gain the benefit of the demographic dividend of Nepal. The government needs to channelize its efforts to

support the time, contributions and sacrifice made by the labor migrants. Bearing in mind that a large and increasing proportion of the population is residing outside Nepal, it is important for the policy-makers of Nepal to adequately address these issues.

References

Seddon D. Adhikari J. and Gurung G. (2002), *Foreign Labour Migration and the Remittance Conomy of Nepal, Critical Asian Studies* 34(1): 19-40

Thieme S.and Wyss S. (2005), *Migration Patterns and Remittance Transfer in Nepal: A Case Study of Sainik Basti in Western Nepal,* International Migration 43(5): 59-98

Current Macroeconomic Situation, Nepal Rastra Bank, Kathmandu, 2017

Foreign Employment for Women, Challenges and Opportunities, UNFEM, Kathmandu, Nepal, 2016

Nepal Migration Year Book 2011, Nepal Institute of Development Administration, Kathmandu, 2011

Poverty Trends in Nepal (2003-04 and 2010-11), National Planning Commission, Central of Bureau Statistics, Kathmandu, Nepal, September, 2012

Prof. Dr. Bhim Prasad Subedi, *Livelihood at Risk, Findings from Mid-western Nepal, Informal Sector Service Center* (INSEC), Nepal, 2010

BL College Journal

ISSN 2664-228X
Volume -1, Issue-2, 2019
pp. 222-231

Morphogenesis of Sodium Silicate Glass and Glass Ceramics with High Amounts of Vanadium Pentoxide

Md. Kamruzzaman Khan[1], Golam Mortuza[2], Rafiqul Ahsan[3], Md. Jahangir Hossain[4], Md. Alamgir Hossain[5] & Md. Abdur Rashid[6]

[1]Lecturer, Department of Physics, Military Collegiate School, Khulna (MCSK), Khulna- 9210, Bangladesh
[2]Professor, Department of Physics, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh
[3]Professor, Department of Physics, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh
[4]Assistant Professor, Department of Physics, Military Collegiate School, Khulna (MCSK), Khulna-9210, Bangladesh
[5]Executive Trainee (Physics), Nuclear Power Plant Company Bangladesh, Rooppur, Pabna, Bangladesh
[6]Lecturer, Department of Physics, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

e-mail: kamrulphy01@gmail.com, mgmortuza786@yahoo.com, ranzuphy@yahoo.com, asifjahangirphy@yahoo.com, alamgirgazi3@gmail.com, rasidphysics18@ru.ac.bd

Abstract

Glass sample of compositions $xNa_2O_2xSiO_2zV_2O_5$ for z=20 to 60 mole fraction are prepared by melt quench method. The structural analysis of glasses is carried out by Fourier transform infrared spectrophotometer (FTIR) and X-ray diffractometer (XRD) and interpreted structurally in terms of chemical bonding. The spectra of V_2O_5 containing glasses show an increased number of distinct peaks in the low frequency region (400 - 1200 cm^{-1}) with a convolution of broad Gaussians in the high frequency region (1200 - 4000 cm^{-1}). NS25V, NS30V, NS40V glass compositions are infrared inactive. All the spectra are base line corrected and Overlapped Gaussians are deconvoluted to appropriate number of Gaussians using computer program. The distinct peaks and peak positions of the deconvoluted Gaussians are assigned to Si-O-Si, O-Si-O, V-O-V, V-O, V=O, VO_2, Si-O, O-H and H-O-H bands. The compositional dependence of the band positions show a positive correlation with V_2O_5 content. The base and heat treated samples are X-ray diffracted to examine either they are amorphous or crystalline. By increasing content of V_2O_5, transmission of light through sodium silicate glasses reduced due to ligand field and charge transfer mechanisms.

Keywords

XRD, IR Spectroscopy, Deconvolution, Gaussians, V_2O_5

1. Introduction

Glass is an amorphous solid. A material is amorphous when it has no long range order. Chemically glass materials are mixture of organic oxides, which have cooled to a rigid condition without crystallizing. The atoms or molecules in the glass structure must be linked in the form of three dimensional network of a variety of species. Normally in silicate glasses the network former is SiO_4. Like univalent modifier oxide e.g. Na_2O, it helps network formers to melt at lower temperature, to achieve more practical temperature due to the addition of V_2O_5, modifies the silicon environment [1] and produces different types of colorful glass without addition of coloring reagent. Presence of vanadium in the glass with oxidation states V^{2+}, V^{3+}, V^{4+} and V^{5+} depends upon glass composition and melting conditions but V^{2+} ions are less in vanadate glasses. Different valences of vanadium develop various colors. The glasses containing vanadium are highly conductive which makes them more suitable for applications in electrical switching devices. Presence of vanadium results in emergence of semiconducting characteristics in these glasses that stem from hopping unpaired electrons [2]. Conduction in glasses is explained by the phonon assisted hopping of electrons (small polaron hopping) between the low and high valence states of TM (transition metal) ions [3].

2. Experimental Details

To investigate the structural analysis of vanadium doped sodium silicate glasses and the effect of vanadium pentoxide in it, simple $xNa_2O_2xSiO_2zV_2O_5$base glass samples were prepared and characterized. In this work, mainly IR spectroscopy and XRD of the base and heat treated sample are used to characterize the materials. The infrared spectroscopy provides absorption spectra, which gives information about the strength and stiffness of chemical bonds; binding of atoms in compound and characterize the vibrational motion of atom-atom bonds. The qualitative and quantitative analysis of the infrared absorption spectra is employed with the deconvolution to several Gaussians to characterize the materials. According to the National Research Council, "characterization means the description of those feature of the composition and structure of a material which are significant for a particular preparation, study of

various properties and suffice for the reproduction of the materials". In X-ray diffraction techniques the measured pair distribution functions are compared to the distribution functions that are calculated from various models of glass structures and the best fit is taken. The glass compositions chosen for present study are listed in Table 1.

Table 1: Nominal composition, melting temperature and optical quality of glasses of various compositions

Title of the samples	Nominal composition in mol %			Melting temperature in ^{O}C	Optical quality	XRD
	Na_2CO_3	SiO_2	V_2O_5			
NS20V	26.67	53.33	20	1300	Milky	Partially crystallized
NS25V	25	50	25	ND*	Not form glass	NI**
NS30V	23.33	46.67	30	ND*	Not form glass	NI**
NS40V	20	40	40	ND*	Not form glass	NI**
NS50V	16.67	33.33	50	1300	opaque	Amorphous
NS60V	13.33	26.67	60	1350	opaque	Amorphous

N for Na_2O, S for SiO_2, V for V_2O_5, ND*= Not determined. (Glass was not formed)
NI**= Not investigated.

3. Results and Discussion

3.1. The Results of IR Spectra

The infrared spectra are recorded between 400 and 4000 cm^{-1} at room temperature. The typical infrared spectra of $xNa_2O_2xSiO_2zV_2O_5$ of base and heat treated glasses with different concentration of V_2O_5 are shown in Figure 1 and Figure 2. From these figures one can obtain only qualitative information. The plots have been positioned in such a way to compare the modifications accompanying for the replacement of both Na_2O and SiO_2 by V_2O_5. The spectra of the above samples are divided into two regions; one is the lower wavenumber in the frequency range 400 - 1200 cm^{-1} and the other in the higher wavenumber in the frequency range 1200 - 4000 cm^{-1}. The absorption intensity of the former region and later region are absolutely different. These absorption spectra exhibit some structural changes that occur in the various matrix of the studied samples with increasing their V_2O_5 content up to 60 mol%. In 20 mol% V_2O_5 (NS_20V) base glass, two shoulder peaks appear at 510 cm^{-1} and 1440 cm^{-1} and it becomes weaker in 50 mol% V_2O_5 (NS50V) base glass and almost

disappears in the 60 mol% V_2O_5 (NS60V) base glass. It is also found that the band positions shifted towards high frequency because of increasing V_2O_5. In NS20V base glass, two distinct strong broad peaks appear but in NS50V glass, only one strong broad peak exists and it becomes sharper than NS20Vglass system. The noisy peak appears in the NS60V glass system because of more hygroscopic nature. And it is found that the absorption of water of our prepared samples increases with increasing V_2O_5 concentration. The IR spectra of NS25V, NS30V and NS40V compositions do not show peak because they do not form glass. The band positions of NS20V, NS50V and NS60V heat treated samples are more distinct than the base samples. The band positions of the heat treated samples are shifted. The positions of the prominent absorption peaks associated with shoulder of each base and heat treated samples are summarized in table 2 and table 3. All the prominent peaks of base and heat treated glasses are identified as strong, weak, very weak, medium and strong broad. The peaks of the heat treated glasses are shifted more with increasing V_2O_5. IR spectra seem to consist of relatively broad absorption bands and it is very difficult to identify the exact position of the absorption band. For this reason, deconvolution of these bands is considered as a useful tool to obtain the exact position of the absorption band. The band positions and widths obtained from the deconvolution are thus considered to be true representation of the spectra. Here the bands observed in the 400 - 1800 cm^{-1} region is deconvoluted to several Gaussians depending on the basis of spectral shape using computer program to estimate the band position and relative amounts of various bonding mechanisms.

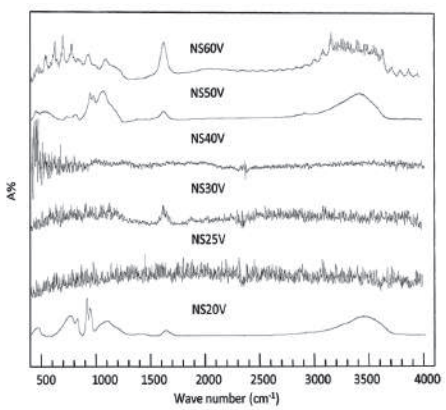

Figure 1: Infrared Spectra of $xNa_2O_2xSiO_2zV_2O_5$ Base Glasses (z=20-60 mol %)

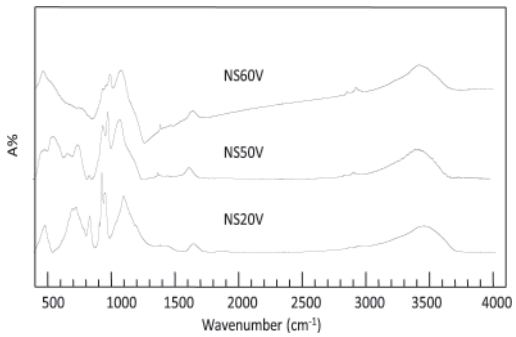

Figure 2 : Infrared Spectra of $xNa_2O_2xSiO_2zV_2O_5$ Heat-treated Glasses (z=20, 50, 60 mol %)

Table 2 : The prominent band positions in the spectra of$xNa_2O_2xSiO_2zV_2O_5$ base glasses.

Specimens	Position of prominent absorption maxima (cm^{-1})									
NS20V	493m	510sh	650m	788vs	843vw	912s	1143sb	1440sh	1655m	3466sb
NS25V*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NS30V*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NS40V*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NS50V	480vw	585w	666sh	777w	846vw	961w	1107s	1477sb	1663m	3485sb
NS60V	476vw	544w	632m	710m	812w	950m	1109w	-	1643vs	3336n

where s = strong, vs = very strong, m = medium, w- weak, vw = very weak, sh = shoulder, n=noisy, sb=strong broad

NS25V*,NS30V* and NS40V* did not form glass.

Table 3 : The position and nature of characteristics IR bands of the $xNa_2O_2xSiO_2zV_2O_5$ heat-treated glasses

Specimens	Position of prominent absorption maxima (cm^{-1})									
NS20V	490m	522w	610sh	739s	835m	920vw	1109vs	1490sh	1676m	3499sb
NS25V*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NS30V*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NS40V*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NS50V	498w	581s	632w	770m	840w	996w	1100s	1513sh	1657sh	3481sb
NS60V	491s	-	650sh	710sh	854sh	960w	1110w	1518sh	1664w	3482sb

Where s=strong, m=medium, sb=strong broad, sh=shoulder, w=weak, vw=very weak, vs=very strong

The deconvoluted spectra for samples NS20V, NS50V and NS60V are shown in Figure 3. The assignments of the chemical bonds are carried out by comparing its

position with the related glasses and crystalline phases. The assignments of these chemical bonds are summarized in table 4. Some of these bonds are attributed to vibrations of silicate, the rest are attributed to vibrations of vanadate bonds. Each component band is related to some type of vibration in a specific structural group.

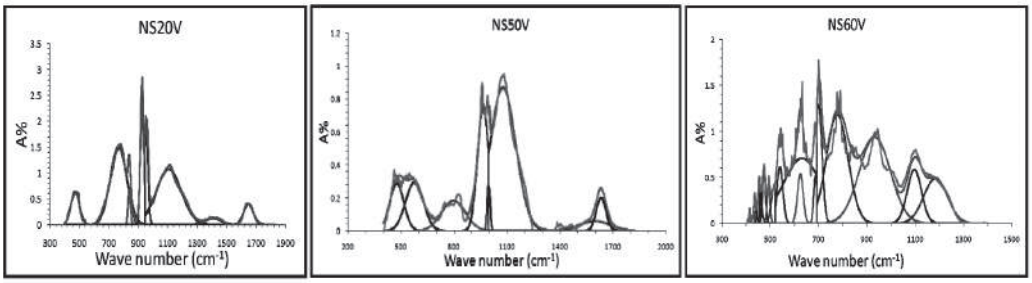

Figure 3: Deconvoluted spectra of $xNa_2O_2xSiO_2zV_2O_5$ (z = 20, 50, 60 mol %)

3.2. X-ray Diffraction of Base and Heat-treated Samples

The X-ray diffraction for NS20V, NS50V and NS60V base and heat- treated samples are shown in Fig.4.The X-ray diffraction patterns did not show any peaks and there was a broad haloes between 2θ=12 to 33(deg.).

The sample NS20V is partially crystallized. But NS50V and NS60V samples do not show any crystallinity except amorphous haloes. The samples were heated at 475˚C for 6 hours. The heat treated samples show the crystallinity in the material. From Figure 4 it is cleared that the heat treated glasses are not devitrified fully at 475˚C/6 hours. So we can conclude that the crystallization rate is slow and crystallization is not complete at 475˚C for 6 hours heat treatment

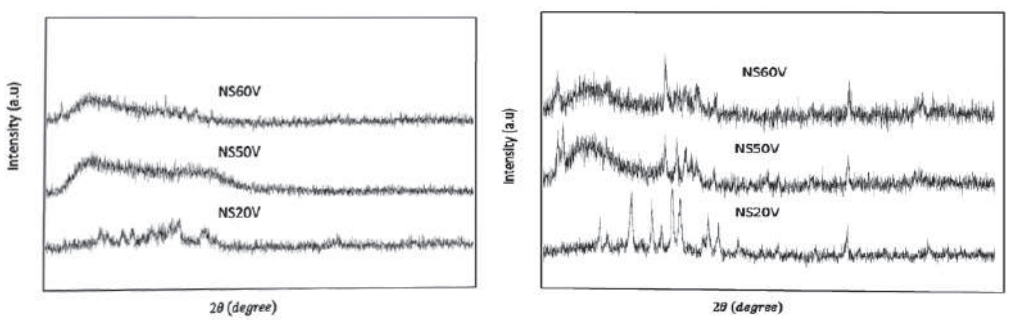

Figure 4 : XRD Pattern of $xNa_2O_2xSiO_2zV_2O_5$ bases and heat-treated glasses.

3.3 Discussion

The infrared spectra of our prepared glasses mainly consist of bridging, non-bridging oxygen bonds and vanadyle groups. K. El-Egili [4] observed a band for vitreous SiO_2 in IR spectraat 450 cm^{-1}. This band is attributed to the bending vibrational mode of Si-O-Si. The band at 490 cm^{-1} [6]is attributed to O-Si-O bending vibration. The IR band situated at 510-561 cm^{-1}, is attributed to the overlapping of the angular deformation vibration of the V-O-V chains. The intensity of these bands increases with increasing the V_2O_5 content up to 60 mol%. These bands can be assigned to low energy vibration of the V-O-V chains [7-8]. With enhancement of vanadium bonds, oxygen apart from silicones and attach to vanadium and form V-O-V bindings. It is clear from the IR spectra of NS20V, NS50V, NS60V glasses that the bands are slightly shifted towards the higher wave numbers. The symmetric stretching V-O-V ring frequency of V_2O_5 at 650-740 cm^{-1} [9] agree with our results 618 - 696 cm^{-1}. In the 761-774 cm^{-1} of the IR spectra there are higher absorption band characteristics of motions of the vanadate network, more precisely of stretching vibrations of V-O bonds in pyrovanadate structural units. Our result agrees with [10] and [11,12]. A second component of enhancement of vanadium bonds for NS20V, NS50V, NS60V glasses is situated at about 801-835 cm^{-1} and is assigned to the asymmetric stretching vibrations of the V-O-V bridges according to [13]. The band situated at 925-990 cm^{-1},assigned to the symmetric vibration of VO_2 in the [VO_4] structural units [9,14] and the other bands created at 1065-1086 cm^{-1}, due to the vibration of the isolated V=O non bridge bonds in the [VO_5] trigonal bipyramids. This observation agrees with [15] and [16]. The shifting of the high frequency band of the V=O bond towards higher wave number can be attributed to the changes in the structure of V_2O_5 produced by the reduction of Na_2O. The bands at 1102 cm^{-1} and 1178 cm^{-1} may be assigned to Si-O asymmetric stretching vibration. This frequency of Si-O band is observed by [17] within the range 1100-1210 cm^{-1}. The hygroscopic nature of the $xNa_2O_2xSiO_2zV_2O_5$ glass system should permit one to refer as $xNa_2O_2xSiO_2zV_2O5.H_2O$ compositions. In this work, the vibrational band for O-H bending mode lies between 1622-1643 cm^{-1}. This variation indicates that the water seems to be nearly free or loosely held by the glass network. It is very much clear from table 1 and table 2 that the peaks of the heat treated samples have been shifted which is the precondition of crystallization. The reason behind this phenomenon is that some of the vanadium is present as V^{5+} and the rest is present as V^{4+}.

NS25V, NS30V and NS40V did not melt in our laboratory furnace because of high

melting temperature and the limitation of temperature of our laboratory furnace. An oxyacetylene flame was applied on these samples but these compositions were burnt out without melting. The IR spectra of these samples were taken but we do not find any peaks because the vibrational motion of NS25V, NS30V and NS40V compositions may be infrared inactive. The heat treatments of these samples (NS25V, NS30V, and NS40V) were not performed. The comparison of the deconvoluted and observed chemical bonds with related glasses and crystalline phases are arranged in table 4. For each band attributed to a given vibrational mode, Figure 5 shows the compositional dependence of the band position with V_2O_5 concentration for $xNa_2O_2xSiO_2zV_2O_5$ glass system(a) without error bars (b) with error bars.The solid lines with 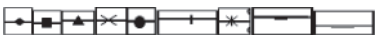 indicate infrared active compositions while the dashed lines with filled circles represent the infrared inactive compositions. The variation in band positions for all concentration of V_2O_5 (20, 50, 60 mol%) justify the phase transformations of vanadate species, i.e. ortho, pyro, metavanadate.

Table 4 : Comparison of the main IR absorption bands observed in base glasses with related glasses and crystalline phases

Remarks	Structural groups	Absorption band (cm^{-1})	Corresponding references
Bending vibration	Si-O-Si	450 470 [428-471]	[4] [5] Present work
Bending vibration	O-Si-O	490 [490]	[6] Present work
Chain	V-O-V	400-570 [510-561]	[7,8] Present work
Symmetric stretching vibration	V-O-V	650-740 [618-696]	[9] Present work
Stretching vibration in the pyro vanadate structure unit	V-O	700 820 [761-774]	[10] [11,12] Present work
Asymmetric stretching vibration	V-O-V	820-830 [801-835]	[13] Present work
Symmetric stretching vibration	VO_2	966 [925-990]	[9,14] Present work
Non-bridging	V=O	1020 1100 [1065-1086]	[16] [17] Present work
stretching vibration	Si-O	1100-1210 [1178]	[18] Present work
Bending	O-H	1600-1660 [1622-1643]	[19] Present work
Symmetric stretching vibration	H-O-H	3420-3437 [3336-3485]	[6] Present work

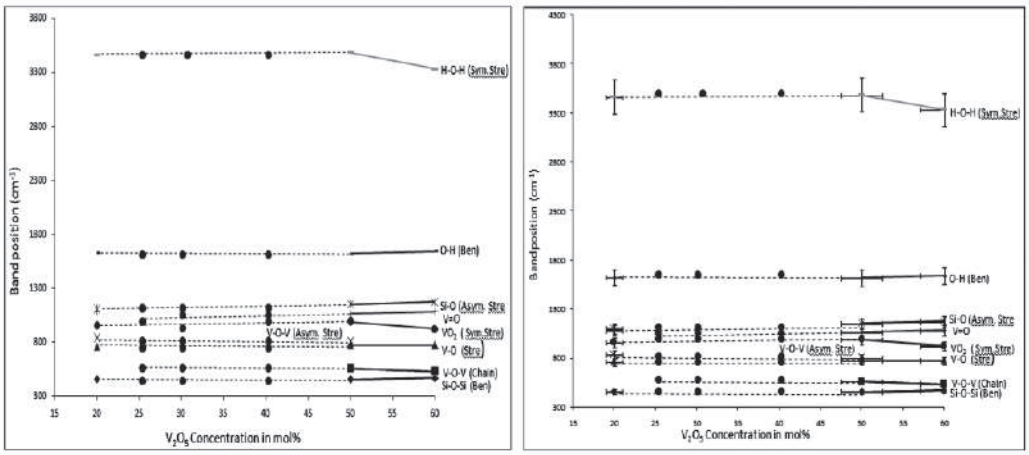

Figure 5 : The composition dependence of the band position with V_2O_5 concentration (a) without error bars (b) with error bars

4. Conclusion

The ratio of Na_2O/SiO_2 was always kept constant in $xNa_2O_2xSiO_2zV_2O_5$ glass system. It was found that the melting temperature of the glass samples depended on the amount of V_2O_5. The peaks and peak positions were assigned to Si-O-Si, O-Si-O, Si-O, V-O-V, V=O, VO_2 and V-O bonds. The IR band positions in these glasses changed with the increasing of V_2O_5. The formation of O-H bond around 1643 cm^{-1} and 3485 cm^{-1} expresses the hygroscopic nature of the glass and provides wealth information about the structural units. In the case of vanadium doped glasses, at high concentration the bands belonging to the vibration in V_2O_5 groups dominated the spectra. It can be said that vanadium prefers to bridge with the oxygen that did not take part in the SiO_4 units making new structures and in consequence it acted as a network former. This indicates the reduction of transmission of light. X-ray diffraction pattern of the NS20V, NS50V and NS60V base sample shows amorphous haloes. The X-ray diffraction pattern of the heat treated NS20V, NS50V and NS60V samples show the crystallinity in the material which indicates that when heat treatment is performed the glass may show glass ceramic properties.

References

1. S. Mandal and S. Hazra, J. Mater. Res., Vol. 15, No.1, Jan 2000

2. Bahman and Mirhadiet al., *Journal of Optoelectronics and Advance Materials,* Vol.13 No.6, June 2011, pp. 679-683

3. Md. R. Ahsan. M.G. Mortuza, *Journal of Non- Crystalline Solids,* pp. 351
4. K. El-Egili. Infrared Studies of Na_2O-B_2O_3-SiO_3 and $A1_2O_3$- Na_2O-B_2O-SiO_3 Glasses, J. Physica B 325(2003) pp. 340-348
5. F.A. Khalifa, F.A. Mustafa et al., *India, Journal of Pure & App. Phys,* 34, 207(1995)
6. S Thirumaran& N Prokash, *Indian Journal of pure and Applied Physics,* Vol. 53, February 2015, pp. 82-92
7. M. Rada, L. Rus et al., *Journal of Non-Crystalline Solids* 414 (2015) 59-65
8. S. Rada, T. Ristoiu, M. Rada et al., Mater. Res. Bull. 45 (2010) 1598
9. Poonam Sharma et al., *New Journal of Glass and Ceramics,* 2011, 1, 112-118
10. M. Rada, S. Rada et al., *Journal of Non-Crystalline Solids* 4414 (2015) 59-65
11. I.Ardelean, C. Andronache, C. Campean, P. Pascuta, Structural investigation of $xFe_2O_3 \cdot (100\text{-}x)[P_2O_5{\cdot}CaO]$ and $x(Fe_2O_3{\cdot}V_2O_5){\cdot}(100\text{-}x)[P_2O_5{\cdot}CaO]$ glass systems by IR spectroscopy, Mod. Phys. Lett. B 45 (2004) 1811-1816.
12. L.Stanescu, E. Indrea et al., Some contributions to the investigation of V_2O_5-MoO_2 system, Rev. Roum. Phys. 21 (9) (1976) 939-951
13. Vassalin Dimitrov et al., *Journal of Non- Crystalline Solids,* 180 (1994) 51-57
14. Poonam Sharma et al., *Indian Journal of Pure & Applied physics,* Vol.48, January 2010, pp. 39-46
15. Padmasree K P, Kanchan D K et al., Solid State Commun 136 (2005) 102
16. D.A. Magdas et al., *Journal of Non-Crystalline Solids* 428 (2015) 151-155
17. King, P.L., Ramsey, M.S., & Swayze, G.A., 2004. Infrared Spectroscopy in Geochemistry, Exploration Geochemistry and Remote Sensing. Mineral. Assoc. Canada, Short Course Series, vol. 33, 93-133
18. J. Wong, J. Non-Cryst. Solids, 20 (1976), pp. 83
19. C. Dayanan et al., J. Mater. Sci.31, (1996), pp. 123